রাহবার

সাবেক আমীরে জামায়াত

মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.)

স্মারক গ্রন্থ

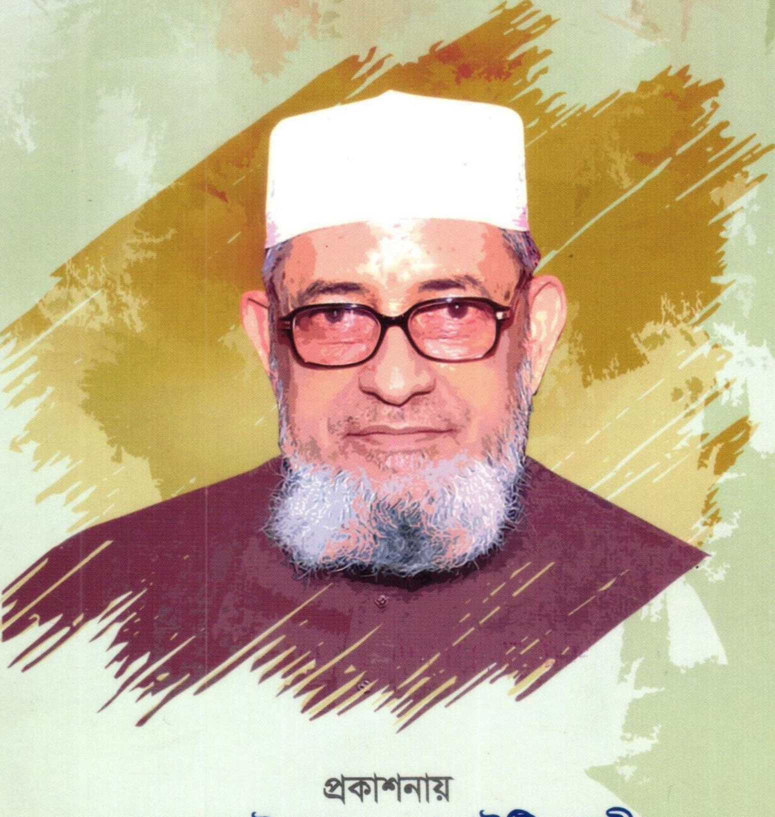

প্রকাশনায়

দারুল ইসলাম সোসাইটি ফেনী

রাহবার
সাবেক আমীরে জামায়াত মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) স্মারক গ্রন্থ

সম্পাদক
মুহাম্মদ মাহমুদুল হক

সম্পাদনা সহযোগী
অধ্যাপক আবু ইউসুফ
মাওলানা আবদুল হান্নান
মাওলানা আবদুল মালেক
অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম
এস.এম নূর নবী দুলাল

অনুলিখনে
মুহাম্মদ আতাউর রহমান

বর্ণ বিন্যাস
মুহাম্মদ আবদুর রহীম

গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা
ফজলুল মল্লিক

প্রকাশকাল
মার্চ- ২০২২ খ্রীস্টাব্দ, চৈত্র- ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শা'বান- ১৪৪৩ হিজরী

শুভেচ্ছা মূল্য : ৩০০/= (তিনশত টাকা মাত্র)

প্রকাশনায়
দারুল ইসলাম সোসাইটি, ফেনী।

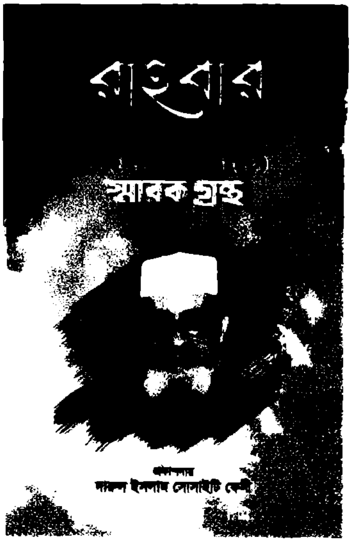
রাহবার
স্মারক গ্রন্থ

তাদের আত্মার মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে:

যারা ইকামাতে দ্বীনের পথে তিলে তিলে জান-মাল কুরবান করেছেন,

যারা নিজের জীবন যৌবন বিলীন করে দিয়ে আজীবন দ্বীনের পথে লড়ে গেছেন,

যারা শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে দুনিয়াতে চূড়ান্তভাবে সত্যের সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন,

বিশেষ করে সাবেক আমীরে জামায়াত **মকবুল আহমাদ (রহ.)** সহ সকলের আত্মার মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

মহান আল্লাহ তাঁদের সকল নেক আমল কবুল করুন, গুনাহ-খাতাগুলো মাফ করে দিন। তাদের সকলকে জান্নাতে উঁচু মাকামে সিক্ত করুন। আমীন।

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তায়া'লার জন্য যিনি সবকিছু পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করেছেন, জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে যার কুদরতী আইন কার্যকর রয়েছে, মানুষের জীবন-মৃত্যুর বাগডোর যার হাতে নিহিত, প্রতিটি অণু-পরমাণু গতিশীল রয়েছে যার কুদরতী ইশারায়।

তামাম দরুদ ও সালাম মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি, যিনি আরবের ঘনঘোর আইয়্যামে জাহেলিয়ার বুকচিরে মানুষকে মানবতার পথ দেখিয়েছেন হেরার জ্যোতির আলোকে। একটি বর্বর জাতিকে সভ্যতার ওস্তাদে পরিণত করেছেন। যাদের চারিত্রিক দ্যুতি আর তরবারীর ঝিলিক তদানিন্তন সুপার পাওয়ার কায়সার ও কিসরার সালতানাতকে ইতিহাসের পাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিল।

মুসলিম জাতি যখন জিহাদ বিমুখ হয়েছে, ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনে নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন করে ভোগ বিলাসে লিপ্ত হয়েছে, তাওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যের পরিবর্তে দুনিয়াবি স্বার্থে হানাহানিতে লিপ্ত হয়েছে, তখন থেকেই তাদের পতনের সূচনা হয়।

বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইকামতে দ্বীনের সে আন্দোলন আবার দানা বেঁধে উঠে কয়েকজন মনিষীর ক্ষুরধার লেখনী আর রেনেসাঁ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। ভারতীয় উপমহাদেশে তাঁর নেতৃত্ব দিয়েছেন নিখিল ভারত জামায়াতের ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ.)। তাঁর প্রত্যক্ষ সাহচর্যে এসে যে কয়জন নেতা এ বাংলায় ইসলামী আন্দোলনকে আজকের এ পর্যায়ে এনেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রাত:স্মরণীয় হয়ে আছেন মাওলানা আবদুর রহীম (রহ.), অধ্যাপক গোলাম আযম (রহ.), আব্বাস আলী খাঁন, মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী (রহ.), মকবুল আহমাদ (রহ.)।

বিগত ১৩ এপ্রিল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর তৃতীয় নির্বাচিত আমীর সংগঠনের দু:সময়ের রাহবার মকবুল আহমাদ দুনিয়ার সফর শেষ করে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিতে চলে গেছেন। দারুল ইসলাম সোসাইটি ফেনী জেলার এ কৃতি সন্তানকে অনাগতকালের ইসলামী

আন্দোলনের নেতা কর্মীদের কাছে স্মরণীয় করে রাখা ও তার কর্মময় জীবন থেকে শিক্ষণীয় ঘটনা তুলে ধরার লক্ষ্যে 'রাহ্‌বার' নামে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়। কভিড- ১৯ পরিস্থিতিতে লকডাউনের কারণে সে কাজ ফোনে মোবাইলে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করি। এক একটি লেখার জন্য আমরা বারবার যোগাযোগ করেছি। পান্ডুলিপি তৈরী করতে আমাদের সিদ্ধান্তকৃত সময় থেকে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

রাহ্‌বারের পাঠকদের জন্য আমরা সাবেক চার আমীরে জামায়াত ও সাবেক সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল কামারুজ্জামান সাহেবের লেখা থেকে কিছু প্রবন্ধ বাছাই করে পেশ করেছি। এর প্রথম উদ্দেশ্য উনাদেরকে স্মরণ করা, আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আমাদের এ হীরকখন্ড নেতৃবৃন্দ কেন ইসলামী আন্দোলন শুরু করেছিলেন আর কোন কোন পথ পাড়ি দিয়ে তাকে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন তা তুলে ধরা। আশা করি পাঠক তা উপলব্ধি করবেন।

অনেক ব্যস্ততাকে পেছনে ঠেলে কষ্ট করে আমাদের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও জ্ঞানীগুণীগণ এ স্মারকে লেখা দিয়েছেন। তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। যারা এ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশে বুদ্ধি, শ্রম, মেধা ব্যয় করেছেন, নানাভাবে সহযোগিতা করে তা প্রকাশে ভূমিকা রেখেছেন, তাদের সকলকে জানাই মোবারকবাদ। মহান আল্লাহ তায়া'লা সবার প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমাদের সকলকে এক একজন ভাল মুসলমান হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করার তাওফিক দিন। এ স্মারককে সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

সূচিপত্র

আমীরে জামায়াতের বাণী ০৯

মকবুল আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহু আলাইহে) : জীবন ও কর্ম ১১

ঈমানের পরীক্ষা হয় দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবতের সময় - মকবুল আহমাদ ১৮

অন্যতম দা'য়ী ইলাল্লাহ, মকবুল আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ
- অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ২৬

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের আদর্শিক ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব
- সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ.) ৩৫

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের এক সিরাজুম মুনির
- অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ৪৯

খাঁটি মুমীন হতে হলে তাগূতের পাক্কা কাফির হতে হবে
- অধ্যাপক গোলাম আযম ৫৬

মজলুম জননেতা মকবুল আহমাদ : একজন আদর্শ মানুষ ও আদর্শ সংগঠক
- এ. এইচ. এম. হামিদুর রহমান আযাদ ৬৭

ইসলামী সমাজ বিপ্লব - মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ৭৫

আমার দেখা মুহতারাম মকবুল আহমাদ - মাওলানা রফি উদ্দিন আহমদ ৮৯

বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্যে ইসলামের বিজয় অনিবার্য
- মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ৯৬

স্মৃতিতে জীবন্ত রাহবার মকবুল আহমাদ - মুহাম্মদ আবদুর রব ১১০

মকবুল আহমদ : এক দা'য়ী ইলাল্লাহ - অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম ১১৪

ইসলামী নেতৃত্বের মডেল মকবুল আহমাদ (রহ.)
- অধ্যাপক আহছান উল্লাহ ১২২

দুঃসময়ের কান্ডারী - এহসানুল মাহবুব জোবায়ের ১২৭

একজন নিরলস একনিষ্ঠ সার্বক্ষণিক দা'য়ীর কথা - আ জ ম ওবায়দুল্লাহ ১২৯

মকবুল আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ আমাদের প্রেরণা
- ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম ১৩৩

প্রেরণার বাতিঘর - অধ্যাপক মফিজুর রহমান ১৩৮

অতুলনীয় মকবুল আহমাদ - সাংবাদিক এম. আবদুল্লাহ ১৪২

ব্যতিক্রমধর্মী একজন দা'য়ী ও রাজনীতিবিদ
- ড. মো. নূরুল আমিন ১৪৭

মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) কে যেমন দেখেছি
- অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূঁইয়া ১৫৩

কবিতা : আধ্যাত্মিক মানচিত্রের নকশা - জাকির আবু জাফর ১৬০
আমাদের প্রেরণা : মকবুল আহমাদ - মুহাম্মদ আবদুল জব্বার ১৬১
মরহুম মকবুল আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ : দায়িত্ব, ব্যস্ততা, অসুস্থতা, বার্ধক্য
কিছুই জন্মভুমি থেকে বিচ্ছিন করেনি যাকে
- ডা. মুহাম্মদ ফখরুদ্দিন মানিক ১৬৪
যে জীবন প্রেরণা যোগায় - দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব ১৬৯
আমার প্রিয় মকবুল আহমাদ ভাই - মাসুদা সুলতানা রুমী ১৭৩
একজন মকবুল সাহেব - এ.বি.এম শামসুদ্দিন ১৭৭
মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) একটি প্রজ্জলিত নক্ষত্র
- এ.জি.এম বদরুদ্দোজা ১৭৯
গুণি ব্যক্তিত্ব মকবুল আহমাদ (রহ:) - মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার ১৮৯
মকবুল আহমাদ সাহেব ঃ ইসলামী আন্দোলনের বাতিঘর - কবির আহমদ ১৯১
বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের এক পথিকৃতের বিদায়
- এ.কে.এম শামছুদ্দিন ২০২
সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য - মুহাম্মদ আলা উদ্দিন ২০৫
মকবুল স্যার একজন আদর্শ পথ প্রদর্শক - অধ্যাপক আবু ইউসুফ ২০৬
সকলের প্রিয় মকবুল আহমাদ (রহ.) - মুহাম্মদ মাহমুদুল হক ২১৪
একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব মকবুল আহমাদ - মুফতী আবদুল হান্নান ২২৫
মরহুম মকবুল আহমাদ : একটি প্রেরণাময় জীবনের অবসান
- মাওলানা আবদুল মালেক ২৩০
দুর্দিনের কাণ্ডারি : জননেতা মকবুল আহমাদ - আব্দুল ওয়াদুদ সরদার ২৩৬
তাঁর বিকল্প তিনি নিজেই - দিদারুল আলম মজুমদার ২৪২
স্মৃতিতে মরহুম মকবুল আহমাদ - এম একরামুল হক ভূঁইয়া ২৪৫
একগুচ্ছ মানবীয় গুণাবলী মকবুল আহমাদকে অনন্য সাধারণ মর্যাদায়
সমাসীন করেছে - মোহাম্মদ জাফর ইকবাল ২৪৮
দিনে সংগ্রামী রাতে দরবেশ - এম ছাখাওয়াত হোছাইন ২৫৫
মকবুল আহমদ (রাহি.) : সাহস ও প্রেরণার সুউচ্চ মিনার
- রাশেদুল হাসান রানা ২৬০
যে স্মৃতি অম্লান - মোহাম্মদ ইলিয়াস ২৬৫
পেয়ে হারানোর হাহাকার - মরহুমের ছেলে মোহাম্মদ নোমান ২৬৮
আমার অনুপ্রেরণা - মোঃ আবুল কালাম ২৭২
মকবুল আহমাদ : অনুপম জীবন, অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত
- শহীদ উল্লাহ কাইছার ২৭৩
একজন সফল রাহবার - কেফায়েত উল্লাহ ভূঁঞা ২৭৬

একজন দা'য়ী ইলাল্লাহ - গাজী ছালেহ উদ্দীন ২৮০
আমার প্রিয় নানা ভাই - মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন ২৮৩
জনাব মকবুল আহমাদ কালজয়ী এক ইতিহাসের নাম
- আবু নাসের মুজাহিদ ২৮৬
আমি মকবুল আহমাদ সাহেব (রহ.) কে যেভাবে দেখেছি
- কাজী আবু তাহের ২৯০
ফেনীর মাটি ও মানুষের সাথে মিশে যাওয়া একটি নাম
- সফি উল্লাহ ভূঁইয়া ২৯২
স্মৃতিতে মরহুম মকবুল আহমেদ - মুহাম্মদ নুরুল আবছার ২৯৫
সাবেক আমীরে জামায়াত এক অনুসরণীয় আদর্শ - শিরিনা আক্তার ২৯৭
হৃদয়ের রাজপুত্র মকবুল আহমদ : বড়ো নেতার ছোটো ঘটনা
- আবু সুফিয়ান ২৯৯
মরহুম মকবুল আহমদ : দি হোয়াইট ইমেজিং লিডার
- রেজাউল হক হেলাল ৩০২
মরহুম মকবুল আহমাদ রাসুল (সা.) উসওয়াতুল হাসানার বাস্তব অনুসারী
- মাহমুদুল হাসান ৩০৫
মরহুম মকবুল আহমাদ যাঁর মধ্যে ছিল সাহাবীদের স্বভাব
- মুফতী রফিকুল ইসলাম ৩০৮
স্মৃতির পাতায় হাসিমুখের প্রিয় রাহবার
- হাফেজ মাওলানা কামরুল আহছান ভূঁঞা ৩১০
শোকাধিকার - শাহাদাত মাহমুদ সিদ্দিকী ৩১১
কবিতা : শান্তিতে ঘুমাও স্বজন - মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ ৩১২
কবিতা : সাহসী এক মর্দে মুজাহিদ - মুহাম্মদ ফিরোজ কবির ৩১৩
কবিতা : গীতিকাব্য ঃ জান্নাতি ফুল - রাকিবুল এহছান মিনার ৩১৩
সাকিনাত (মুমিনের অন্তরে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ প্রশান্তি)
- আইসিইউতে দায়িত্ব পালনকারী ডিউটি ডাক্তার ৩১৪
মকবুল আহমদ : গণমাধ্যম কর্মী থেকে গণমানুষের নেতা
- আব্দুল্লাহ আল মারুফ (ছাত্র) ৩১৫
মকবুল আহমাদের মানব কল্যাণের নমুনা ৩১৬
মেয়েকে লেখা অটোগ্রাফ ৩১৭
কুরআন অধ্যয়ন কালে হাতে লেখা নোট ৩১৮
২০২০ সালের রমজানে একজনকে লেখা দাওয়াতি চিঠি ৩১৯
মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে বড় ছেলেকে লেখা জীবনের শেষ চিঠি ৩২০
এলবাম ৩২১-৩৫২

বাণী
আমীরে জামায়াত

একজন সংগঠক হিসেবে তিনি ছিলেন সর্বদা সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষায় আমাদের মাঝে সর্বাধিক অগ্রগামী। সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষায় তিনি সবক্ষেত্রে সবার জন্য ছিলেন আপোষহীন। তিনি ইসলামী আন্দোলনের এক বর্ণালী মুজাহিদ। দ্বীনের একজন মহীরুহ পতাকাবাহী।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের এক মহান পথিকৃত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক রাহবার আমাদের নেতা মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) এর স্মরণে "দারুল ইসলাম সোসাইটি, ফেনী" কর্তৃক 'রাহবার' নামে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত এবং এ জন্য মহান আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ্।

মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) ছিলেন একজন আপাদমস্তক দ্বীনের দা'য়ী, একজন সফল সংগঠক। এ মহান মানুষটির সান্নিধ্যে যখনই গিয়েছি তখনই তাঁকে একজন মানুষরূপী ফেরেস্তা হিসেবে মানসপটে আবিষ্কার করেছি।

ইসলামী আন্দোলনের কঠিন দুঃসময়ে তাঁর অতীব নিকটে থেকে সংকটকালীন সময়ের পরিবেশ পরিস্থিতির সাক্ষী হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বী হয়েও মানসিকভাবে সর্বদা ছিলেন চির তরুণ। আমরা যেসব বিষয়ে দুশ্চিন্তা করতাম তাঁর নিকট সেসব বিষয় ছিল নেহায়েত মামুলী ব্যাপার। আমাদের যত শত দুশ্চিন্তা থাক না কেন তাঁর সান্নিধ্যে গেলে সকল দুশ্চিন্তা নিমিষেই বরফের ন্যায় গলে যেত। তিনি একান্তই আল্লাহর প্রতি ভরসাকারী ছিলেন, তার প্রমাণ ভুরি ভুরি। তবে সর্বশেষ ২০১৭ সালে যখন একসাথে আমরা রাজবন্দী হিসেবে কারাগারে যাই তখন রিমান্ডে, কারাগারে জুলুম নির্যাতনের পরিবেশে মহান আল্লাহর প্রতি অন্যরকম এক ভরসার প্রমাণ তাঁর নিকট দেখেছি। তাঁকে একটুও বিচলিত হতে দেখিনি।

একজন সংগঠক হিসেবে তিনি ছিলেন সর্বদা সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষায় আমাদের মাঝে সর্বাধিক অগ্রগামী। সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষায় তিনি সবক্ষেত্রে সবার জন্য ছিলেন আপোষহীন। তিনি ইসলামী আন্দোলনের এক বর্ণালী মুজাহিদ। দ্বীনের একজন মহীরুহ পতাকাবাহী। যিনি উদারতার মহান শিক্ষা দিয়ে আমাদের সবাইকে আগলে রেখেছিলেন। স্বমহিমায় উদ্ভাসিত

ছিলেন তিনি। তাঁর আলোকবর্তিকা থেকে আলোকিত হয়েছিলেন সর্বস্তরের মানুষ। ফেনীর আপামর জনতা, সমগ্র দেশের আনাচে-কানাচে সংগঠনের প্রান্তিক স্তরের জনশক্তি পর্যন্ত যার আলোর বিচ্ছুরণ থেকে বঞ্চিত হয়নি। যে মানুষটি একজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হয়েও জামায়াতের হাজারো অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারকে পরিচালনা করেছেন। সর্বপেশার লোকজন যার মহান ব্যক্তিত্বের কাছে শ্রদ্ধায় আনত হতেন। সারা বাংলাদেশের জনশক্তি মরহুম প্রফেসর গোলাম আযম (রহ.) এর পরে এক নামে 'স্যার' হিসেবে চিনতেন তাঁকে। আমানতদারীতার কষ্টিপাথরে তিনি ছিলেন উত্তীর্ণ। সর্বোপরী জনশক্তির আমানত, দায়িত্বের আমানত, সংগঠনের অর্থ ও সম্পদের আমানত রক্ষায় তার চেয়ে অগ্রগামী খুব কম সংখ্যক মানুষকে পাওয়া যেত। শতভাগ নির্মোহ জীবন-যাপনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন আমাদের সাবেক রাহবার। তাঁর জীবন পরিচালনার মাঝে কোনরূপ আড়ম্বরতা, প্রাচুর্যতা, লৌকিকতা তাঁকে সামান্যতম স্পর্শও করতে পারেনি। শিশুর সারল্য মিশ্রিত আচরণে অফিস স্টাফ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের ঊর্ধ্বতন-অধঃস্তন দায়িত্বশীলদের তিনি মুগ্ধ করতে পারতেন। ভাষা ও শব্দ প্রয়োগেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভাষায় মাত্রাতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগও পরিহার করে চলতেন। এক কথায় জীবন পরিচালনা থেকে শুরু করে সার্বিক দিক থেকে পরিমিতিবোধের ষোলোকলা পূর্ণ ছিল এই মহানায়কের। মহান রব্বে কারীম তার গোলামকে দুনিয়ার সফর শেষ করে তার মুলাকাতে নিয়ে গেছেন অনন্ত পথের যাত্রী হিসেবে। দ্বীনি আন্দোলন এবং জীবন পরিচালনায় তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন দীক্ষা, রেখে গেলেন অনেক শিক্ষা ও উদাহরণ। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁর এই গোলামের তামাম জিন্দেগীর সমস্ত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে নেকিতে পরিণত করে দিন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নেক আমলগুলোকে কবুল করুন। শহীদ হিসেবে কবুল করে তাকে সম্মানিত করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন। মহান রবের কাছে আবেগ ভরা এই আকুতি জানাচ্ছি।

পরিশেষে এই স্মারক গ্রন্থটি আগামী দিনে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি খোরাক হিসেবে আবির্ভূত হবে বলে আমি মনে করি। এ স্মারক গ্রন্থের সম্পাদনা পরিষদসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। স্মারক গ্রন্থের সুন্দর প্রকাশ ও সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। আল্লাহ তা'আলার জন্যই সকল শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা।

(ডা. শফিকুর রহমান)
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

মকবুল আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ : জীবন ও কর্ম

[মরহুম মকবুল আহমাদ স্মারক গ্রন্থ রাহবারের জন্য লেখা জমা দিয়েছেন অনেক জ্ঞানী, গুনী ও হীতাকাঙ্খী। কিন্তু বেশ কয়েক জনের লেখায় মকবুল সাহেবের ব্যক্তিগত পরিচিতি, কর্মজীবন, রাজনৈতিক জীবন ও দ্বীনি আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের বিষয়টি উঠে এসেছে। একই তথ্যে ভিন্ন বক্তব্যও দেখা যায়। তথ্য বিভ্রান্তি এড়ানো এবং পুনরুক্তি মুক্ত করার প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট লেখকদের এ অংশটুকুকে একসাথ করে 'মকবুল আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ : জীবন ও কর্ম' শিরোনামে একটি লেখা দিয়ে বাকী লেখা থেকে সংশ্লিষ্ট তথ্যাংশ বাদ দেয়ার ব্যাপারে সম্পাদনা কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়। লেখার অঙ্গচ্ছেদ করলে লেখকের মনে কষ্ট লাগা স্বাভাবিক। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকল লেখকের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। - সম্পাদক]

ফেনী জেলার অন্তর্গত দাগনভূঞা উপজেলার ৩নং পূর্বচন্দ্রপুর ইউনিয়নের ছায়াঘেরা, পাখি ডাকা সবুজের সমারোহে বেষ্টিত এক সুন্দর গ্রামের নাম ওমরাবাদ। যার পূর্ব পাশ ঘেঁষে বয়ে যাচ্ছে সিলোনিয়া নদী। এ নদীর পশ্চিম পাশে অবস্থিত গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম জোতদার পেশায় সার্ভেয়ার (আমীন) জনাব নাদেরুজ্জমানের বাড়ী। সে বাড়ীতে ১৯৩৯ সালের ৮ আগস্ট জনাব নাদেরুজ্জামান ও জনাবা আঞ্জিরের নেছার ঘর আলোকিত করে এক শিশু জন্মগ্রহণ করে। তারা এ প্রিয় সন্তানটির নাম রাখেন মকবুল আহমাদ। এ মকবুল আহমাদ ছিলেন ৫ ভাই ৩ বোনের মধ্যে পঞ্চম আর ভাইদের মধ্যে দ্বিতীয়। সে শিশুটি কালক্রমে বাংলাদেশের রাজনীতি ও ইসলামী আন্দোলনের

ইতিহাসে একসময় যে বিখ্যাত হয়ে উঠবে সেদিন মা-বাবা, ভাই-বোন বা গ্রামবাসী কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু সেটাই আজ বাস্তব সত্য।

ওমরাবাদ গ্রামের নাম ওমরাবাদ কেন হলো সে ইতিহাস জানা নেই। তবে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর নামে নামকরণের পেছনে সে গ্রামের ভূমিপুত্রদের কেউ ইনসাফ আর আদলে সে গ্রামকে অনন্য হিসেবে অত্যুজ্জ্বল ইতিহাস রচনায় কালের সাক্ষী করে রাখার মানসে করেছেন কিনা কে জানে? ওমরাবাদ গ্রামের সকল অধিবাসীই মুসলিম। সে গ্রামের শিশু মকবুল আহমাদ তার শৈশব, কৈশর, যৌবন আর বার্ধক্যের ক্রান্তিকালসহ পুরো জীবন ব্যাপী হযরত ওমরের মত ঈমানী দৃঢ়তা, অসীম সাহসীকতা, কঠিন আমানতদারী, ইনসাফ-আদল আর মানব কল্যাণে ভূমিকা রেখে ওমরের আদর্শকে আবাদ করে গেছেন এ জমিনে। এ মকবুল আহমাদের কারণে হয়তোবা ওমরাবাদ নামকরণের সার্থকতা একদিন ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবে। রাহবারের পাঠকদের উদ্দেশ্যে জনাব মকবুল আহমাদের জীবন ও কর্ম সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

শিক্ষা জীবন :

জনাব মকবুল আহমাদের যখন প্রাইমারী স্কুলে যাওয়ার বয়স তখন চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বর্তমান বাংলাদেশ তখন ব্রিটিশ কলোনী। আর ফেনীতে ছিল ব্রিটিশদের বৃহৎ বিমান বন্দর। সে বিমান বন্দর এখন নেই। কিন্তু বিমান বন্দরের রানওয়ে আর হ্যাঙ্গারগুলো কালের স্বাক্ষী হয়ে আছে। এ বন্দর থেকে প্রতিনিয়ত বোমা নিয়ে উড়ে যাচ্ছে ব্রিটিশ বিমান। এখানে ওখানে বোমা পড়ছে, আকাশ লড়াইয়ে বিমান বিধ্বস্ত হচ্ছে। বিমানের ধ্বংসাবশেষ এদিক সেদিক ছিটকে পড়ছে। সে এক কঠিন পরিস্থিতি। এর মাঝে আবার সে সময় সুনসান পাকা রোড-ঘাট ছিল না। স্কুল ছিল অনেক দূরে দূরে। ভাগ্যবান ছাড়া বেশী শিশু স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পেত না সে সময়। আর যারা এসব দূর-দূরান্তের স্কুলে যেত তাদের ভরসা ছিল স্রষ্টার দেয়া দু'টি পা। মাইলকে মাইল মেঠো পথে ধুলো কাদা মাড়িয়ে সংগ্রাম করেই লেখা পড়া করতে হতো। মকবুল সাহেবের বাড়ীর পাশে নদীর উপর তখনকার সময় ভাল কোন পুল কালভার্ট ছিল না। এসব প্রাকৃতিক বাধা আর যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে মকবুল সাহেবের প্রাইমারী শিক্ষা বর্তমানের শিশুদের চাইতে সম্ভবত দেরীতে শুরু হয়েছিল। তাই মকবুল সাহেব সংগ্রামী জীবন অতিক্রম করে প্রাইমারী শিক্ষা শেষ করেছেন পারিবারিক পরিসরে ও গ্রামীন স্কুলে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর এক সময়কার অফিস সম্পাদক জনাব অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম ছিলেন মকবুল সাহেবের দীর্ঘ দিনের দ্বীনি আন্দোলনের সহকর্মী। তিনি স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেন- "পূর্বচন্দ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে

দাগনভূঞার কামাল আতাতুর্ক হাইস্কুলে ভর্তি হন। অতঃপর তিনি ফেনী পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন।” কিন্তু তিনি নবম শ্রেণিতে পাইলট হাইস্কুলে ভর্তি হয়েও সেখান থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেননি। কারণ বাড়ী থেকে পাইলট হাইস্কুলে পায়ে হেটে ক্লাস করতে কি পরিমাণ কষ্টকর ছিল তা শুধু বর্তমানে কল্পনাই করা যায়। বর্তমান সময়ে মোটর সাইকেলে ফেনী থেকে মকবুল সাহেবের বাড়ী যেতে ৩০/৪০ মিনিটের বেশী সময় লাগে। যা হোক সে কারণে তিনি স্কুল পরিবর্তনে বাধ্য হয়ে জায়লস্কর হাইস্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৫৭ সালে কৃতিত্বের সাথে এ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। তিনি ১৯৫৯ সালে ফেনী কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট পাস করেন এবং ১৯৬২ সালে বি.এ পাস করেন। এখানে মকবুল সাহেবের জাগতিক শিক্ষার সমাপ্তি। কিন্তু দ্বীনি শিক্ষা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

কর্ম জীবন :

বি.এ পাশ করার পর তিনি শিক্ষকতার মত মহান পেশাকে গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে জনাব অধ্যাপক আবু ইউসুফ লিখেন- “প্রথমে তিনি ফেনী উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত ঐ সময়ের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরিষাদি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। কথিত আছে যে, উক্ত বিদ্যালয়ে বিভিন্ন নিয়ম কানুন শক্তভাবে পালন করা হতো। মকবুল সাহেব তখন জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার কারণে তার আচার আচরণে ইসলামের রীতিনীতির প্রতিফলন ঘটেছিল। তাই উক্ত বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী জনাব আবদুল খালেককে তিনি নাম ধরে না ডেকে খালেক ভাই বলে সম্বোধন করার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতির বিপরীত আচরণের অভিযোগ উঠলে তাৎক্ষণিক প্রধান শিক্ষক তাঁকে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেন তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন আবদুল খালেক ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী হলেও সে তো আমাদের মতোই একজন মানুষ। সুতরাং তাকে ভাই ডাকতে সমস্যা কোথায়? তিনি সরিষাদি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪ বছর শিক্ষকতা করেছিলেন। পরবর্তীতে বর্ণিত ঘটনার জের ধরে তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের চাকুরী ত্যাগ করেন এবং শহরে অবস্থিত ফেনী সেন্ট্রাল হাইস্কুলে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ফেনী সেন্ট্রাল হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন।

সাংবাদিকতায় মকবুল আহমাদ :

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম লেখেন- “১৯৭০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত জাতীয় দৈনিক ‘দৈনিক সংগ্রাম’ পত্রিকার ফেনী মহকুমার নিজস্ব সংবাদদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সত্তর দশকের দিকে ‘বাংলাদেশের হোয়াইটগোল্ড’ শিরোনামে বাংলাদেশের কক্সবাজারের চিংড়ি মাছের উৎপাদনের ওপর তার লেখা একটি প্রতিবেদন ব্যবসায়ী জগতে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিষয় ছিল ‘বাংলাদেশের হোয়াইট গোল্ড’ (চিংড়ি

সম্পদ) সৌদি আরবের 'তরল সোনা (পেট্রোল)' কে হার মানাবে।" তিনি সুযোগ পেলে পত্র পত্রিকা বা সাময়িকীতে লেখালেখি করতেন এবং প্রতিভাবানদের লেখালেখি ও সাংবাদিকতায় উৎসাহিত করতেন। মিড়িয়ার গুরুত্ব তাঁর কাছে পরিষ্কার ছিল। তাই তাঁর পরিচিত কেউ সাংবাদিকতায় ঢুকলে এ পেশায় টিকে থাকার জন্য তাকে প্রণোদনা দিতেন। যত বাধা আসুক এ পেশা পরিত্যাগ করতে নিরুৎসাহিত করতেন।

সাংগঠনিক জীবন :

১৯৬২ সালে : জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান।

১৯৬৬ সালে : জামায়াতে ইসলামীর রুকন শপথ নেন।

১৯৬৭-৬৮ সালে : ফেনী শহর নাযেমের দায়িত্ব পালন।

১৯৬৮-৭০ সাল : ফেনী মহকুমা সভাপতির দায়িত্ব পালন।

১৯৭০ সালে : ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ১৯৭১ সালের জুন মাস পর্যন্ত নোয়াখালী জেলা আমীরের দায়িত্ব পালন।

১৯৭১ সালে : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি সংগঠনের চট্টগ্রাম বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। তখন চট্টগ্রাম বিভাগ ছিল চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও সিলেট এর বৃহত্তর জেলা নিয়ে। বিভাগ হিসেবে তখন দেশের এ বিভাগ ছিল সবচেয়ে বড়।

১৯৭৯ সাল : থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত তিনি সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৯ সাল : থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি সহকারী সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৪ সালে : ২০১০ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০১০ সালের : ৩০ জুন থেকে ২০১৬ সালের ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত জামায়াতের তৎকালীন আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে গ্রেফতার করা হলে ভারপ্রাপ্ত আমীরে জামায়াত হিসেবে সংকটকালীন সময়ে নেতৃত্ব দেন।

২০১৬ সালের : ১৭ অক্টোবর তিনি আমীর নির্বাচিত হন এবং ২০১৯

সালের ১২ নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর তৃতীয় নির্বাচিত আমীরে জামায়াত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন সংস্থায় দায়িত্ব পালন :

১৯৮৪ সালে : তিনি ঢাকায় অবস্থিত জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান "ফালাহ্-ই-আম ট্রাস্টের" চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৯৯৭ সাল : থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত তিনি ইসলামী আন্দোলনের পতাকাবাহী জাতীয় পত্রিকা দৈনিক সংগ্রামের মালিকানা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়া তিনি দৈনিক সংগ্রাম ট্রাস্টি বোর্ডের একজন ডাইরেক্টর ছিলেন।

২০০৪ সাল : তিনি বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউটের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিদেশ সফর :

- ১৯৭৬ ও ৭৯ সালে তিনি "রাবেতা আলম আল ইসলামীর" মেহমান হিসাবে দু'বার পবিত্র হজ্জব্রত পালনের জন্য সৌদী আরব সফর করেন।
- জাপান ইসলামী সেন্টারের দাওয়াতে জাপান সফর করেন।
- কুয়েতে প্রবাসী ভাইদের দাওয়াতে তিনি একবার কুয়েত সফর করেন।

সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা :

➢ তাঁর সহযেগিতায় সিলোনিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন 'আল ফালাহ মসজিদ' ও 'উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা (রা.) মহিলা মাদরাসা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

➢ ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০১৬ পর্যন্ত তিনি ফেনীর বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ ফেনী এর নিয়ন্ত্রক ট্রাস্ট 'ফেনী ইসলামিক সোসাইটি'র চেয়ারম্যান ছিলেন।

➢ ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে ফালাহিল মুসলেমিন' নামক ট্রাস্টের তিনি ফাউন্ডার ও আজীবন মেম্বার ছিলেন। এ ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত হয় দেশের টপটেন মাদরাসার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'আল-জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদরাসা ফেনী' এবং ফেনী সদর উপজেলার 'লক্ষীপুর বাইতুল আমিন দাখিল মাদরাসা'।

➢ ১৯৮৮ সালে দাগনভূঞা সিরাজাম মুনিরা সোসাইটির সভাপতি ছিলেন।

- দেশের অন্যতম বৃহৎ ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আধুনিক প্রকাশনী বি.আই ট্রাস্টের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।
- এছাড়া তিনি ঢাকা রহমতপুরস্থ ডা. আবদুস সালাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আশ-শেফা আর রাহমাহ নামক সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন।

সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম :

- অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম লেখেন- "ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সমাজকল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। তার জীবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো মানুষের সেবা করা। ১৯৬২ সালে যুবকদের সহযোগিতায় নিজ গ্রাম ওমরাবাদে "ওমরাবাদ পল্লীমঙ্গল সমিতি" নামের একটি সমিতি গঠন করেন। তিনি উক্ত সমিতির ১০ (দশ) বছর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। সমিতির সভাপতি হিসেবে তিনি স্থানীয় অনেক রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামতের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং গরিব ও অসহায় লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেন।
- ১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি গজারিয়া হাফেজিয়া মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

রাজনৈতিক জীবন :

- ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে জামায়াতের দলীয় প্রার্থী হিসেবে নিজ এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
- ১৯৮৬ সালে জামায়াতের দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ফেনী ২নং আসন থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।
- ১৯৯১ সালে তিনি জামায়াতের দলীয় প্রার্থী হিসেবে আরও একবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।
- ২০১০ সালের জুন মাসের শেষ দিকে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর নিযুক্ত হয়ে দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য গঠিত ২০ দলীয় জোট গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।
- ২০১৬ সালের ১০ অক্টোবর জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে থেকে ২০১৯ সালের ১২ নভেম্বর পর্যন্ত দেশের কঠিনতম পরিস্থিতিতে জামায়াতের আমীর ও ২০ দলীয় জোটের শীর্ষ নেতা হিসাবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সরকারের স্বৈরাচারী আচরণের প্রতিবাদ,

জনগণের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার, এদেশে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং গণমানুষের আধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

পারিবারিক জীবন : জনাব মকবুল আহমাদ ১৯৬৬ সালে লক্ষীপুর জেলা নিবাসী প্রখ্যাত আলেম ও শিক্ষাবিদ ঢাকা আরমানিটোলা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান মাওলানা ওহিদুল হকের কন্যা মুহতারামা সুরাইয়া বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ৩ ছেলে ও ২ মেয়ে সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রী একজন রুকন। ছেলে-মেয়েরাও ইসলামী আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

মৃত্যু :

মৃত্যু মানব জীবনের অনিবার্য পরিণতি। কোন মনিষী এমনকি নবী-রাসূলগণও অমরত্ব লাভ করেননি। সে কারণে একটি পরিণত বয়সে খলিফাতুল্লাহ হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে আল্লাহর একান্ত প্রিয় এ গোলাম ১৩ এপ্রিল ২০২১ইং, মঙ্গলবার, দুপুর ১.০০টায়, ইবনে সীনা হাসপাতালে চিকিৎসাধিন অবস্থায় মহান মনিবের দরবারে হাজিরা দেন। সেদিন ছিল ১৪৪২ হিজরীর ২৯ শে শাবান। দিন শেষে পহেলা রমজানের প্রস্তুতি, সালাতুত তারবীহ। পরদিন থেকে শুরু হচ্ছে করোনা পরিস্থিতির কারণে সর্বাত্বক কঠোর লক ডাউন। তাই ঐ দিন গভীর রাতে নামাজে জানাজা শেষে ওমরাবাদ গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে মরহুমকে সমাহিত করা হয়। জানাযায় ইমামতি করেন বর্তমান আমীরে জামায়াত জনাব ডা. শফিকুর রহমান।

মহান আল্লাহ মরহুমের কবরকে জান্নাতের টুকরায় পরিণত করুন, তাঁর নেক আমলগুলো কবুল করুন, ভুলত্রুটিগুলো নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিন। তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সবরে জামিল ইখতিয়ারের তাওফিক দিন। তাঁর উত্তরসূরীদের আরো বেশী দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনকে কামিয়াবীর মঞ্জিলে পৌঁছে দেয়ার তাওফিক দিন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আ'লামীন।

ঈমানের পরীক্ষা হয় দু:খ-কষ্ট ও মুসিবতের সময়

মুহতারাম মকবুল আহমাদ

মানুষের ঈমানের পরীক্ষা হয় দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবতের সময়। যখন কোনো সংকটকাল আসে, তখন আসল ও মেকীর পার্থক্যটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। খন্দক যুদ্ধ এই কাজটি করেছে। মদীনার মুসলমানদের দলে এক বিরাট সংখ্যক মুনাফিক ও মেকী ঈমানদার ঢুকে পড়েছিলো। তাদের সত্যিকার পরিচয়টা সাধারণ মুসলমানদের সামনে উদঘাটন করার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা এই কাজে বিরোধীদের সকল বাধার পরও তার বান্দাদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতনের কথা আল্লাহ নিজেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু শর্ত হচ্ছে বান্দাদেরকে আল্লাহর সাহায্য ও রহমত পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এই যোগ্যতা অর্জন করার জন্য কিছু গুণাবলী অর্জন করা প্রয়োজন। এ ধরনের অসংখ্য গুণাবলীর কথা মহান আল্লাহ-তায়া'লা ঘোষণা করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয় আলোচনা করা হল-

বান্দাদেরকে আল্লাহর সাহায্য ও রহমত পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এই যোগ্যতা অর্জন করার জন্য কিছু গুণাবলী অর্জন করা প্রয়োজন। এ ধরনের অসংখ্য গুণাবলীর কথা মহান আল্লাহ-তায়া'লা ঘোষণা করেছেন

ধৈর্য সাফল্যের চাবিকাঠি

ঈমানদারদের গোটা পার্থিব জীবনকেই সবর বা ধৈর্যের জীবন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঈমান আনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির নিজের অবৈধ আশা-

আকাঙ্খাকে অবদমিত করা, আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ মেনে চলা, আল্লাহর নির্ধারিত ফরজসমূহ পালন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের সময়, অর্থসম্পদ, নিজের শ্রম, নিজের শক্তি ও যোগ্যতা এমনকি প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রাণ পর্যন্ত কুরবানি করা, এটা সার্বক্ষণিক সবর, স্থায়ী সবর, সর্বাত্মক সবর এবং জীবনব্যাপী সবর।

কুরআনে বলা হয়েছে- তারা দুইবার পুরস্কৃত হবে তাদের সবরের কারণে। তারা ভালো দিয়ে মন্দের জওয়াব প্রদান করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। (সূরা কাসাস- ৫৪)

আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, 'অতএব, আপনি সবর করুন নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন।' (সূরা আল-মু'মিন : ৫৫)

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বর্ণিত আছে, "ধৈর্যশীল ছাড়া এ গুন আর কারো ভাগ্যে জোটে না এবং অতি ভাগ্যবান ছাড়া এ মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না"। (সূরা হামীম আস-সাজদাহ : ৩৫।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 'এর আগে এমন অনেক নবী চলে গেছে যাদের সাথে মিলে বহু আল্লাহ-ওয়ালা লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে তাদের ওপর যেসব মুছিবত এসেছে তাতে তারা মনমরা ও হতাশ হয়নি, তারা দুর্বলতা দেখায়নি এবং তারা বাতিলের সামনে মাথা নত করে দেয়নি। এ ধরনের সবরকারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন।'
(সূরা আলে-ইমরান : ১৪৬)

মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, '(হে মুসলমানগণ) তোমাদের অবশ্যি ধন ও প্রাণের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে এবং তোমরা আহলি কিতাব ও মুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি এমন অবস্থায় তোমরা সবর ও তাকওয়ার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো তাহলে তা হবে বিরাট সাহসিকতার পরিচায়ক।"
(সূরা আলে-ইমরান : ১৮৬)

কুরআনে বর্ণিত আছে, "তোমাদের ভালো হলে তাদের খারাপ লাগে এবং তোমাদের ওপর কোনো বিপদ হলে তারা খুশী হয়। তোমরা যদি সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোনো কৌশল কার্যকর হতে পারে না। তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তা চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে আছেন।"
(সূরা আলে-ইমরান : ১২০)

আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী বইয়ে ধৈর্য্যের চিত্রটি তুলে ধরেছেন এভাবে: 'ধৈর্যের

অর্থ হচ্ছে তাড়াহুড়ো না করা, নিজের প্রচেষ্টার ত্বরিত ফল লাভের জন্য অস্থির না হওয়া এবং বিলম্ব দেখে হিম্মত হারিয়ে না বসা। ধৈর্যশীল ব্যক্তি সারাজীবন একটি উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য অনবরত পরিশ্রম করতে থাকে এবং একের পর এক ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েও পরিশ্রম থেকে বিরত হয় না। মানুষের সংশোধন ও পরিগঠনের কাজ অন্তহীন ধৈর্যের মুখাপেক্ষী। বিপুল ধৈর্য ছাড়া কোনো ব্যক্তি এ কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয় না। তিক্ত স্বভাব, দুর্বল মত ও সঙ্কল্পহীনতার রোগে আক্রান্ত না হওয়া। ধৈর্যশীল ব্যক্তি একবার ভেবেচিন্তে যে পথ অবলম্বন করে তার ওপর অবিচল থাকে এবং একাগ্র ইচ্ছা ও সঙ্কল্পের পূর্ণ শক্তি নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। বাধা বিপত্তির বিরোচিত মোকাবিলা করা এবং শান্তচিত্তে লক্ষ্য অর্জনের পথে যাবতীয় দু:খ কষ্ট বরদাশত করা। ধৈর্যশীল ব্যক্তি যে কোনো ঝড়-ঝঞ্ঝার পর্বত প্রমাণ তরঙ্গাঘাতে হিম্মতহারা হয়ে পড়ে না। দু:খ-বেদনা ভারাক্রান্ত ও ক্রোধান্বিত না হওয়া। যে ব্যক্তিকে সমাজ সংশোধন ও পরিগঠনের খাতিরে কিছু অপরিহার্য ভাঙার কাজও করতে হয়, বিশেষ করে যখন দীর্ঘকালের বিকৃত সমাজে তাকে এ কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়, তখন অবশ্যই তাকে বড়ই নিম্নস্তরের হীন ও বিশ্রী রকমের বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়। যদি সে গাল খেয়ে হাসবার ও নিন্দাবাদ হজম করার ক্ষমতা না রাখে এবং দোষারোপ ও মিথ্যা প্রোপাগান্ডাকে নির্বিবাদে এড়িয়ে গিয়ে স্থিরচিত্তে ও ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে নিজের কাজে ব্যস্ত না থাকতে পারে, তাহলে এ পথে পা না বাড়ানোই তার জন্য বেহতর। কারণ এ পথে কাঁটা বিছানো। এর প্রত্যেকটি কাঁটা এই দৃঢ় মনোবল নিয়ে মুখ উঁচিয়ে আছে যে, মানুষ অন্য যে কোনোদিকে নির্বিঘ্নে অগ্রসর হতে পারে কিন্তু এ দিকে তাকে এক ইঞ্চিও এগিয়ে আসতে দেয়া হবে না। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি কাপড়ের প্রত্যেকটি কাঁটা ছাড়াতে ব্যস্ত হবে সে কেমন করেই বা অগ্রসর হবে। এই পথে এমন সব লোকের প্রয়োজন যারা নিজের কাপড়ে কোনো কাঁটা বিঁধলে কাপড়ের সেই অংশটি ছিঁড়ে কাঁটা গাছের গায়ে রেখে দিয়ে নিজের পথে এগিয়ে যেতে থাকবে।

নৈতিক চরিত্রই আমাদের উত্তম হাতিয়ার :

আল্লাহ তায়া'লা মানুষের সফলতার ও ব্যর্থতার মানদণ্ড হিসেবে শুধুমাত্র দুনিয়ার সফলতাকেই উল্লেখ করেননি। বরং বান্দাহর সফলতা হচ্ছে যে উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন তার ক্ষেত্রে সে কতটুকু সার্থকতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তার উপর। কিন্তু বস্তুবাদী জীবনদর্শনে এই দুনিয়ার ধন-সম্পদ, ক্ষমতা কর্তৃত্বকেই সে সবকিছু মনে করে। এসব কিছু পেলে সে আনন্দে উল্লসিত হয় এবং বলে আল্লাহ আমাকে মর্যাদা দান করেছেন। আবার না পেলে বলে আল্লাহ আমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা কর্তৃত্ব পাওয়া না পাওয়াই হচ্ছে তার কাছে মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মানদণ্ড। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহ দুনিয়ায়

যাকে যা কিছুই দিয়েছেন পরীক্ষার জন্যই দিয়েছেন। ধন ও শক্তি দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। এগুলো পেয়ে মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। কিন্তু মানুষের অবস্থা হচ্ছে যে, আল্লাহ্ বলেন,

> **'তার রব যখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তাকে সম্মান ও নিয়ামত দান করেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আবার যখন তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তার রিযিক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে হেয় করেছেন।' (সূরা আল ফাজর : ১৫ -১৬)**

আমাদেরকে অগণিত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। সবর, দৃঢ়তা, অবিচলতা ও দ্বিধাহীন সংকল্পের মাধ্যমে সমস্ত বিপদ-আপদের মোকাবিলা করে যখন আমরা আল্লাহর পথে এগিয়ে যেতে থাকবো তখনই আমাদের উপর বর্ষিত হবে অনুগ্রহরাশি। আর এই কঠিন দায়িত্বের বোঝা বহন করার জন্য আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তির প্রয়োজন। একটি হচ্ছে নিজের মধ্যে সবর ও সহিষ্ণুতার শক্তি। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে খুশু খুজু আন্তরিকতা সহকারে নিবিষ্ট চিত্তে সদা নামাজ পড়ার মাধ্যমে নিজেকে শক্তিশালী করার শক্তি।

দৃঢ়তা ও সাহসিকতা ঈমানের অনিবার্য দাবি :

একটি আদর্শবাদী দল যখন নিজেদের আদর্শ প্রচার করতে শুরু করে, তখন এই আদর্শের বিরোধী লোকগণ তাদের প্রতিরোধ করতে উদ্যত হয়। ফলে উভয় দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের তীব্রতা যতই বৃদ্ধি পায় আদর্শবাদী দল বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় ততই উন্নত চরিত্র ও মহান মানবিক গুণ মাহাত্ম্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে থাকে। সে তার কর্মনীতি দ্বারা প্রমাণ করে যে, মানব সমষ্টি-তথা গোটা সৃষ্টি জগতের কল্যাণ সাধন ভিন্ন তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। বিরুদ্ধবাদীদের ব্যক্তিসত্তা কিংবা তাদের জাতীয়তার সাথে এর কোনো শত্রুতা নেই। শত্রুতা আছে শুধু তাদের গৃহীত জীবনধারা ও চিন্তা মতবাদের সাথে। তা পরিত্যাগ করলেই তার রক্তপিপাসু শত্রুকেও প্রাণভরা ভালোবাসা দান করতে পারে। বুকের সঙ্গে মিলাতে পারে।

পরন্তু সে আরও প্রমাণ করবে যে বিরুদ্ধ পক্ষের ধন-দৌলত কিংবা তাদের ব্যবসায় ও শিল্পপণ্যের প্রতিও তার কোনো লালসা নেই, তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনাই একমাত্র কাম্য। তা লাভ হলেই যথেষ্ট। তাদের ধন-দৌলত তাদেরই সৌভাগ্যের কারণ হবে। কঠিন ও কঠোরতম পরীক্ষার সময়ও এই দল কোনোরূপ মিথ্যা, প্রতারণা ও শঠতার আশ্রয় নেবে না। কূটিলতা ষড়যন্ত্রের প্রত্যুত্তরে তারা সহজ-সরল কর্মনীতিই অনুসরণ করবে।

প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র উত্তেজনার সময়ও অত্যাচার-অবিচার, উৎপীড়নের নির্মমতায় মেতে উঠবে না। যুদ্ধে ও প্রবল সংঘর্ষের কঠিন মুহূর্তেও তারা নিজেদের নীতি আদর্শ পরিত্যাগ করবে না। কারণ সেই আদর্শের প্রচার প্রতিষ্ঠার জন্যই তো তার জন্ম। এ জন্য সততা, সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি পূরণ, নির্মল আচার-ব্যবহার ও নিঃস্বার্থ কর্মনীতির উপর তারা দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে।

> **আল্লাহ বলেন, 'মনমরা হয়ো না, দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো'। (সূরা আলে ইমরান- ১৩৯)**
> **আল্লাহপাক ঘোষণা করেন, হে ঈমানদারগণ সবরের পথ অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও, হকের খেদমত করার জন্য উঠে পড়ে লাগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।' (সূরা আলে ইমরান- ২০০)**
> **মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বর্ণিত আছে, '(হে মুসলমানগণ) তোমাদের অবশ্যই ধন ও প্রাণের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে এবং তোমরা আহলি কিতাব ও মুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি এমন অবস্থায় তোমরা সবর ও তাকওয়ার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। তাহলে তা হবে বিরাট সাহসিকতার পরিচায়ক। (সূরা আলে ইমরান : ১৮৬)**

আল্লাহ তায়া'লার ওপরই তায়াক্কুল :

যারা আল্লাহ তা'য়ালার উপরই তায়াক্কুল করে তারা দুনিয়ার বৃহত্তম শক্তির পরোয়া করে না এবং মহাপরাক্রমশালী ও দয়াময় সত্তার ওপর নির্ভর করে কাজ করে যায়। যার পেছনে তার সমর্থন আছে তাকে দুনিয়ার কেউ হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে না। তার জন্য যে ব্যক্তি সত্যের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার কাজে জীবন উৎসর্গ করবে তার প্রচেষ্টা তিনি কখনও নিষ্ফল হতে দেবেন না।

> **আল্লাহ বলেন, "(তাদের অবাধ্য আচরণে তুমি মনোক্ষুন্ন হয়ো না, তুমি বরং) সর্বোচ্চ পরাক্রমশালী ও দয়ালু আল্লাহ তায়া'লার ওপরই ভরসা করো।"**
> **(সূরা আশ-শু'আরা : ২১৭)**
> **মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন, (নেককার মানুষ হচ্ছে তারা,) যারা ধৈর্য ধারণ করেছে (এবং সর্বাবস্থায়) নিজেদের মালিকের ওপরই নির্ভর করেছে।"**
> **(সূরা আল-আনকাবুত : ৫৯)**

তারা সত্য পথে পূর্ণ অবিচলতার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে কোনো ক্ষতি বা বিপদের মুখে কখনো সাহস ও হিম্মত হারা হয় না। ব্যর্থতা এদের মনে কোনো চিড় ধরায় না। লোভ লালসায় পা পিছলে যায় না। যখন আপাতদৃষ্টিতে

সাফল্যের কোনো সম্ভাবনাই দেখা যায় না, তখনো এরা মজবুতভাবে সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

নিজেদের আবেগ-অনুভূতি, কামনা-বাসনাকে সংযত রাখে। তাড়াহুড়া করে না। ভীত আতঙ্কিত হওয়া লোভ-লালসা পোষণ করা এবং অসঙ্গত উৎসাহ উদ্দীপনা প্রকাশ থেকে তারা দূরে থাকে। স্থির মস্তিষ্কে এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও যথার্থ পরিমিত বিচক্ষণতা ও ফায়সালা করার শক্তি সহকারে কাজ করে। বিপদ আপদ ও সঙ্কট সমস্যার সম্মুখীন হলেও যেন তাদের পা না টলে, উত্তেজনাকর পরিস্থিতি দেখা দিলে ক্রোধ ও ক্ষোভের তরঙ্গে ভেসে গিয়ে তারা যেন কোনো অর্থহীন কাজ করে না বসে। বিপদের আক্রমণ চলতে থাকলে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে মোড় নিয়েছে দেখতে পেলে মানসিক অস্থিরতার কারণে তাদের চেতনাশক্তি যেন বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল না হয়ে পড়ে। এর মধ্যেই প্রকৃত সবর নিহিত রয়েছে। আর ইহাই তাওয়াক্কুলের মূলকথা।

আল্লাহ বলেন,

> **"কিন্তু যারা পরম ধৈর্য ধারণ করে এবং নেক আমল করে, এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" (সূরা হুদ : ১১)**

মুসলমানদের মন কখনো কখনো কাফেরদের জুলুম নিপীড়ন কূটতর্ক এবং লাগাতার মিথ্যাচার ও মিথ্যা দোষারোপের ফলে বিরক্তিতে ভরে ওঠে। এ অবস্থায় ধৈর্য ও নিশ্চিন্ততার সাথে অবস্থার মোকাবিলা এবং আত্মসংশোধন ও আত্মসংযমের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নামাজের ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়েছে।

নামাজের মাধ্যমে সাহায্য কামনা :

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বর্ণিত আছে,

> **"তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে কিন্তু তাদের ওপর যে মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে এবং যে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তাতে তারা সবর করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে গেছে। আল্লাহর কথাগুলো পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারোর নেই এবং আগের রাসূলদের সাথে যা ঘটেছে তার খবর তো তোমার কাছে পৌঁছে গেছে।" (সূরা আল আন'আম : ৩৪)**
>
> **আল্লাহ পাক কুরআনে ইরশাদ করেন, "সবর ও নামাজ সহকারে সাহায্য নাও নি:সন্দেহে নামাজ বড়ই কঠিন কাজ কিন্তু খোদাভীরুদের জন্য নয়।" (সূরা আল বাকারা : ৪৫)**
>
> **আল্লাহ বলেন, "প্রকৃত পক্ষে রাতের বেলা জেগে ওঠা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক বেশি কার্যকর।" (সূরা আল মুযাযম্মিল-০৭)**
>
> **মহান রাব্বুল আ'লামীন ঘোষণা করেন, "রাতের বেলায়ও তাঁর**

সামনে সিজদায় অবনত হও। রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর তাসবীহ অর্থাৎ পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।" (সূরা দাহর : ২৬)
আল্লাহ তা'য়ালা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, "(হে মুসলমানগণ!) তোমাদের অবশ্যি ধন প্রাণের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে এবং তোমরা আহলি কিতাব ও মুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি এমন অবস্থায় তোমরা সবর ও তাকওয়ার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো তাহলে তা হবে বিরাট সাহসিকতার পরিচায়ক।" (সূরা আলে ইমরান : ১৮৬)
পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, "এই ভরসা করার কারণেই বদরে (যুদ্ধে) আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের বিজয় ও সাহায্য প্রদান করেছিলেন, অথচ (তোমরা জানো) তোমরা কত দুর্বল ছিলে, অতএব আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা (আল্লাহর) কৃতজ্ঞতা আদায় করতে সক্ষম হবে।" (সূরা আলে-ইমরান : ১২৩)

প্রতিশোধ পরায়ন নয় সহনশীল হওয়া :

ইসলামী আন্দোলন বিজয়ী হওয়া, ক্ষমতায় আসীন হওয়া মহান আল্লাহ তা'য়ালার ফায়সালা। সময়ের উত্থান পতনে অনেক সময়ে ক্ষমতাসীন না হলেও ক্ষমতার কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ আসে। তখন প্রতিশোধ নেয়ার একটা উদগ্র বাসনা মাঝে মধ্যে আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে মাথাছাড়া দিয়ে উঠে। ইতিহাস সাক্ষী আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে যারা ব্যস্ত তাদেরই প্রতিশোধের মানসিকতা সৃষ্টি হয়। এটা অবশ্যই পরিতাজ্য। আমরা প্রতিশোধ নয় ক্ষমা করব, প্রতিহিংসা নয় দরদ-ভালোবাসা দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হৃদয় জয় করব ইনশাআল্লাহ।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মক্কা বিজয়ের ইতিহাস দেখুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথীদের দীর্ঘ দুই দশক ধরে নিকৃষ্টতম জুলুম-অত্যাচার পরিচালনাকারী, ঠাট্টা বিদ্রূপকারী, হত্যার ষড়যন্ত্রকারী, দেশ থেকে বিতাড়নকারী, বিনা উস্কানিতে আক্রমণকারী, মিথ্যা অভিযোগকারী, ইসলামের কট্টর শত্রুদের সমস্ত বর্বরতম অপরাধকেও মাফ করে দিলেন। মহান আল্লাহ এ দিকেই ইঙ্গিত করে আল কুরআনে বললেন,

"মন্দের প্রতিদান অনুরূপ মন্দই (হবে), কিন্তু যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোষ করে, আল্লাহ তায়া'লার কাছে অবশ্যই তার (জন্যে) যথাযথ পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি কখনো জালেমদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আশ-শূরা : ৪০)
"যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং (মানুষদের) ক্ষমা করে দেয় (সে যেন জেনে রাখে) অবশ্যই এটা হচ্ছে সাহসিকতার কাজ সমূহের অন্যতম।" (সূরা আশ-শূরা : ৪৩)

মন মগজের পরিবর্তন ক্ষমা, দয়া, অনুগ্রহ ও কোমলতার মাধ্যমেই

সম্ভবপর। ক্রোধ ও প্রতিহিংসা বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত আক্রোশ চরিতার্থ হওয়া ছাড়া কোনো লাভ হয় না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনে আমরা এ মহান গুন দেখতে পাই। কিন্তু আমরা যখন সুযোগ পাই তখন এসব ইতিহাস, মহানুভবতা ভুলে গিয়ে আক্রোশ, ক্রোধ চরিতার্থ করতে গিয়ে মূল আদর্শিক প্রভাব ও বিজয়কে নস্যাৎ করে ফেলি। ইসলামী আন্দোলনের ভাইবোনদের সকল অবস্থায় এদিকে খেয়াল রাখা দরকার। আমাদের এ ধরনের উদার ও মহৎ ব্যবহার অনেকের মন জয় করতে আকৃষ্ট করবে।

রিজিক অন্বেষণে সীমলংঘন না করা :

বর্তমান আওয়ামী তথা ১৪ দলীয় সরকারের অব্যবস্থাপনা ও জুলুমের শিকার হয়ে অসংখ্য মানুষ জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনও মিটাতে পারছে না। বহু শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকার অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার প্রচেষ্টায় দিক হারিয়ে ফেলে, যখন যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই ধরতে চায়। হালাল হারামের সীমা খেয়াল রাখে না বা রাখার চেষ্টা করে না। সুদের কাজ কারবারে লেনদেন, এমএলএম, মালটিপারপাস নামে বৈধ-অবৈধ অনেক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন কোম্পানী বাজারে চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনগণের মন আকৃষ্ট করে। ইসলামী আন্দোলনের ভাইদের এ বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে অংশ নেয়া বা যোগদান করা উচিত। বিশ্বস্ত একজনকে ভালো অফিস ও ভাতা দিয়ে সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করে। প্রয়োজনে ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক বলে প্রচার চালিয়ে ব্যাপক বিনিয়োগ গ্রহণ করে। কিছুদিন পরেই কোম্পানী লা পাত্তা হয়ে যায়। ধৈর্য ধরে আয় রোজগার, চাকরি, কর্মসংস্থানের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে মানুষের আমানত ব্যবহার করে ফাঁদে না পড়ি তা অবশ্যই খেয়াল রেখে চলতে হবে। **(সংক্ষেপিত)**

লেখাটি সাবেক আমীরে জামায়াত মরহুম মকবুল আহমাদের লেখা "ইসলামী আন্দোলনের পথে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত হওয়াই আমাদের কাজ" নামক পুস্তিকা থেকে 'রাহবার' এর সম্মানিত পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হলো। এ প্রবন্ধে উল্লিখিত পরামর্শগুলো ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের চলার পথের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করা সময়ের দাবী। আল্লাহ তায়া'লা মরহুমের এ লেখাকে সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন। তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানিয়ে নিন। আমাদেরকে তাঁর হেদায়াত মেনে চলার তাওফিক দিন। আমীন।

অন্যতম দা'য়ী ইলাল্লাহ, মকবুল আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান,
নায়েবে আমীর ও সাবেক এম. পি.

"তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন। অনেকটা সাদা পাঞ্জাবির মতই ছিলো তার চারিত্রিক ভূষণ। একজন সজ্জন, পরোপকারী, বিনয়ী, সদালাপী, নিরহংকারী, সবরকারী, আত্মপ্রত্যয়ী, পরম আল্লাহ নির্ভরশীল মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন, সত্যের পথে অটল-অবিচল।"

ইন্নাল হামদা লিল্লাহে, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার যিনি মেহেরবানী করে ইকামতে দ্বীনের সংগঠনের সাথে আমাদের জড়িত রেখেছেন- আলহামদুলিল্লাহ। ১৪৪২ হিজরীর রমজানের শেষ দশকে ইতেকাফ করার সময় অতীতে সাবেক আমীরে জামায়াত মকবুল আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ এর বেশ কিছু স্মৃতি মনের আয়নায় ভেসে উঠল।

তিনি ৫০৫, মগবাজার কেন্দ্রীয় অফিস সংলগ্ন চাঁদ জামে মসজিদ এলাকার আগ্রহী জনশক্তিদের নিয়ে রমজানের শেষ দশদিনের এতেকাফ পালন করার লক্ষ্যে একসাথে ইফতার এবং সেহরির জন্য যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিতেন। এ ব্যাপারে তিনি সিকান্দারসহ কেন্দ্রীয় অফিসের সহযোগিতা নিয়ে

কাজগুলো করতেন। লম্বা দস্তরখান, লম্বা মশারী থালা বালতি গ্লাসসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের ব্যাপারে তখনকার কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক জনাব অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম ভাই তাকে সহযোগিতা করতেন। জনাব মকবুল আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ তদানীন্তন আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, (আল্লাহতা'য়ালা তার শাহাদাত কবুল করুন), উনাকেও এতেকাফে দাওয়াত দিতেন। তিনি ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ইতেকাফে যোগ দিতেন। যদি পুরো সময় দিতে না পারতেন তথাপি শেষ দিকে সাতাশে রমজানের শেষের দিনগুলো এতেকাফে বসে যেতেন। মন্ত্রী অবস্থায় নিরাপত্তা সহকারীদের নিয়েও ইতেকাফ করতেন যা ইতিহাসে বিরল।

প্রথম আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম রাহিমাহুল্লাহ পুরোপুরি নিয়মিত এতেকাফ করতেন। দ্বিতীয় আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী রাহিমাহুল্লাহ, (আল্লাহ তায়া'লা তার শাহাদাত কবুল করুন), নিয়মিত এতেকাফ করতেন যদিও মন্ত্রী হিসেবে সরকারী দায়িত্বের কারণে আংশিক সাতাশে রমজানের শেষের দিনগুলো এতেকাফে বসতেন। তৃতীয় আমীরে জামায়াত মকবুল আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ তিনিও শারীরিক ও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে কিছু বাদ গেলেও এতেকাফ করতেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার অসীম মেহেরবাণীতে তাদের সকলের সাথে ইতেকাফ করার মত দুর্লভ সুযোগ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাকে দান করেছেন - আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করুন- আমীন।

ইতেকাফ করার সময় মকবুল ভাই যেসব ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন-

"অপচয় যাতে না হয়, অপচয়কারী শয়তানের ভাই এটা দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। রাতের মুল্যবান সময়গুলো কুরআন তেলাওয়াতে ও ব্যক্তিগত ইবাদাত জিকির আজকারে কাজে লাগানোর জন্য পরামর্শ দিতেন।

লাইট, ফ্যান এমনকি অজুর পানির ট্যাপ কত জোরে অথবা আসতে ব্যবহার করছেন তাও তিনি খেয়াল করতেন। তিনি বলতেন এক মগ পানি নিয়ে অজু করলেই যথেষ্ট। দ্রুত গতিতে পানি ছাড়লে এক বালতি ভর্তি পানি নষ্ট হয়ে যায়।

কোরআন মাজীদ সম্পর্কে বিদেশীর একটি মূল্যবান কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। একজন বিদেশী নওমুসলিম কুরআন হাদিসে বর্ণিত মুসলমান কাকে বলে তিনি বুঝতে পারতেন কিন্তু বাস্তবে মুসলমানদের দেখে তিনি কিছুতেই বুঝতে পারতেন না মুসলমানদের জন্য কি আরেকটি কুরআন আছে? তিনি একবার প্রশ্ন করলেন আপনারা যে কোরআন মানেন সেই কোরআনটি কোথ

য়? কারণ আপনাদের কাজের সাথে আমি যে কোরআন পড়ছি সেটা তো মিলে না। আপনাদের কোরআন অবশ্যই আলাদা আছে, না হলে আপনারা যেসব কাজ-কাম করেন সেগুলো কোথায় পেলেন, তা কোথায় লেখা আছে?

বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দা'য়ী- দা'য়ী ইলাল্লাহ, অন্যতম সিপাহসালার, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর মকবুল আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ (১৯৩৯-২০২১) গত ১৩.৪.২০২১ আমাদেরকে ছেড়ে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন...। ইসলামী আন্দোলনের এক কঠিন সময়ে তিনি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আকর্ষণীয় জীবনের অধিকারী ছিলেন নিবেদিত প্রাণ এই দ্বীনের দা'য়ী সাবেক আমীরে জামায়াত মকবুল আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ। প্রায় ত্রিশ বছর তার সাহচর্যে থেকে দায়িত্ব পালন করার সুয়োগ পেয়েছি। ভুলত্রুটি নিয়েই মানুষ। তার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাছে দোয়া করি তিনি যেন তার জানা অজানা সকল গুনাহ খাতা মাফ করে দেন এবং তার নেক আমলগুলোকে কবুল করে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করেন-আমীন।

> **"আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম একবার এক জানাযায় গেলেন। সেখানে তারা মৃতের প্রশংসা করতে লাগলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। এভাবে তারা আর এক জানাযায় গেলেন সেখানে তারা তার বদনাম করতে লাগলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কথা শুনে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। এ কথা শুনে 'উমার রা. জানতে চাইলেন,'কি ওয়াজিব হয়ে গেছে?' হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,'তোমরা যে ব্যক্তির প্রশংসা করেছ, তার জন্য জান্নাত প্রাপ্তি ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর যার বদনাম করেছ, তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে।' তারপর রাসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা জমিনে আল্লাহর সাক্ষী।' অন্য আর এক বর্ণনার ভাষা হলো তিনি বলেছেন, মু'মিন আল্লাহ তা'আলার সাক্ষী। (সহীহ : বুখারী ১৩৬৭, মুসলিম ৯৪৯।)**

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় দুনিয়ায় মু'মিনগণ আল্লাহ তা'আলার সাক্ষী। একজন মৃত ব্যক্তির ভাল গুণের আলোচনা করতে পারে। যারা দুনিয়া থেকে চলে যায় তাদের কল্যাণের জন্য তাদের ভালো আমলগুলোর উল্লেখ করলে আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়ায় তার স্বাক্ষী হিসেবে কবুল করেন। এই হাদিসকে সামনে রেখেই কিছু কথা বলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

সকলের কাছে আমার আবেদন ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় নয়, তার মৃত্যুর পর যদি কোন নেক কাজের এমন কিছু ঘটনা বা দৃশ্য আপনার জানা থাকে অথচ তা কারো কথায় বা লিখায় আসছে না- তাহলে আপনি তা লিখে অন্যের নিকট জানানোর ব্যবস্থা করলে এটা সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে কাজে লাগবে। হাদীসে এসেছে মৃত ব্যক্তির ভাল আমল উল্লেখ করে তার জন্য দোয়া করা উত্তম। এখন স্মৃতিতে যে সমস্ত ঘটনাগুলোর কথা মনে হচ্ছে সেগুলো থেকে সামান্য কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করছি- ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ

এক.

মরহুম মকবুল আহমাদ ভাই মানুষ হিসেবে অত্যন্ত সহজ সরল সাদা দিলের ব্যতিক্রমী একজন মানুষ ছিলেন। সকলকে অত্যন্ত আপনজন মনে করে কথা বলতেন, দাওয়াত দিতেন ও পরামর্শ দিতেন। অত্যন্ত সহজ সরল ব্যক্তিত্ব মকবুল আহমাদ ১৯৩৯ সালের ৮ই আগস্ট ফেনী জেলার দাগনভূঞা উপজেলার ওমরাবাদ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। "তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন। অনেকটা সাদা পাঞ্জাবির মতই ছিলো তার চারিত্রিক ভূষণ। একজন সজ্জন, পরোপকারী, বিনয়ী, সদালাপী, নিরহংকারী, সবরকারী, আত্মপ্রত্যয়ী, পরম আল্লাহ নির্ভরশীল মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন, সত্যের পথে অটল-অবিচল।"

ফেনীর সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল হাজারী বলেন, 'যাই হোক। এ লোকটা (মকবুল আহমাদ) ভালো ছিলেন। আল্লাহ তাকে বেহেশত নসিব করুন। তাকে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।' (নয়া দিগন্ত) 'মকবুল আহমাদ আমাদের ফেনী অঞ্চলের ভদ্রলোক, ফেনীর কৃতী সন্তান ছিলেন। তিনি এক সময় জামায়াতে ইসলামীর প্রধান (আমীর) ছিলেন। মকবুল সাহেব ইন্তিকাল করেছেন। তার জানাযায়ও তার জনপ্রিয়তা প্রমাণ হয়েছে।' 'তিনি ভদ্রলোক ছিলেন। মনে হয় জীবনে কারো সাথে কোনো দুর্ব্যবহার করেননি। পরহেজগার মানুষ ছিলেন। সৎ মানুষ ছিলেন। তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' তিনি আরো বলেন, 'যারা যেভাবেই নেন না কেন, আমি এই মানুষটাকে সৎ হিসেবেই বিবেচনা করি। এমনকি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও তিনি কোনো ক্ষতিকর ভূমিকায় ছিলেন না। তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগও ছিল না।'

বৃদ্ধ বয়সে এই ফ্যাসিস্ট আওয়ামী জালিম সরকার মিথ্যা সাজানো নাশকতার মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে। তিনি দীর্ঘদিন কারাবরণ করেছেন, নির্যাতিত হয়েছেন কিন্তু দ্বীনের এই রাহবার অটল, মজবুত ছিলেন এবং

বাতিলের কাছে কখনো মাথা নত করেননি।

এ লেখা লিখতে গিয়ে প্রথম যে দৃশ্যগুলো মনে পড়ছে তার অন্যতম দৃশ্য হচ্ছে দাওয়াতি কাজের দৃশ্য। তিনি মগবাজার এলাকার প্রতিবেশী রমনা থানার সাবেক আমির জনাব ডাক্তার আব্দুস সালাম ভাইয়ের সাথে প্রথমদিকে বেশির ভাগ দাওয়াতী কাজ করতেন। এরপরে আমি প্রতিবেশী হিসাবে এবং সাবেক এমপি হিসাবে ও কাছাকাছি হওয়ায় আমাকে সাথে নিয়ে অনেকদিন অনেক জায়গায় অনেকের কাছে দাওয়াতি কাজ করার জন্য গিয়েছিলেন। তার নিকট আত্মীয়-স্বজনের বাসায় যেতেন, বন্ধু-বান্ধবের বাসায় যেতেন এমনকি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বেসরকারি অনেক ব্যক্তির কাছে দাওয়াতি কাজ করতেন, বই নিয়ে যেতেন, বই দিতেন এবং লিখে রাখতেন "এক কিতাব দো মুলাকাত' ফরমুলায় সেই ব্যক্তির নাম টেলিফোন নাম্বার এবং বই দিলেন কত তারিখে সেটাও লিখে রাখতেন। অনেকেই আগ্রহ ভরে দ্বীনের দাওয়াত কবুল করতেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমালোচনা বিরূপ মন্তব্য এমনকি বাসাতে বসতে না দেয়ার মত অসৌজন্যমূলক আচরণ করলে সেখান থেকে ফিরে চলে আসতে হয়েছে। এতে তিনি মন খারাপ করতেন না। তিনি বলতেন নবী-রাসূলগণ এবং সাহাবায়েকেরামগণ দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে কত ধরনের সমালোচনা কত ধরনের বিরোধিতা দুঃখ কষ্ট এমনকি প্রতিরোধের মুখে এ কাজ করে গেছেন । আমাদের এই একটি ছোটখাট কাজ তার তুলনায় অনেক কম।

দাওয়াতী কাজে ইসলামী বই প্রদান করাকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। নিজে সাথে বই নিয়ে যেতেন এবং কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকেও দাওয়াতী কাজের জন্য বই সরবরাহ করতেন

দুই.

তার পারিবারিক সদস্যদেরকে ইসলামী আন্দোলনের পথে সক্রিয় করার জন্য এবং এগিয়ে নিয়ে রোকন করার জন্য আমাদেরকে তার বাসায় দাওয়াত দিতেন। তার পারিবারিক বৈঠকে মেহমান হিসেবে একাধিকবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তিনিও আমাদের পারিবারিক বৈঠকে মেহমান হিসেবে এসেছেন।

তার বাসায় গেলে ভালভাবে মেহমানদারী করতেন। পুরুষদেরকে ড্রইং রুমের মধ্যে এবং দরজার ওপাশে মহিলাদেরকে বসতে বলতেন এবং তিনি নিজেই বৈঠক পরিচালনা করতেন। তাদের কোরআন হাদিস পাঠ, জামায়াতে নামাজ আদায় করার ব্যাপারে দাওয়াতি কাজ করার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিজে নিতেন এবং আমাদেরকে দিয়েও পর্যালোচনা ও পরামর্শের কাজ সম্পন্ন

করতেন। সচিবালয়ও বিভিন্ন অধিদপ্তরে বেশ কয়েকবার একসাথে দাওয়াতী কাজ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে ফেনী নোয়াখালী অঞ্চলের পরিচিত একাধিক কর্মকর্তাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন। কোরআন মাজিদের আয়াতকে সামনে রেখে সম্ভবত তিনি এসব কাজ করতেন। যেখানে আল্লাহ্ বলেন 'কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা' অথবা 'ওয়া আনজির আসিরাতাকাল আকরাবীন', অর্থাৎ- 'তোমরা তোমাদের নিজেকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও', এবং 'তোমাদের নিকট আত্মীয়দের সতর্ক করো।' দেখেছি, দাওয়াতি কাজের ক্ষেত্রে তার কোন অবহেলা ছিল না। বিশ্রামের সময়গুলোকে তিনি দাওয়াতি কাজে ব্যবহার করতেন। ডায়াবেটিস এর সিনিয়র রোগী হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় দুপুরের খাবার সেক্রিফাইস করতেন। বিকল্প কোন দোকানে রুটি কলা কিনে নিজে খেতেন সাথীকে খাওয়াতেন গাড়ির চালককেও খাওয়াতেন। একই মানের একই সাথে একই আইটেম সবাইকে নিয়ে খেতে ভালোবাসতেন।

তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল "আপনাকে রিমান্ডে কি জিজ্ঞাসাবাদ করেছে? তিনি হেসে বললেন,'তারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে আমিও তাদের জিজ্ঞাসা করেছি।' আমি পুলিশ অফিসারদের বলেছি, 'আপনারাতো মুসলমান। আপনারা নামায পড়েন? কুরআন শরীফ পড়তে জানেন? আপনার বিবি পর্দা করেন? সন্তানেরা কুরআন পড়তে জানে?' তারা অবাক হয়ে বলেছে, 'আমাদের আর কেউ এভাবে কোনদিন বলেনি' স্যার! আমি বলেছি,'আপনারা কুরআন-হাদিস পড়ার চেষ্টা করবেন।' অবাক করার বিষয় এ কঠিন সময়েও তিনি দাওয়াত দিতে ভুলে যাননি।"

তিন.

ইনসাফের কাজটা অত্যন্ত মজবুতভাবে করতেন। একদিন অফিসে বসে আছি তিনি একটি ম্যাপ দেখালেন যেখানে অসংখ্য দাগ বিভিন্ন জেলার উপরে দিয়ে রেখেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম মকবুল ভাই ম্যাপের মধ্যে এত দাগ এটা দিয়ে কি বুঝাচ্ছেন ? তিনি বললেন,'আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে সামাজিক কাজ মসজিদ মাদ্রাসা এতিমখানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্কুল হেফজখানা যেসব জেলায় সহযোগিতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সেখানে তিনি দাগ দিয়ে রেখেছেন। দেখা যাচ্ছে কোন কোন জেলায় অনেক দাগ আর কিছু জেলায় কোন দাগ নাই অথবা দু একটা দাগ। তিনি বললেন যেখানে কোন প্রতিষ্ঠান নাই সেখানে দেওয়া উচিত, যেখানে আছে সেখানে না দিয়ে ঐসব জায়গায় ইনসাফ কায়েম করা উচিত। মকবুল ভাই এর ইনসাফের হৃদয় সেদিন ফুটে উঠেছিল তার অফিসে রক্ষিত সেই বসন্ত দাগওয়ালা বিভিন্ন জেলার মানচিত্রে। সে দৃশ্য এখনো মনে পড়ে। অনেক সময় যেসব জেলায় কোন উন্নয়নমূলক

কাজ হয়নাই সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য বৈঠকে বলতেন এবং জোরালোভাবে এগুলো করার জন্য খোঁজখবর নিতেন এবং চেষ্টা করতেন। মকবুল ভাই দুস্থ অসহায় লোকদের খোঁজখবর নিতেন তাদের কাছে তাদের পরিবারে কখনো কখনো সহযোগিতা পৌঁছাতেন বস্তুর আকারে অথবা আর্থিক সহযোগিতা।

চার.

বিশেষভাবে সংগঠনের অসহায় পরিবারগুলোর এবং ইয়াতিম সন্তান-সন্ততিদের খোঁজখবর নিতেন, আর সাহায্য-সহযোগিতা পৌঁছাতেন। তারিখ মনে নেই তবে একদিন আল-ফালাহ বিল্ডিংয়ে আমাদের কয়েক জনকে ডাকলেন। তিনি ডাকলেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের ওই সমস্ত সদস্যদেরকে যাদের অর্থনৈতিকভাবে সংসার টানাটানির মধ্য দিয়ে চলত। সেখানে মাওলানা আবু তাহের সাবেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রাহিমাহুল্লাহ এবং মাহমুদ হোসাইন আল মামুন সাবেক কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য রাহিমাহুল্লাহসহ আমিও সেখানে ছিলাম। তিনি বললেন আমাদের মধ্যে কারও কারও অর্থনৈতিকভাবে সংসার পরিচালনায় সহযোগিতার জন্য আশপাশে কোন ব্যবসা বাণিজ্য অথবা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে কাজ করে সহযোগিতা পান কিন্তু যারা এসব কাজ করার কোন অবকাশ পান না, এ সকল কাজ করার চিন্তাও তাদের মধ্যে থাকে না, শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সহযোগিতার মাধ্যমে জীবন যাপন করেন তাদেরকে কিছু করার জন্য কি করা যায় সে পরামর্শ নিতেন এবং দিতেন। তার মনটাই ছিল যারা অতিরিক্ত কোনো উপার্জন করার সুযোগ পায়না সাংগঠনিক কাজেই পুরো সময়টা ব্যয় করেন তাদেরকে কিছু করে দেওয়া যায় কিনা। তার এ মহৎ উদ্যোগের জন্য সেদিন আমরা তার জন্য আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি। এখনও সেই দৃশ্যগুলো মনে পড়ছে আর দোয়া করছি আল্লাহ তা'আলা তার এই মহৎ কাজকে ও কাজের চেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

পাঁচ.

তিনি যখন বক্তব্য দিতেন তখন নরম গরম মিশিয়ে সুন্দর বক্তব্য রাখতেন। "জামায়াত আইনগত ও রাজনৈতিকভাবে সরকারের সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করবে। সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যই যুদ্ধাপরাধকে ইস্যু বানিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করছে। মূলত সরকার দেশ থেকে ইসলাম বিতাড়নের জন্যই যুদ্ধাপরাধকে ইস্যু বানিয়ে শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে জুডিসিয়াল কিলিং এর মাধ্যমে হত্যা করছে। সরকার এর প্রতিবাদও করতে দিচ্ছে না। কিন্তু জনগণ কাউকে রাজপথ ইজারা দেয়নি। দেশের মানুষ সরকারের এসব দেশ ও জাতিসত্তা বিরোধী ষড়যন্ত্র মেনে নেবে না বরং ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের

মাধ্যমে সরকারের পতন নিশ্চিত করে নেতৃবৃন্দকে মুক্ত করবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সকলকে ময়দানে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের আহবান জানান। তিনি বলেন, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে অবশ্যই আত্মগঠন, পরিবার গঠন ও এলাকা গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আর নিজেকে ইসলামী আন্দোলনের উপযোগী করে তুলতে হলে বেশি বেশি করে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হবে। পরিবারের মধ্যে কেউ আন্দোলনের বাইরে থাকলে তাকেও আন্দোলনে শরীক করতে হবে। এলাকার লোকজনের কাছে উত্তম পন্থায় দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে পারলে অবশ্যই মানুষ তাতে সাড়া দিবে। আর পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে পারলেই ইসলামী আন্দোলনকে গতিশীল করা সম্ভব।"

ছয়.

পরিশেষে মকবুল ভাই উৎসাহ যোগাতেন কিছু লেখার জন্য। তিনি বলতেন অনেকেই আছে সফর করে এসেই সফরকে কেন্দ্র করে কিছু লিখতে পারেন। একবার তিনি নিজে চেষ্টা করলেন তার সফরের জন্য লিখবেন। জাপান থেকে ফিরে এসে কিছু কথা লিখেছিলেন মকবুল ভাই। সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় "জাপান সফর-দেখার অনেক, শিখার অনেক" এ বিষয় তার সফর অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি এবং "ইসলামী আন্দোলনের পথে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত হওয়াই আমাদের কাজ", মোট ২টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। (সৌজন্যে সাপ্তাহিক সোনার বাংলা।)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর জীবনের মহৎ কাজ গুলোকে কবুল করুন এবং তার রেখে যাওয়া সদকায়ে জারিয়ার কাজ এবং কথা যেন আমরা মেনে চলতে পারি অনুসরণ করতে পারি, সংগঠনকে এগিয়ে নিতে পারি এবং ভবিষ্যত ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীল ও কর্মীদের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কিছু রেখে যেতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ তা'আলা দান করুন আমিন।

নিম্নে প্রদত্ত দুআটি সব সময় পড়ছি সকলকে পড়ার জন্য অনুরোধ করছি-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ ، وَنقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَنجِّهِ مِنَ النَّارِ.

"হে আল্লাহ তুমি তাকে মাফ করে দাও, তাকে রহম করো, তাকে নিরাপত্তা

দাও, তাকে সম্মানিত মেহমান হিসেবে কবুল করো, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও, তার গোনাহ্ সমূহকে পানি ও বরফরাশি দ্বারা ধৌত করে দাও, তার গোনাহ্ গুলোকে ঐভাবে পরিষ্কার করে দাও যেভাবে সাদা কাপড় থেকে ময়লা পরিষ্কার করা হয়, তাকে তার বাড়ীর চেয়ে উত্তম বাড়ী দান কর, তাকে তার আহলের চেয়ে উত্তম আহল দান করো, তাকে তার সঙ্গীর চেয়ে উত্তম সঙ্গী দান করো, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, তাকে কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও।"

'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আসহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলায়কা'। সমাপ্ত।

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের আদর্শিক ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ.)

বিশ্বজাহানের মানুষের ব্যাপারে এ বিশিষ্ট কর্মপদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এই যে, স্রষ্টা মানুষকে বিবেক, বুদ্ধি, যুক্তিধর্মিতা, আকাংখা ও স্বাধীন ইচ্ছার যে ক্ষমতা দিয়েছেন এবং নিজের অসংখ্য সৃষ্টির ওপর মানুষকে যে এক ধরনের কর্তৃত্ব ক্ষমতা দান করেছেন, তার মাধ্যমে তিনি পরীক্ষা করতে চান। এ পরীক্ষাকে পূর্ণাংগ রূপ দান করার জন্যে সত্যকে অদৃশ্য করে রেখেছেন এভাবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির পরীক্ষা হয়ে যাবে। মানুষকে নির্বাচনের অবাধ স্বাধীনতা দান করেছেন-এভাবে মানুষ সত্যকে জানার পর কোনো চাপ বা বাধ্যবাধকতা ছাড়াই স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে তার অনুগত হবে অথবা কামনার দাসত্ব গ্রহণ করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, এ বিষয়টির পরীক্ষা হয়ে যাবে। জীবন-যাপনের সরঞ্জাম, উপায়-উপকরণ এবং কর্মের সুযোগ দান না করা হলে তার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার পরীক্ষা হতে পারে না।

পৃথিবীতে মানুষের জন্যে যে জীবন ব্যবস্থাই রচিত হবে তার অনিবার্য যাত্রারম্ভ হবে অতি-প্রাকৃতিক বা ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়াবলী থেকে। মানুষ সম্পর্কে এবং এ পৃথিবী- যার মধ্যে সে বাস করে- তার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা সৃষ্টি না করা পর্যন্ত জীবনের কোনো পরিকল্পনা প্রণীত হতে পারে না। দুনিয়ায় মানুষের আচরণ কেমন হবে এবং এখানে তাকে কিভাবে

কাজ করতে হবে, এ প্রশ্ন আসলে এই পরবর্তী প্রশ্নগুলোর সংগে গভীর সম্পর্ক রাখে যে, মানুষ কি? এ দুনিয়ায় তার মর্যাদা কি? এ দুনিয়ার ব্যবস্থা কোন্ ধরনের, যার সংগে মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে? এ প্রশ্নগুলোর যে সমাধান নির্ণীত হবে, সে পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিকতা সম্পর্কে একটি বিশেষ মত স্থিরীকৃত হবে। অত:পর ঐ মতবাদের প্রকৃতি অনুযায়ী মানব জীবনে বিভিন্ন বিভাগ গড়ে উঠবে। আবার এই কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি চরিত্র ও কর্মকাণ্ড এবং সামষ্টিক সম্পর্ক ও ব্যবহার বিধানাবলী বিস্তারিত রূপ পরিগ্রহ করবে। এভাবে অবশেষে এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে তমুদ্দুনের বিরাট প্রাসাদ নির্মীত হবে। দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত মানব জীবনের জন্যে যতগুলো ধর্ম এবং মত ও পথ তৈরী হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে অবশ্যি নিজের একটি স্বতন্ত্র মৌলিক দর্শন ও মৌলিক নৈতিক মতবাদ প্রণয়ন করতে হয়েছে। এই মৌলিক দর্শন ও নৈতিক দৃষ্টিভংগীই মূলনীতি থেকে নিয়ে খুঁটিনাটি বিষয়েও একটি পদ্ধতিকে অন্যটি থেকে পৃথক করে। কেননা তাদেরই প্রকৃতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি জীবন বিধানের প্রকৃতি গড়ে উঠেছে। তারা জীবন বিধানের দেহে প্রাণের ন্যায়।

জীবন সম্পর্কে চারটি মতবাদ

খুঁটিনাটি বিষয় বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মূলনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে মানুষ ও বিশ্বজাহান সম্পর্কে চারটি অতিপ্রাকৃত (Metaphysical) মতবাদ স্থিরীকৃত হতে পারে। দুনিয়ার যতগুলো জীবন বিধানের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তার প্রত্যেকেই এই চারটির মধ্য থেকে যে কোনো একটিকে অবশ্যি গ্রহণ করেছে।

নির্ভেজাল জাহেলিয়াত

প্রথম মতবাদটিকে আমরা নির্ভেজাল জাহেলিয়াত আখ্যা দিতে পারি। এর মূল কথা হলো ঃ

বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাবলী একটি আকস্মিক ঘটনার বাস্তব প্রকাশ মাত্র। এর পেছনে কোনো প্রজ্ঞা, সদিচ্ছা ও মহান উদ্দেশ্য কার্যকরী নেই। এমনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এটি তৈরী হয়েছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে একদিন হঠাৎ কোনো কার্যকারিতা ছাড়াই শেষ হয়ে যাবে। এর কোনো খোদা নেই আর যদি থেকেও থাকে, তাহলে মানুষের জীবনের সংগে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

মানুষ এক ধরনের পশু। অন্যান্য বস্তুর ন্যায় সম্ভবতঃ ঘটনাক্রমে এখানে তার উদ্ভব হয়েছে। তাকে কে সৃষ্টি করলো এবং কেন সৃষ্টি করলো, এ প্রশ্ন আমাদের নিকট অপ্রাসংগিক। আমরা শুধু এতটুকু জানি যে, এ পৃথিবীতে তার বাস, তার কিছু আশা-আকাংখা আছে - এগুলো পূর্ণ করার জন্যে তার

প্রকৃতি ভেতর থেকে চাপ দেয়। তার কিছু শক্তি ও কয়েকটা যন্ত্র আছে- এগুলো তার আশা-আকাংখাসমূহ পূর্ণ করার মাধ্যম হিসেবে পরিণত হতে পারে। তার চারপাশে দুনিয়ার বিশাল বক্ষ জুড়ে অনেক বস্তু, অনেক সাজ-সরঞ্জাম, দেখা যাচ্ছে- এগুলোর ওপর ঐ শক্তি ও যন্ত্রসমূহ ব্যবহার করে সে তার আশা আকাংখা পূর্ণ করতে পারে। কাজেই নিজের জৈব প্রকৃতির দাবি পূরণ করা ছাড়া মানুষের জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আর এ দাবি পূরণ করার জন্যে উদ্ধৃষ্টতর উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা ছাড়া তার মানবিক শক্তি সামর্থের দ্বিতীয় কোনো কার্যকারিতাও নেই।

মানুষের চাইতে বড় আর এমন কোনো জ্ঞানের উৎস এবং সৎ ও সত্যের উৎপত্তিস্থান নেই, যেখান থেকে সে তার জীবনের জন্যে বিধান লাভ করতে পারে। কাজেই নিজের চারপাশের পরিবেশ, পরিস্থিতি, নিদর্শনাবলী এবং নিজের ইতিহাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে তার নিজেকেই একটি জীবন বিধান রচনা করা উচিত।

বাহ্যতঃ এমন কোনো সরকার দৃষ্টিগোচর হয় না, যার সম্মুখে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। তাই মানুষ স্বভাবতই একটি অদায়িত্বশীল প্রাণী। আর যদি কোনোক্রমে তাকে জবাবদিহি করতে হয়, তাহলে তা করতে হবে তার নিজের সম্মুখে অথবা সেই কর্তৃত্বের সম্মুখে যা মানুষের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়ে মানুষের উপর বিরাজিত।

কার্যাবলীর ফলাফল এই পার্থিব জীবনের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো জীবন নেই। কাজেই দুনিয়ায় প্রকাশিত ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতেই ভুল ও নির্ভুল, ক্ষতিকর ও লাভজনক এবং গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য মীমাংসা করা হবে।

মানুষ যখন নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের পর্যায়ে অবস্থান করে অর্থাৎ যখন নিজের অনুভূতি-গ্রাহ্যের বাইরে কোনো সত্য পর্যন্ত সে পৌছে না অথবা ইন্দ্রিয়ের দাসত্বের কারণে পৌছতে চায় না, তখন তার মনোজগত পূর্ণরূপে এ মতবাদের আওতাধীনে আসে। পার্থিব স্বার্থের মোহে অন্ধ মানুষেরা প্রতি যুগে এ মতবাদ গ্রহণ করছে। মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম ছাড়া সকল রাজা-বাদশাহ, আমীর-ওমরাহ, সভাসদ, শাসক সমাজ, বিত্তশালী ও বিত্তের পিছনে জীবন উৎসর্গকারীরা সাধারণভাবে এ মতবাদকে অগ্রাধিকার দান করেছে। আর ইতিহাসে যেসব জাতির উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির বন্দনা গীত গাওয়া হয়, তাদের প্রায় সবারই সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলে এ মতবাদ কার্যকরী ছিল। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলেও এই মতবাদ কার্যকরী আছে। যদিও পাশ্চাত্য দেশের সবাই খোদা ও আখেরাতকে অস্বীকার করে না এবং চিন্তার দিক দিয়ে সবাই বস্তুবাদী নৈতিকতার সমর্থক নয়, তবুও তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির সামগ্রিক ব্যবস্থায় যে শক্তি ক্রিয়াশীল তা ঐ খোদা ও আখেরাত অস্বীকার এবং ঐ

বস্তুবাদী নৈতিকতার শক্তি। এ শক্তি তাদের জীবনে এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে যে, যেসব লোক চিন্তাক্ষেত্রে খোদা ও আখেরাতকে স্বীকার করে এবং নৈতিকতার ক্ষেত্রে অবস্তুবাদী দৃষ্টিভংগী অনুসরণ করে, তারাও অবচেতনভাবে নিজেদের বাস্তব জীবনে নাস্তিক ও বস্তুবাদী ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা চিন্তার ক্ষেত্রে তারা যে মতবাদের অনুসারী তাদের বাস্তব জীবনের সংগে তার কোনো কার্যকরী সম্পর্ক নেই।

তাদের পূর্বের সমৃদ্ধশালী ও খোদা বিস্মৃত লোকদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। বাগদাদ, দামেস্ক, দিল্লী ও গ্রানাডার সমৃদ্ধশালী লোকেরা মুসলমান হবার কারণে খোদা ও আখেরাত অস্বীকার করতো না। কিন্তু তাদের জীবনের সমস্ত কর্মসূচী এমনভাবে তৈরী হতো যেন খোদা ও আখেরাতের কোনো অস্তিত্ব নেই, কারোর নিকট জবাব দেবার এবং কারোর কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করারও কোন প্রশ্নই নেই। দুনিয়ায় একমাত্র তাদের কামনা-বাসনা, আশা-আকাংখারই অস্তিত্ব আছে। আর এই কামনা-বাসনা পূর্ণ করার জন্যে যে কোনো উপায়-উপকরণ এবং যে কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করার ব্যাপারে তারা স্বাধীন। দুনিয়ায় জীবন-যাপনের যে সময়টুকু পাওয়া গেছে, একমাত্র 'ভোগ ও বিলাসিতার' মাধ্যমেই তার সদ্ব্যবহার হতে পারে।

আগেই বলেছি, এ মতবাদের প্রকৃতিই হলো এই যে, এর ভিত্তিতে একটি নির্ভেজাল বস্তুবাদী নৈতিক ব্যবস্থা জন্মলাভ করে। তা বইয়ের পাতায় লিখিত থাক বা কেবল মানস রাজ্যে চিত্রিত হয়ে থাক, তাতে কিছু আসে যায় না। তারপর ঐ মানসিকতা থেকে জ্ঞান, শিল্প, চিন্তা ও পরিকল্পনার ধারা উৎসারিত এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদের সূক্ষ্মতর শক্তি অনুপ্রবেশ করে। অত:পর এরই ভিত্তিতে ব্যক্তি চরিত্র গড়ে ওঠে। এ নকশা অনুযায়ী মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, আচার-ব্যবহার ও লেন-দেনের যাবতীয় নিয়ম পদ্ধতির রূপ পরিগ্রহ করে। আইন ও সংবিধানের বিকাশ ও অগ্রগতি এরই ভিত্তিতে হয়। সবচাইতে বড় প্রতারক, বেঈমান, আত্মসাৎকারী, মিথ্যুক, ধোঁকাবাজ, নিষ্ঠুর ও কলুষিত হৃদয় সম্পন্ন লোকেরাই এহেন সমাজের উপরিভাগে স্থান লাভ করে। সমগ্র সমাজের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তাদের হাতে ন্যস্ত থাকে। আর তারা শিকল-ছাড়া বাঘের মতো সব রকমের ভীতি ও হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব মুক্ত হয়ে মানুষের ওপর বেদম হামলা চালাতে থাকে। তাদের সমস্ত কূটনীতি মেকিয়াভেলির (Machiavelli) রাজনীতিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। তাদের আইন পুস্তকে শক্তির নাম 'হক' এবং দুর্বলতার নাম 'বাতিল'। যেখানে কোনো বস্তুগত প্রতিবন্ধকতা থাকে না, সেখানে কোনো জিনিসই তাদেরকে যুলুম থেকে বিরত রাখতে পারে না। এ যুলুম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এমন ভয়বাহ রূপ পরিগ্রহ করে যে, শক্তিশালী শ্রেণি নিজের জাতির দুর্বল শ্রেণির লোকদেরকে পিষে ফেলতে থাকে এবং দেশের সীমানা পেরিয়ে বহির্বিশ্বে জাতীয়তাবাদ,

সাম্রাজ্যবাদ, দেশ জয় ও জাতি ধ্বংসের রূপে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে।

শের্ক মিশ্রিত জাহেলিয়াত

দ্বিতীয় অতিপ্রাকৃত মতবাদ শের্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর সারকথা হলো : বিশ্বজাহানের এ ব্যবস্থা কোনো ঘটনাক্রমিক প্রকাশ নয় এবং খোদাহীন অস্তিত্বের অধিকারীও নয়, কিন্তু এর একটি খোদা নয়, বহু খোদা আছে।

এ ধারণা কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণভিত্তিক নয় বরং নিছক কল্পনা নির্ভর। তাই কাল্পনিক, অনুভূতিগ্রাহ্য ও দৃশ্যমান বস্তুর সংগে খোদার শক্তিকে সম্পর্কিত করার ব্যাপারে মুশরিকদের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কোনোদিন হতে পারে না। অন্ধকারে দিশেহারা মানুষরা যার ওপর হাত রেখেছে, তাকেই খোদা বানিয়ে নিয়েছে। খোদার ফিরিস্তিতে হামেশা সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়েছে। ফেরেশতা, জ্বিন, আত্মা, নক্ষত্র, জীবিত ও মৃত মানুষ, বৃক্ষ, পাহাড়, পশু, নদী, পৃথিবী, আগুন ইত্যাদি সবকিছুকেই দেবতায় পরিণত করা হয়েছে। প্রেম, কামনা, সৃষ্টি শক্তি, রোগ, যুদ্ধ, লক্ষ্মী, শক্তি ইত্যাদির ন্যায় অনেক বিমূর্ত ধারণাকেও খোদার আসনে বসানো হয়েছে। সিংহ-মানুষ, মৎস্য-মানুষ, পক্ষী-মানুষ, চার মস্তকধারী, সহস্রভূজ, হস্তিশূণ্ডধারী মানুষ প্রভৃতিও মুশরিকদের উপাস্যে পরিণত হয়ে এসেছে।

আবার এ দেব গ্রন্থীর চতুর্দিকে কল্পনা ও পৌরাণিকতার (Mythology) একটা তেলেসমাতি জগত তৈরী করা হয়েছে। প্রত্যেকটি অশিক্ষিত ও অজ্ঞজাতি এখানে তাদের উর্বর মস্তিষ্ক ও শিল্পকারিতার এমন সব অদ্ভুত ও মজার মজার নমুনা পেশ করেছে যে, তা দেখে অবাক হতে হয়। যেসব জাতির মধ্যে প্রধান খোদা অর্থাৎ আল্লাহর ধারণা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছে সেখানে আল্লাহ তার কর্তৃত্বকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেন আল্লাহ একজন বাদশাহ এবং অন্যান্য খোদারা তাঁর উজির-নাজির, দরবারী, মোসাহেব ও কর্মচারী পর্যায়ের, কিন্তু মানুষ সেই বাদশাহ নামদার পর্যন্ত পৌছতে অক্ষম, তাই অধীনস্থ খোদাদের মারফত যাবতীয় কার্যসম্পন্ন করা হয়, তাদের সংগেই সকল ব্যাপারে সরাসরি সম্পর্ক। অন্যদিকে যেসব জাতির মধ্যে প্রধান খোদার ধারণা নিতান্ত অস্পষ্ট বা একেবারে নেই বললে হয়, সেখানে খোদার যাবতীয় কর্তৃত্ব বিভিন্ন শক্তিশালী লোকদের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে।

নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের পর এই দ্বিতীয় প্রকার জাহেলিয়াতটির স্থান। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ এর স্রোতে ভেসে চলেছে। সবসময় নিম্নতম পর্যায়ের মানসিক অবস্থায় তারা এ পর্যায়ে নেমে আসে। খোদার নবীগণের শিক্ষার প্রভাবে যেখানে মানুষ একমাত্র পরাক্রমশীল খোদার কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে, সেখানে অন্যান্য খোদার অস্তিত্ব বিলুপ্ত

হয়েছে সত্য; কিন্তু নবী, ওলি, শহীদ, দরবেশ, গওস, কুতুব, ওলামা, পীর ও ঈশ্বরের বর-পুত্রদের ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব তবুও কোনো না কোনো পর্যায়ে ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। অজ্ঞ লোকেরা মুশরিকদের খোদাগণকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর সেইসব নেক বান্দাদেরকে খোদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, যাদের সমগ্র জীবন মানুষের কর্তৃত্ব খতম করে একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্যয়িত হয়েছিল। একদিকে মুশরিকদের ন্যায় পূজা-অর্চনার পরিবর্তে ফাতেহাখানি, জিয়ারত, নজরনিয়াজ, উরূস, চাদর চড়ানো, তাজিয়া করা এবং এ ধরনের আরো অনেক ধর্মীয় কাজ সম্বলিত একটি নতুন শরীয়ত তৈরী করা হয়েছে। আর অন্যদিকে কোনো তত্ত্বগত দলিল-প্রমাণ ছাড়া ঐসব নেক লোকদের জন্ম-মৃত্যু, আবির্ভাব-তিরোভাব, কাশফ- কেরামত, ক্ষমতা কর্তৃত্ব এবং আল্লাহর দরবারে তাঁদের নৈকট্যের ধরন সম্পর্কে পৌত্তলিক মুশরিকদের পৌরাণিকবাদের সংগে সর্বক্ষেত্রে সামঞ্জস্যশীল একটি পৌরাণিকবাদ তৈরী করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ 'ওসিলা''রূহানী' 'মদদ''ফয়েজ', প্রভৃতি শব্দগুলোর সুদৃশ্য আবরণের আড়ালে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার যাবতীয় সম্পর্ককে ঐসব নেক লোকদের সংগে জুড়ে দেয়া হয়েছে। যেসব মুশরিকদের মতে বিশ্ব প্রভুর নিকট পৌছবার সাধ্য মানুষের নেই এবং মানুষের জীবনের সংগে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় নীচের স্তরের কর্মকর্তাদের সংগে জড়িত, কার্যতঃ সেসব আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকারকারী মুশরিকের মতো অবস্থা সেখানেও সৃষ্টি হয়। তবে পার্থক্য এতটুক যে, তারা এ নীচের কর্মকর্তাদেরকে প্রকাশ্যে উপাস্য, দেবতা, অবতার অথবা ঈশ্বরের পুত্র বলে থাকে আর এরা গওস, কুতুব, আবদাল, আওলিয়া, আহলুল্লাহ প্রভৃতি শব্দের আবরণে এদেরকে ঢেকে রাখে।

এ দ্বিতীয় ধরনের জাহেলিয়াতকে যুগে যুগে প্রথম ধরনের জাহেলিয়াত অর্থাৎ নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের সংগে প্রায়ই সহযোগিতা করতে দেখা গেছে। প্রাচীন যুগে ব্যাবিলন, মিশর, হিন্দুস্তান, ইরান, গ্রীক, রোম প্রভৃতি দেশের তাহজীব-তমুদ্দুন এ দু'টি জাহেলিয়াতের সহ-অবস্থান ছিল। বর্তমান যুগে জাপানী সভ্যতা সংস্কৃতিরও একই অবস্থা। এ সহযোগিতার বিভিন্ন কারণ আছে, তার মধ্যে কয়েকটি আমি এখানে উল্লেখ করছি।

প্রথমতঃ শের্ক মিশ্রিত জাহেলিয়াতে মানুষের সংগে তার উপাস্যগণের সম্পর্ক হলো এই যে, সে তাদেরকে নিছক কর্তৃত্বশালী এবং লাভ-ক্ষতির মালিক মনে করে এবং বিভিন্ন উপাসনা-আরাধনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার পার্থিব উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাপারে এই উপাস্যগণের করুণা ও সাহায্য লাভ করার চেষ্টা করে। তাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার নৈতিক নির্দেশনামা বা জীবনযাপন সম্পর্কিত আইন কানুন লাভের সম্ভাবনাই নেই। কেননা বাস্তবে সেখানে কোনো খোদা থাকলে তবেই তিনি আইন ও নির্দেশ দিবেন। কাজেই এমন কোনো বস্তু যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে মুশরিকরা নিজেরাই অনিবার্যরূপে

একটি নৈতিক মতবাদ তৈরী করে এবং এ মতবাদের ভিত্তিতে তারা নিজেরাই একটি শরীয়ত প্রণয়ন করে। এভাবে আসলে সেই নির্ভেজাল জাহেলিয়াতেরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্যেই নির্ভেজাল জাহেলিয়াত ও শের্ক মিশ্রিত জাহেলিয়াতের তাহজীব-তমুদ্দুনের মধ্যে এ ছাড়া অন্য কোনো পার্থক্য থাকে না যে, এক স্থানে জাহেলিয়াতের সংগে মন্দির পূজারী এবং নানান ধরনের পূজা ও বন্দনার রীতি প্রচলিত থাকে আর অন্য স্থানে তা থাকে না। নৈতিক চরিত্র ও কর্মের ক্ষেত্রে উভয় স্থানে কোনো পার্থক্য নেই। প্রাচীন গ্রীক ও পৌত্তলিক রোমের নৈতিক প্রকৃতি ও চরিত্রের সংগে আজকের ইউরোপের নৈতিক প্রকৃতি ও চরিত্রের যে মিল দেখা যায়, তার কারণও এই একটি।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা, শিল্প, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির জন্যে শের্ক মিশ্রিত মতবাদ কোনো পৃথক মূলনীতি সরবরাহ করে না। এ অধ্যায়েও একজন মুশরিক নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের পথেই পা বাড়ায় এবং নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের সামাজিক আদর্শের পথেই মুশরিক সমাজের সমগ্র মানসিক ও চিন্তাগত বিকাশ ঘটে। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, মুশরিকদের কল্পনাশক্তি সীমাতিরিক্ত, তাদের চিন্তায় কল্পনা প্রবণতার অস্বাভাবিক আধিক্য দেখা যায়। আর নাস্তিকরা হয় অনেকটা বাস্তবধর্মী, তাই কল্পনাভিত্তিক দর্শনের ব্যাপারে তাদের কোনো প্রকার আগ্রহ নেই। তবে এ নাস্তিকরা খোদা ছাড়াই যখন এ বিশ্বজাহানের গ্রন্থী খুলবার চেষ্টা করে, তখন তাদের যুক্তি প্রমাণের বহর ঠিক মুশরিকদের পৌরাণিকতার (Mythology) মতোই হাস্যকর ও অযৌক্তিক হয়ে পড়ে। মোদ্দাকথা হলো, শের্ক ও নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের মধ্যে কার্যতঃ কোনো পার্থক্য নেই। আজকের ইউরোপ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে তার আধুনিক মতবাদের সূত্র প্রাচীন গ্রীক ও রোমের সংগে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে, যেন মনে হয় সে তাদের সন্তান।

তৃতীয়তঃ নির্ভেজাল জাহেলী সমাজ যে সমস্ত তমুদ্দুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করে, মুশরিক সমাজও সেগুলো গ্রহণ করার জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত থাকে--- যদিও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে শের্ক ও নির্ভেজাল জাহেলিয়াতের পদ্ধতির মধ্যে কিছুটা বিভিন্নতা আছে। শের্কের রাজত্বে বাদশাহদেরকে খোদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় নেতাদের একটি শ্রেণি বিশেষ সম্মানের অধিকারী হয়। রাজবংশ ও ধর্মীয় নেতাদের দল সম্মিলিতভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। এক বংশের ওপর অন্য বংশের এবং এক শ্রেণির ওপর অন্য শ্রেণির শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের একটি স্থায়ী মতবাদ উদ্ভাবন করা হয়। বিপরীত পক্ষে নির্ভেজাল জাহেলী সমাজে এই দোষগুলো বংশ পূজা, জাতি পূজা, জাতীয় সাম্রাজ্যবাদ, একনায়কত্ব, পুঁজিবাদ ও শ্রেণি সংগ্রামের রূপ ধারণ করে। কিন্তু প্রাণশক্তি ও মৌলিক প্রেরণার দিক দিয়ে মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব চাপিয়ে দেয়া, মানুষের দ্বারা মানুষকে খণ্ড-বিখণ্ড করা এবং মানবতাকে বিভক্ত করে এক শ্রেণির জনসমাজকে অন্য শ্রেণির জনসমাজের

রক্ত পিপাসুতে পরিণত করার ব্যাপারে উভয়ই একই পর্যায়ের।

বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়াত

তৃতীয় অতিপ্রাকৃত মতবাদ বৈরাগ্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর সংক্ষিপ্তসার হলো ঃ

এ পৃথিবী এবং এ পার্থিব অস্তিত্ব মানুষের জন্যে কারাগারের শাস্তি স্বরূপ। দেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ মানুষের প্রাণ আসলে একটি শাস্তিভোগী কয়েদী। সমস্ত আমোদ-আহলাদ, কামনা-বাসনা, স্বাদ ও দৈহিক প্রয়োজন আসলে এ কারাগারের শিকল ও লোহার বেড়ী মাত্র। মানুষ এ জগত এবং এর বস্তুনিচয়ের সংগে যতবেশী সম্পর্ক রাখবে, ততই আবর্জনায় তার সারা অংগ ভরে যাবে এবং ততবেশী শাস্তিলাভের অধিকারী হবে। নাজাত ও মোক্ষ লাভের একটি মাত্র পথ আছে। এজন্যে জীবনের যাবতীয় আনন্দ-উচ্ছ্বাস থেকে সম্পর্কচ্যুত হতে হবে। সমস্ত কামনা-বাসনাকে নির্মূল করতে হবে। সকল প্রকার ভোগ পরিহার করতে হবে। দৈহিক প্রয়োজন ও ইন্দ্রিয়ের দাবিসমূহ অস্বীকার করতে হবে। পার্থিব বস্তু সমষ্টি এবং রক্ত মাংসের সম্পর্কের সাথে যুক্ত যাবতীয় স্নেহপ্রেম-ভালোবাসাকে হৃদয় থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। সর্বোপরি নিজের দেহ ও ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুকে ত্যাগ ও সাধনার মাধ্যমে পীড়ন করতে হবে এবং এত অধিক পরিমাণে পীড়ন করতে হবে যেন আত্মার উপরে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকতে না পারে। এভাবে আত্মা সূক্ষ্ম, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়ে যাবে এবং নাজাতের উন্নত স্থানসমূহে উড্ডীন হবার শক্তি অর্জন করবে।

এটি আসলে একটি অসামাজিক মতবাদ। কিন্তু সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর বিভিন্নভাবে এ মতবাদ প্রভাব বিস্তার করে। এর ভিত্তিতে একটা বিশেষ ধরনের জীবন দর্শন গড়ে ওঠে। তার বিভিন্ন রূপ বেদান্তবাদ, মনুবাদ, প্লেটোবাদ, যোগবাদ, তাসাউফ, খ্রীস্টীয় বৈরাগ্যবাদ ও বুদ্ধমত প্রভৃতি নামে পরিচিত। এ দর্শনের সংগে এমন একটি নৈতিক ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে যা খুব কম ইতিবাচক এবং খুব বেশী বরং পুরোপুরি নেতিবাচক হয়। এ দুটি বস্তু সম্মিলিতভাবে সাহিত্য, আকীদা-বিশ্বাস এবং নৈতিক ও কর্ম জীবনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। যেখানে তাদের প্রভাব পৌছায় সেখানে আফিম ও কোকেনের কাজ করে।

প্রথম দু'ধরনের জাহেলিয়াতের সংগে এ তৃতীয় ধরনের জাহেলিয়াতটি সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে সহযোগিতা করে ঃ

১. এ বৈরাগ্যবাদী জাহেলিয়াত সৎ ও ধর্মভীরু লোকদেরকে দুনিয়ার ঝামেলা মুক্ত করে নির্জনবাসী করে তোলে এবং দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের জন্যে পথ পরিষ্কার করে দেয়। অসৎ লোকেরা খোদার দুনিয়ায় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করে অবাধে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় আর সৎ লোকেরা নিজেদের

নাজাত ও মোক্ষ লাভের চিন্তায় তপস্যা ও সাধনায় আত্মনিয়োগে করে।

২. এ জাহেলিয়াতের প্রভাবে জনগণের মধ্যে অবাঞ্ছিত ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভংগীর সৃষ্টি হয় এবং তারা তার সহজ শিকারে পরিণত হয়। এজন্যে রাজা-বাদশাহ্ আমীর-ওমরাহ্ ও ধর্মীয় কর্তৃত্বশালী শ্রেণি হামেশা এ বৈরাগ্যবাদী দর্শনে নৈতিক আদর্শের প্রচার ও বিস্তারে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। আর তাদের ছত্রছায়ায় এ মতবাদ নিশ্চিন্তে বিস্তার লাভ করেছে। সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও পোপবাদের সংগে এ বৈরাগ্যবাদী দর্শনের কোনো কালে কোনো সংঘাত হয়েছে বলে ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে না।

৩. এ বৈরাগ্যবাদী দর্শন মানব প্রকৃতির নিকট পরাজিত হলে নানান রকমের বাহানা তালাশ করতে শুরু করে। কোথাও কাফফারা দানের নীতি উদ্ভাবন করা হয়। এতে করে একদিকে মনের আশা মিটিয়ে গোনাহ্ করা যায়, আবার অন্যদিকে জান্নাতও হাতছাড়া হয় না। কোথাও ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করার জন্যে দেহকেন্দ্রিক প্রেমের বাহানা করা হয়। এর ফলে অন্তরের আগুনে ঘৃতাহুতিও দেয়া হয় আবার সংগে সংগে হুজুরে আ'লার পাক-পবিত্রতার মধ্যেও কোনো পার্থক্য সূচিত হয় না। আবার কোথাও সংসার বৈরাগ্যের অন্তরালে রাজা-বাদশাহ্ ও ধনিকদের সাথে যোগসাজশ করে আধ্যাত্মিকতার জাল বিছানো হয়। এর জঘন্যতম রূপ প্রদর্শন করেছেন রোমের পোপ সম্প্রদায় ও প্রাচ্য জগতের রাজা-বাদশাহ্গণ।

এ জাহেলিয়াত নিজের স্বগোত্রীয়দের সংগে এহেন ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু নবীগণের উম্মতের মধ্যে এর অনুপ্রবেশ আরেক দৃশ্যের অবতারণা করে। খোদার দ্বীনের ওপর এর প্রথম আঘাত হলো এই যে, সে এ দুনিয়াকে কর্মস্থল, পরীক্ষাস্থল ও পরকালের কৃষিক্ষেত্রের পরিবর্তে 'দারুল আজাব' ও মায়াজাল হিসেবে মানুষের সম্মুখে পেশ করে। দৃষ্টিভংগির এ মৌলিক পরিবর্তনের কারণে মানুষ ভুলে যায় যে, তাকে এ পৃথিবীতে খোদার প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছে। সে মনে করতে থাকে, 'আমি এখানে কাজ করার ও পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়াবলী পরিচালনা করার জন্যে আসিনি বরং আমাকে আবর্জনা ও অপবিত্রতার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এ থেকে গা বাঁচিয়ে আমাকে দূরে সরে যেতে হবে। আমাকে এখানে নন-কোঅপারেটর হিসেবে থাকতে হবে এবং দায়িত্ব গ্রহণ করার পরিবর্তে তাকে এড়িয়ে চলতে হবে।' এ ধারণার ফলে পৃথিবী ও তার সমুদয় কার্যাবলী সম্পর্কে মানুষ কেমন যেন সংশয়ী ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং খোদার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দূরের কথা, সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতেও ভয় করে। তার জন্যে শরীয়তের সমগ্র ব্যবস্থা অর্থহীন হয়ে পড়ে। ইবাদত-বন্দেগী ও খোদার আদেশ-নিষেধ যে পার্থিব জীবনের সংস্কার ও খোদার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সম্পাদন করার

জন্যে মানুষকে তৈরী করে, এগুলোর এ অর্থ তাদের নিকট অগ্রাহ্য হয়। বিপরীত পক্ষে সে মনে করতে থাকে যে, ইবাদত-বন্দেগী এবং কতিপয় বিশেষ ধর্মীয় কাজ জীবনের গোনাহসমূহের কাফফারা স্বরূপ। কাজেই কেবল এগুলোকেই পূর্ণ মনোযোগের সংগে যথাযথ পরিমাপ করে সম্পাদন করা উচিত, তাহলেই আখেরাতে নাজাত ও মোক্ষলাভ করা যাবে।

এ মানসিকতা নবীগণের উম্মতের একটি অংশকে মোরাকাবা, মোশাহাদা, কাশফ, রিয়াজাত, চিল্লাদান, অজীফা পাঠ, আমালিয়াত (১), মাকামাত (২) সফর ও হাকীকত প্রভৃতির দার্শনিক ব্যাখ্যার (৩), গোলক ধাঁধায় নিক্ষেপ করেছে। তারা মুস্তাহাব ও নফল আদায়ের ব্যাপারে ফরজের চাইতেও বেশী মনোযোগী হয়েছে। এভাবে খোদার যে প্রতিনিধিত্বের কাজ জারি করার জন্যে নবীগণ তাশরিফ এনেছিলেন, তা থেকে তারা গাফেল হয়ে গেছে। অন্যদিকে আর একটি অংশের মধ্যে কাশফ ও কেরামত, দ্বীনের নির্দেশের ব্যাপারে অযথা বাড়াবাড়ি, অনর্থক প্রশ্ন উত্থাপন, ছোট ছোট জিনিসকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিমাপ করা এবং খুঁটিনাটি ব্যাপারে অস্বাভাবিক মনোযোগ ও যত্ন নেয়ার রোগ জন্ম নিয়েছে। এমনকি খোদার দ্বীন তাদের নিকট এমন একটি হালকা কাঁচপাত্রে পরিণত হয়েছে, যা সামান্য কথায় বা সামান্য ব্যাপারে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে গুড়ো হয়ে যায়, ফলে তাদের মনে সবসময় সন্ত্রস্তভাব বিরাজিত, যেন একটু এদিক ওদিক না হয়ে যায়, তাদের শিরোপরি রক্ষিত কাঁচপাত্র যেন ভেঙে টুকরো টুকরো না হয়ে যায়-এ সন্ত্রস্ততার মধ্যেই তাদের সবটা সময় অতিবাহিত হয়। দ্বীনের মধ্যে এ গভীর সূক্ষ্মতার পথ প্রশস্ত হবার পর অনিবার্যরূপে স্থবিরতা, সংকীর্ণ চিন্তা ও স্বল্প হিম্মত সৃষ্টি হয়। তখন মানুষের মধ্যে উচ্চতর যোগ্যতার চিহ্নই বা কেমন করে অবশিষ্ট থাকতে পারে! পৃথিবী পর্যবেক্ষণকারী দৃষ্টি দিয়ে মানব জীবনের বৃহত্তম সমস্যাবলীকে সে কিভাবে নিরীক্ষণ করতে পারে! কিভাবে ইসলামের বিশ্বজনীন মূলনীতি ও খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে যুগের প্রতিটি আবর্তনে প্রতিটি নব পর্যায়ে সে মানবতাকে নেতৃত্বদান করতে পারে।

ইসলাম

চতুর্থ অতিপ্রাকৃত মতবাদটি পেশ করেছেন খোদার নবীগণ। এর সংক্ষিপ্তসার হলো :

আমাদের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত এ সৃষ্টিজগত, আমরা নিজেরাও এর একটি অংশ বিশেষ-আসলে এক সম্রাটের সাম্রাজ্য। তিনি একে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এর মালিক। তিনিই এর একমাত্র শাসক ও পরিচালক। এ সাম্রাজ্যেআর কারো হুকুম চলে না, সবাই তাঁর নির্দেশের অনুগত আর সমস্ত ক্ষমতা পূর্ণতঃ ঐ একজন মালিক ও শাসকের হাতে কেন্দ্রীভূত।

এ সাম্রাজ্যে মানুষ জন্মগত প্রজা। অর্থাৎ প্রজা হওয়া বা না হওয়া তার ইচ্ছা-নির্ভর নয়। বরং সে প্রজা হিসেবেই জন্মলাভ করেছে এবং প্রজা ছাড়া অন্য কিছু হওয়া তার পক্ষে সম্ভবও নয়।

এ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষের স্বাধীনতা ও দায়িত্বহীনতার কোনো অবকাশই নেই। প্রকৃতগতভাবেও তা হতে পারে না। জন্মগত প্রজা এবং সাম্রাজ্যের একটি অংশ হওয়ার কারণে অন্যান্য অংশগুলো যেভাবে সম্রাটের নির্দেশের আনুগত্য করছে তেমনি তাকেও আনুগত্য করতে হবে, এছাড়া তার জন্যে দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

সে নিজেই নিজের জন্যে জীবন বিধান তৈরী করার এবং নিজের কর্তব্য নিজেই স্থির করার অধিকার রাখে না। তার একমাত্র কাজ হলো মালিকুল মুলক-সম্রাটের পক্ষ থেকে আগত প্রত্যেকটি নির্দেশ পালন করা। এ নির্দেশ আগমনের মাধ্যম হলো 'ওহি'। আর যেসব মানুষের নিকট এ নির্দেশ আসে তারা হলেন নবী।

কিন্তু সে মহান প্রভু মানুষের পরীক্ষার জন্যে সূক্ষ্মতর পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তিনি নিজে প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছেন এবং তাঁর সাম্রাজ্যের নির্দেশদান ও পরিচালনার যাবতীয় ব্যবস্থাকেও প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন। এ রাষ্ট্র এমনভাবে চলছে যে, বাহ্যতঃ এর কোনো শাসক দৃষ্টিগোচর হয় না, কোনো কর্মকর্তাও দেখা যায় না। মানুষ শুধু দেখছে, একটি কারখানা চালু আছে। তার মধ্যে সে নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করছে। সে কারোর অধীনস্ত এবং কারোর নিকট তাকে হিসেব দিতে হবে, তার বাহ্যেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোথাও এটা অনুভূত হয় না। চতুস্পার্শ্বের বস্তুসমূহের মধ্যে এমন কোনো সুস্পষ্ট নিশানীও নেই, যার ভিত্তিতে বিশ্বজাহানের শাসনকর্তার কর্তৃত্ব এবং নিজের অধীনতা ও দায়িত্বশীলতার অবস্থা সকল প্রকার সন্দেহমুক্ত হয়ে প্রকাশিত হতে পারে এবং তা প্রকাশিত হবার পর তাকে স্বীকার করে নেয়া ছাড়া গত্যন্তরও থাকে না। নবীদের আগমন হয়, কিন্তু তাঁদের ওপর যে ওহি নাযিল হয় তা কেউ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে না অথবা কোনো সুস্পষ্ট আলামতও তাদের সংগে প্রেরিত হয় না, যা প্রত্যক্ষ করার পর তাদের নবুয়াত মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আবার একটি সীমারেখার মধ্যে মানুষ নিজেকে পূর্ণ স্বাধীন দেখতে পায়। বিদ্রোহ করার ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়, এর যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ করা হয় এবং দীর্ঘকালীন সুযোগ দেয়া হয়। এমনকি দুষ্কৃতি ও গোনাহের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছতে গিয়ে সে কোনো বাধা পায় না। মালিক ছাড়া অন্য কারোর বন্দেগীকরতে চাইলে তাতেও বাধা দেয়া হয় না। এজন্যে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা হয়-যাকে ইচ্ছা তার বন্দেগী, দাসত্ব ও আনুগত্য করতে পারে। বিদ্রোহ করলে এবং অন্যের দাসত্ব করলে উভয় অবস্থাতেই রেজেকের মধ্যে কোনো পার্থক্য সূচিত হয় না, বরং বরাবর রেজেক লাভ

করতে থাকে। জীবন-যাপনের যাবতীয় সরঞ্জাম, কর্মের উপায়-উপকরণ এবং আয়েশ-আরামের দ্রব্য-সামগ্রী নিজের মর্যাদানুযায়ী বেশ ভালেভাবেই লাভ করতে থাকে এবং আমৃত্যু এ পাওনা পেয়ে যেতে থাকে। কখনো কোনো খোদাদ্রোহী বা অন্যের দাসত্বকারীকে তার এ অপরাধের দরুন পার্থিব সাজসরঞ্জাম এবং জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সরবরাহ্ করা বন্ধ হয়নি। বিশ্বজাহানের মানুষের ব্যাপারে এ বিশিষ্ট কর্মপদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এই যে, স্রষ্টা মানুষকে বিবেক, বুদ্ধি, যুক্তিধর্মিতা, আকাংখা ও স্বাধীন ইচ্ছার যে ক্ষমতা দিয়েছেন এবং নিজের অসংখ্য সৃষ্টির ওপর মানুষকে যে এক ধরনের কর্তৃত্ব ক্ষমতা দান করেছেন, তার মাধ্যমে তিনি পরীক্ষা করতে চান। এ পরীক্ষাকে পূর্ণাংগ রূপ দান করার জন্যে সত্যকে অদৃশ্য করে রেখেছেন এভাবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির পরীক্ষা হয়ে যাবে। মানুষকে নির্বাচনের অবাধ স্বাধীনতা দান করেছেন-এভাবে মানুষ সত্যকে জানার পর কোনো চাপ বা বাধ্য বাধকতা ছাড়াই স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে তার অনুগত হবে অথবা কামনার দাসত্ব গ্রহণ করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, এ বিষয়টির পরীক্ষা হয়ে যাবে। জীবন-যাপনের সরঞ্জাম, উপায়-উপকরণ এবং কর্মের সুযোগ দান না করা হলে তার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার পরীক্ষা হতে পারে না।

এ পার্থিব জীবন একটি পরীক্ষাকাল। তাই এখানে কোনো হিসাব নেই, কোনো শাস্তি ও পুরস্কার নেই। এখানে যা কিছু দান করা হয়, তা কোনো সৎকর্মের পুরস্কার নয় বরং পরীক্ষার সামগ্রী এবং যে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ আসে তাও কোনো অসৎ কর্মের শাস্তি নয় বরং যে প্রাকৃতিক বিধানের ওপর দুনিয়ার এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত প্রধানতঃ তারই আওতায় এগুলো স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ ঘটে (৪)। কর্মের আসল হিসাব, যাচাই-বাছাই এবং সে সম্পর্কে রায় দানের সময় আসবে এ পার্থিব জীবন শেষ হবার পর, তারই নাম আখেরাত। কাজেই দুনিয়ায় যাকিছু প্রকাশিত হয়, তা কোনো পদ্ধতির অথবা কোনো কর্মের ভুল বা নির্ভুল, ভালো বা মন্দ এবং গ্রহণযোগ্য বা পরিত্যাজ্যের মানদণ্ডে পরিণত হতে পারে না। আসল মানদণ্ড হলো আখেরাতের ফলাফল। আখেরাতের কোন্ পদ্ধতি এবং কোন্ কর্মের ফল ভাল বা মন্দ হবে, তার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীগণের ওপর অবতীর্ণ ওহির মাধ্যমে লাভ করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষেপে বলতে গেলে আখেরাতের লাভ-ক্ষতি যার ওপর নির্ভর করে তাহলো এই যে, প্রথমত: মানুষ নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও যুক্তিবাদীর নির্ভুল ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাই যে তার আসল শাসক তা জানতে পারে কিনা এবং তাঁর পক্ষ থেকে যেসব নির্দেশ প্রেরণ করা হয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করতে পারে কিনা। দ্বিতীয়ত: এ সত্য অবগত হবার পর সে (নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও) স্বেচ্ছায়ও সাগ্রহে আল্লাহর কর্তৃত্ব এবং তাঁর নির্দেশাবলীর সম্মুখে আনুগত্যের শির নত করে কিনা।

সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকে নবীগণ এ মতবাদ পেশ করে এসেছেন। এ মতবাদের ভিত্তিতে বিশ্বজাহানের যাবতীয় ঘটনাবলীর পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা হয়।

বিশ্বের দৃশ্যমান বিষয়সমূহের সুস্পষ্ট অর্থ জ্ঞাত হওয়া যায়। কোনো পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ মতবাদ ভুল প্রমাণিত হয়না। এর ভিত্তিতে জাহেলিয়াতের জীবন দর্শন থেকে মূলগতভাবে পৃথক একটি স্বতন্ত্র জীবন দর্শন গড়েওঠে।এ জীবন দর্শন বিশ্বজাহান ও মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিপুল তথ্যাবলী জাহেলিয়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতিতে সংকলন ও পরিবেশন করে। সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ ও অগ্রগতির জন্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ তৈরী করে-জাহেলিয়াত সৃষ্ট সাহিত্য-শিল্পের পথগুলো হয় তার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। জীবনের সমস্ত ব্যাপারে সে একটি বিশেষ দৃষ্টিভংগী এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সৃষ্টি করে- প্রাণশক্তি ও মৌলিকতার দিক দিয়ে জাহেলী উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভংগীর সংগে তার কোনো সামঞ্জস্য নেই। সে একটি পৃথক নৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করে-জাহেলী নৈতিকতার সংগে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আবার ঐ তাত্ত্বিক ও নৈতিক বুনিয়াদের ওপর যে সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাসাদ নির্মীত হয়, তা হয় সমস্ত জাহেলী সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে একটি পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ জাহেলিয়াতের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতি সমূহের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। সারকথা হলো এই যে, এ সভ্যতার শিরা-উপশিরায় যে প্রাণশক্তি সক্রিয়, তা এক সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন খোদার কর্তৃত্ব, আখেরাত বিশ্বাস এবং মানুষের অধীনতা ও দায়িত্বশীলতার কথা ঘোষণা করে। বিপরীত পক্ষে প্রত্যেকটি জাহেলী সভ্যতার সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের অবাধ স্বাধীনতা, বল্গাহারা উচ্ছৃংখল প্রবৃত্তি ও দায়িত্বহীনতার প্রেরণা অনুপ্রবেশ করে থাকে। তাই নবীগণের প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা-সংস্কৃতির মাধ্যমে মানবতার যে নমুনা তৈরী ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন হয় তার আকৃতি, প্রকৃতি, রূপ ও রং জাহেলী সভ্যতা-সংস্কৃতি সৃষ্ট নমুনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এই পার্থক্য তার প্রতিটি অংশে ও প্রতিটি দিকেই স্বতঃস্ফূর্ত।

অতঃপর এর ভিত্তিতে তমুদ্দুন যে বিস্তারিত রূপলাভ করে তা সমগ্র দুনিয়ার অন্যান্য নকশা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়ে। পবিত্রতা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, জীবন-যাপন পদ্ধতি, সামাজিক রীতি-নীতি, ব্যক্তি চরিত্র, জীবিকা উপার্জন, অর্থ ব্যয়, দাম্পত্য জীবন, সাংসারিক জীবন, বৈঠকি নিয়ম-কানুন মানুষ ও মানুষের সম্পর্কের বিভিন্ন আকৃতি, লেন-দেন, অর্থ বণ্টন, রাষ্ট্র পরিচালনা, সরকার গঠন, রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ও দায়িত্ব, পরামর্শ পদ্ধতি, সিভিল সার্ভিস সংগঠন, আইনের মূলনীতি, মূলনীতির ভিত্তিতে রচিত বিস্তারিত বিধানাবলী, আদালত, পুলিশ, হিসাব-নিকাশ, কর, ফিনান্স, জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সংবাদ সরবরাহ, শিক্ষা এবং অন্যান্য যাবতীয় বিভাগের নীতি, এমনকি সেনাবাহিনীর শিক্ষা ও সংগঠন এবং যুদ্ধ

ও সন্ধির নীতিও এ তমুদ্দুনে এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। প্রতিটি অংশে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা তাকে অন্যান্য তমুদ্দুন থেকে আলাদা করে রাখে। প্রতিটি বিষয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে একটি বিশেষ দৃষ্টিভংগী, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য এবং একটি বিশেষ নৈতিক আচরণ সক্রিয় থাকে, যার সম্পর্ক থাকে এক খোদার সার্বভৌম কর্তৃত্ব, মানুষের অধীনতা ও দাসত্ব এবং দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতের গন্তব্যের সংগে।

ফুট নোট :

১. আমালিয়াত-তার চাইতে বড় বে-আমলের পদ্ধতি আজ পর্যন্ত মানুষ আবিষ্কার করতে পারেনি।

২. দুনিয়ার মাকামাত নয় রূহানী মাকামাত-আধ্যাত্মিক জগত।

৩. যেমন ধরুন সর্বেশ্বরবাদ।

৪.এর অর্থ এ নয় যে, এ দুনিয়ায় আদতে কোনো প্রতিবিধান ব্যবস্থা কার্যকরী নেই। বরং যা আমি বলতে চাই, তাহলো এই যে, এখানকার প্রতিবিধান ও প্রতিফল দ্ব্যর্থহীন, চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট নয় এবং পরীক্ষার দিকটি সবরকমের পার্থিব শাস্তি ও পুরস্কারের ওপর কর্তৃত্বশালী। তাই এখানে যে কর্মফল প্রকাশিত হয় তাকে নৈতিক ভালো-মন্দের মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করা যায় না।

লেখাটি নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (রহ.) এর লেখা "ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন" গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়। মরহুম মকবুল আহমাদ স্মারক গ্রন্থ 'রাহবার' এর পাঠকদের খেদমতে তা পেশ করলাম। যাতে পাঠক বুঝতে পারেন এ আন্দোলনের ফাউন্ডার আমীর কি ঐতিহাসিক ও দ্বীনি প্রয়োজনে ভারতীয় উপমহাদেশে ইক্বামতে দ্বীনের আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। সে প্রয়োজন ও বিশ্লেষণ আজো পুরণো হয়ে যায়নি, তার আবেদন শত সহস্রগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মহান আল্লাহ তায়া'লা মরহুমের যাবতীয় খেদমত কবুল করে তাঁকে জান্নাতে আ'লা মর্যাদায় অভিষিক্ত করুন। আমীন।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের এক সিরাজুম মুনির মকবুল আহমাদ (রহ.)

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

তাঁর জীবনকে পর্যালোচনা করলে খলিফাতুল মুসলেমিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর স্বভাব চরিত্রের অধিক মিল পাওয়া যায়। হযরত আবু বকর (রা.) যেমন মু'মিনের জন্য "রুহামায়ু বাইনাহুম" এবং কাফিরের জন্য "আশিদ্দায়ু আলাল কুফ্‌ফার" চরিত্রের ছিলেন তেমনি মকবুল আহমাদ (রহ.) একই চিন্তা চেতনার মানুষ ছিলেন।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের যে ক'জন কিংবদন্তী ছিলেন তাদের অন্যতম মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.)। যাঁর পুরো জীবনটাই ছিল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে নিবেদিত। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যে মানুষটি বাতিলের সাথে আপোষ করেননি, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কাউকে এক বিন্দুও ছাড় দেননি। হাসপাতালের বেডে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করলেও শাহাদাতের তামান্না চির জাগরুক ছিল তাঁর হৃদয়ে। একজন আপাদমস্তক নিখাদ ভদ্র, সহনশীল তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন মানুষ ছিলেন মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.)।

যেভাবে স্মৃতির প্রহর শুরু :

১৯৮৮ এর কোন এক শুভ্রতার শিশির ভেজা সময়ে তিনি যখন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন তখন সাংগঠনিক সফরে খুলনায় আগমন করলে দ্বীনের এই পতাকাবাহির সাথে প্রথম স্বশরীরে মোলাকাতের সৌভাগ্য হয়। একজন আপাদমস্তক সাংগঠনিক ব্যক্তি হিসেবে আমি তাঁকে প্রথম দেখায় আবিষ্কার

করি। এই ক্ষণজন্মা মানুষটিকে প্রথম দেখায় মনে হয়েছিল তিনি চলাফেরায় সাধারণ হলেও আসলে তিনি অতি সাধারণ কেউ নন। তাঁর সাধারণ অবয়বের মাঝে লুকিয়ে ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি। স্মৃতির প্রহর সে ১৯৮৮ থেকে শুরু হয়ে তা মরহুমের কফিন নিজ কাঁধে বহন করা পর্যন্ত অটুট ছিল।

একজন সফল দা'য়ী ইলাল্লাহ্ :

একজন দা'য়ী ইলাল্লাহর যতগুলি গুণ থাকা দরকার তার সবটুকুনই ছিলো মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) এর নিকট। তিনি ছিলেন একজন ২৪ ঘন্টার দায়ী। সার্বক্ষণিক দায়ী বলতে যাকে বুঝায় তিনি ছিলেন ঠিক তাই। একজন মিশনারী হিসেবে মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্বপর্যায়ে যেখানে যখন পা বাড়াতেন সাথে করে দাওয়াতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে কিছু পুস্তক সাথে রাখতেন। যাকে যেভাবে পারতেন বই উপহার দিয়ে দাওয়াতী কাজ শুরু করতেন। তিনি এতটা নিবেদিত দা'য়ী ছিলেন যে, পুলিশ রিমান্ডে জেরাকারি পুলিশকে পর্যন্ত দাওয়াত দিতে ভুলে যাননি। একজন পুলিশ কর্মকর্তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খোঁজ-খবর নিয়ে তিনি শেষ করেননি উল্টো তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতের নসিহত করে একজন নির্ভিক দা'য়ীর ভূমিকা পালন করেন। সার্বক্ষণিক তাঁর সাথে একটি নোটবুক রাখতেন। যখন যাকে যেভাবে পেতেন তার নাম নোটবুকে এন্ট্রি করে রাখতেন। সুযোগ পেলেই তাকে ফোন করে দাওয়াতী কাজ করতেন। অথবা স্থানীয় দায়িত্বশীলের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির খোঁজ খবর রাখতেন।

মকবুল আহ্মাদ মানুষ না কি ফেরেশতা!!! :

২০১৭ সালের ৯ অক্টোবর বর্তমান আমীরে জামায়াত মুহতারাম ডা. শফিকুর রহমান, মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) ও আমি একসাথে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হই। এমতাবস্থায় মকবুল আহমাদ (রহ.) কে ১০ দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেয়া হয়। পুলিশ রিমান্ডে এতটা নির্ভিক ও সাহসী ছিলেন যে, পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদের আগেই তিনিই পাল্টা পুলিশকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। পুলিশ কর্মকর্তার পারিবারিক, ব্যক্তিগত সব বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে একটি নোটবুকে টুকে নেন এবং বলেন তিনি কারাগার থেকে বের হলে পুলিশ কর্মকর্তার জন্য কিছু ইসলামী সাহিত্য পাঠাবেন। পুলিশ কর্মকর্তা তার অনুপম চরিত্রে বিমুগ্ধ হয়ে শারীরিক নির্যাতনের বিপরীতে উল্টো মকবুল আহমাদ (রহ.) কে অযুর গরম পানির ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সার্বিক ব্যবস্থাপনা করে দেন। পরবর্তীতে সেই পুলিশ কর্মকর্তা বলেছিলেন, 'মকবুল আহমাদ সাহেব মানুষ নাকি ফেরেশতা?' রিমান্ডে অসংখ্য রাজবন্দীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি কিন্তু এতটা নির্ভিক, সাহসী ও আদর্শের সাথে আপোষহীন ব্যক্তি দ্বিতীয় আরেকজনকে পাইনি।

কোরআনের আয়নায় মকবুল আহমাদ (রহ.) :

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সূরা ফুরক্বানের ৬৩-৭৪নং আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একজন মু'মিনের যতগুলি গুণাবলি বর্ণনা করেছেন মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) এর কাছে তার সমস্ত গুণাবলি বিদ্যমান ছিল। আল কোরআনে মু'মিনের কাঠামোয় যতগুলো আয়াত বর্ণিত হয়েছে সবগুলো আয়াত দিয়ে পরিমাপ করা হলে দেখা যাবে সাবেক আমীরে জামায়াত প্রায় সবগুলো মানদন্ডে উত্তির্ণ হবেন। তাঁর জীবনকে পর্যালোচনা করলে খলিফাতুল মুসলেমিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর স্বভাব চরিত্রের অধিক মিল পাওয়া যায়। হযরত আবু বকর (রা.) যেমন মু'মিনের জন্য "রুহামায়ু বাইনাহুম" এবং কাফিরের জন্য "আশিদ্দায়ু আলাল কুফ্‌ফার" চরিত্রের ছিলেন তেমনি মকবুল আহমাদ (রহ.) একই চিন্তা চেতনার মানুষ ছিলেন।

তাওয়াক্কুল আলাল্লাহর প্রকৃষ্ট উদাহরণ : আমাদের সাবেক রাহবার ছিলেন সার্বক্ষণিক তাওয়াক্কুল আলাল্লাহর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রসঙ্গক্রমে বলি ২০১১ সালের ২৯ জুন আমাদের তৎকালীন আমীরে জামায়াত শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রহ.), নায়েবে আমীর আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (হাফি.) ও সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ (রহ.) গ্রেফতার হলে জামায়াতের সবচেয়ে দু:সময়ের কান্ডারী হিসেবে ভারপ্রাপ্ত আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.)। এমতাবস্থায় তিনি আমাকে খুলনা থেকে ডেকে জরুরী ঢাকায় নিয়ে আসেন। ঢাকায় এনে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের আইনজীবীদের সাথে সার্বিক বিষয়ে সমন্বয় করার জন্য দায়িত্ব দেন। আমি সার্বক্ষণিক ট্রাইব্যুনালের কার্যাবলী আমীরে জামায়াতকে অবহিত করতাম। ট্রাইব্যুনালে বিচারের নামে প্রহসন নিয়ে এবং সার্বিক বিষয়ে আমি খুব দু:চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়তাম। মাঝে মাঝে বিচলিত হয়ে চিন্তিত হয়ে পড়তাম। ট্রাইব্যুনালের প্রহসন দেখে অনেকটা নিশ্চিত হচ্ছিলাম আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে অন্যায়ভাবে জুডিশিয়াল কিলিংয়ের দিকে ধাবিত করছে। এমন অনুভূতির সময়ে মাঝে মাঝে আমীরে জামায়াতকে হতাশার কথা বললে, তিনি বলতেন, "বর্তমানে আমাদের উপর যা কিছু চলছে তা সম্পর্কে কি শুধু আমি আর আপনি জানি? নাকি মহান আল্লাহও জানেন?" এই একটি বাক্যেই আমার যাবতীয় হতাশা মুহূর্তের মাঝেই উবে যেত। তখন মনে হতো রাসুল (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.) গারে ছাওর এর ঘটনা। যে মুহূর্তে কাফিরেরা আল্লাহর রাসূল (সা.) ও আবু বকর (রা.) হত্যার একেবারে নিকটে পৌঁছে গেলে আবু বকর (রা.) এর খানিকটা হতাশার মুহূর্তে রাসূল (সা.) বলেছিলেন- 'হতাশ হয়োনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।' এ কঠিন দু:সময়ে মহান আল্লাহর উপর ভরসা থেকে তিনি এক চুল পরিমাণও হতাশ হননি,

দু:চিন্তাগ্রস্থ হননি। সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা রেখেই সারাদেশের সমস্ত জনশক্তিকে বুকে আগলে রেখেছিলেন।

ন্যায় ও ইনসাফের বাতিঘর :

সংগঠনের সর্বস্তরের ন্যায় ও ইনসাফের বাতিঘর ছিলেন মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.)। তিনি ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় কাউকে ছাড় দিতেন না। এই প্রসঙ্গে অতিতের একটি ঘটনা শুনা যায় যখন আমীরে জামায়াত মরহুম আব্বাস আলী খাঁন (রহ.) ভারপ্রাপ্ত আমীরে জামায়াত ছিলেন তখন মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) কেন্দ্রীয় বাইতুলমাল বিভাগের দায়িত্বশীল ছিলেন। একদা খাঁন সাহেব (রহ.) সাংগঠনিক সফরে বিদেশ সফরে গেলে অনেক উপঢৌকন নিয়ে ফিরে আসেন। কিছু উপহার খাঁন সাহেব (রহ.) স্বাভাবিক ভাবেই বাসায় নিয়ে যেতে চাইলে মকবুল সাহেব পরামর্শ সুলভ দৃষ্টিতে বলেন, আপনি আমীরে জামায়াত হিসেবে বিদেশ সফর করেছেন এই উপহারগুলো আপনাকে নয় আমীরে জামায়াতকে মানুষ দিয়েছেন। সুতরাং এই উপহারের প্রকৃত মালিক আপনি নন। প্রকৃত মালিক হলো বাইতুলমাল বিভাগ। সকল হাদিয়া বাইতুলমাল বিভাগে জমাদান করা উচিত বলে আমি মনে করি। এমন সাহসী পরামর্শে যেন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ও হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রা.) এর ঘটনা মনে করিয়ে দেয়। খাঁন সাহেব (রহ.) আনন্দচিত্তে সকল হাদিয়া বাইতুলমালে জমা দিলেন। এরপর মকবুল আহমাদ (রহ.) বলেন, উপহারগুলো এখন বাইতুলমালের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। আর বাইতুলমালের অধিপতি আমীরে জামায়াত। এখন এই বাইতুলমালের সম্পত্তি বন্টন নিয়ে আমীরে জামায়াত সম্পূর্ণ এখতিয়ার রাখেন। খাঁন সাহেব (রহ.) বন্টন না করে পাল্টা বাইতুলমালের দায়িত্বশীল হিসেবে মকবুল আহমাদ (রহ.) কে বন্টনের দায়িত্ব প্রদান করেন এবং শুকরিয়া আদায় করেন, যতদিন উম্মতের 'আমীন' হিসেবে আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) এর মত মকবুল আহমাদরা থাকবেন ততদিন এই দ্বীনি কাফেলা আদর্শচ্যুত হবে না। সেই ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে জামায়াতের দায়িত্বশীলদের সাংগঠনিক সফরের হাদিয়া বাইতুলমালের সম্পত্তিতে পরিগণিত হয়ে আসছে। ন্যায় ও ইনসাফের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.)।

নিরহংকার ও সাধাসিধে জীবন যাপনে অনন্য ব্যক্তিত্ব :

সাবেক রাহবারে জামায়াত ছিলেন একজন শতভাগ নিরহংকার ও সাধাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত অনন্য ব্যক্তিত্ব। তার নিরহংকারের প্রমাণ পাওয়া যায় তিনি জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিসের সকল কর্মচারীকে আপনি বলে সম্বোধন করতেন। কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলতেন না। ঢাকা শহরের ভিতরে কখনো সংগঠনের প্রাইভেট গাড়ি ব্যবহার করতেন না। অধিকাংশ জায়গায় বেবী-টেক্সি/সিএনজিতে যাতায়াত করতেন। তিনি একেবারে সাধামাটা জীবন

যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি উচ্চ বিলাসী চিন্তার মানুষ ছিলেন না। কখনো খাদ্যের মেন্যুতে ডাল, ভাজি আর এককাপ ভাত ছাড়া মাছ অথবা মাংস খেতেন না। তার খাদ্য গ্রহণের একটি জলন্ত উদাহরণ পাওয়া যায় তার ছেলের শশুরের কাছে। তিনি ২০১৮ সালের দিকে কারাগার থেকে বের হলে তাকে দেখতে ঢাকার বাসায় যান। স্বাভাবিক ভাবে প্রতিদিন রাতে মকবুল আহমাদ (রহ.) ২টা রুটি ও হালকা ভাজি খেতেন। সেইদিন রাতে ২টা রুটির পরিবর্তে দেড়টা রুটি খান। পুত্রবধুকে বলেন "বউমা তুমি মনে করেছিলে কারাগারে পুলিশ রিমান্ডে তোমার শশুরের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছে, তাই রুটির সাইজ হয়তো তিনি ভুলে গেছেন, তুমি আজকের রুটি একটু মোটা করে তৈরী করেছ, তাই আমি একটা রুটির অর্ধেকাংশ রেখে দিয়েছি।" এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণ হয় তিনি কতটা সাধাসিধে ও স্বাভাবিক জীবন পরিচালনার মানুষ ছিলেন। তিনি কখনো ভুল বা অপরাধের জন্য কাউকে ভর্ৎসনা করতেন না। সবাইকে আপন হিসেবে দরদী কণ্ঠে বুঝিয়ে বলতেন।

সংকটে সাহসী বলিয়ান নেতৃত্ব :

মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) ছিলেন এ যাবতকালে জামায়াতে ইসলামীর সবচেয়ে সংকটকালীন সময়ের দায়িত্বশীল। যে মুহূর্তে প্রতিদিন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপর একের পর এক বিচারের নামে প্রহসন চলছিল, প্রতিনিয়তই দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকেই শাহাদাতের খবর আসতো, হাজারো গ্রেফতার, মামলা, হামলা আহত পঙ্গুত্ববরণ কিংবা গুম-খুনের ঘটনা যখন ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। একে একে পাঁচ শহীদের কফিন কাঁধে নেয়ার পাশাপাশি কারাভ্যন্তরে শহীদ সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম (রহ.), শায়খুল হাদিস মাওলানা একেএম ইউসুফ (রহ.), অধ্যাপক একেএম নাজির আহমদ (রহ.) সহ অসংখ্য খুন রাঙ্গা মুহূর্তে আমীর হিসেবে জনশক্তিকে সাহসের দিশা দিয়েছেন। লিখেছিলেন সাহসের একটি গ্রন্থ "ইসলামী আন্দোলনে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত হওয়াই আমাদের কাজ।" উক্ত গ্রন্থটি পড়লেই বুঝা যায় তিনি সংকটে কতটা হতাশা মুক্ত ছিলেন।

ছিলনা কোন ব্যাংক একাউন্ট ও টেক্স ফাইল :

মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) এর কোন ব্যাংক একাউন্ট বা টেক্স ফাইল ছিল না। ঢাকা শহরে কোন বাড়ী ছিল না। নিজস্ব কোন গাড়ী ছিল না। পুলিশি রিমান্ডে মকবুল আহমাদ (রহ.) কোন টেক্স ফাইল তলব করে না পাওয়ায় পুলিশ কর্মকর্তারা বিস্মিত হয়েছিলেন। তারা অবাক হয়েছিলেন যে দেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী দলের প্রধানের কোন ব্যাংক একাউন্ট নাই। এটা দ্বারা বুঝা যায় মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) কতটা নির্লোভ ও দুনিয়া বিমুখ ছিলেন।

যাদের ছোহবতে ধন্য ছিলেন :

মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) যেসব মহান দায়িত্বশীলদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তাদের মাঝে প্রধানতম ব্যক্তি ছিলেন বানিয়ে জামায়াত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মাওদূদী (রহ.)। মওদূদী (রহ.) অখন্ড পাকিস্তান আমলে যখন পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন তখন মকবুল আহমাদ (রহ.) তার সান্নিধ্য পান । ১৯৬৫ সালে ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনে গণসংযোগের সময় মাওলানা যখন ফেনী সফর করেন তখন প্রথম মাওলানার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন তিনি। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা আমীর মাওলানা আবদুর রহীম (রহ.), মাওলানা আবদুল খালেক (রহ.), অধ্যাপক গোলাম আযম (রহ.) মরহুম আব্বাস আলী খাঁন(রহ.), ইঞ্জিনিয়ার খুররম জাহ মুরাদ, শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রহ.) প্রমুখ দায়িত্বশীলবৃন্দের ছোহবত লাভ করেন।

যেভাবে মহান রবের ডাকে সাড়া দিলেন : এই মহান দ্বীনের দা'য়ী ৮২ বছর বয়সে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। কিছুদিন বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থতার কোলে ঢলে পড়লেও তিনি হাসপাতালের আইসিউতেও নির্ভীক ছিলেন। হাসপাতালে যখন উনাকে দেখতে আমীরে জামায়াতসহ আমরা যাই তখন তিনি উল্টো আমাদের সান্তনা দিতেন। শেষ সময়েও আইসিউর বেডে শুয়ে শুয়ে অমুক ব্যক্তির চাকুরী হয়েছে কিনা? অমুক ব্যক্তির পরিবারের কি অবস্থা এভাবে আমাদের জিজ্ঞাসা করতেন। আইসিউর বেডেও নিজে আমাদের সাথে হাত তুলে দোয়ায় শামিল হতেন। শেষ বিদায়ের আগেও মলিন চেহারায় ছিলেন না তিনি। হাসতে হাসতে বলতেন আমার কোন কষ্ট হচ্ছেনা। আমি স্বাভাবিক আছি। আমার জন্য আপনারা দু:চিন্তাগ্রস্থ হবেন না। কর্তব্যরত চিকিসৎকদের পরিবারের খোঁজ খবর নিতেন। চিকিৎসকদেরকে বারবার বলতেন আপনারা আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবেন না অন্য রোগীকে একটু দেখুন। এই ছিলো অন্তিম সময়ে তার চরিত্র। চিরচেনা জান্নাতি হাসিমুখেই তিনি দুনিয়ার সফর শেষ করে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

রাজনৈতিক বিরোধীদের দৃষ্টিতে তিনি : দ্বীনের এই পতাকাবাহীর শেষ বিদায়ের স্বাক্ষী হতে গিয়েছিলাম ফেনীর দাগনভূঁঞা উপজেলার ওমরাবাদ গ্রামে। সেইদিনটি এমনিতেই ১লা রমজান, তদুপরি সরকার ঘোষিত কঠোর লকডাউনের ১ম দিন। ভেবেছিলাম খুব বেশি জনসমাগম হবে না। ঢাকায় সরকারি বিধি-নিষেধের কারণে জানাযার আয়োজন সম্ভব না হওয়ায় এমনিতেই কিছুটা হতাশ ছিলাম। কিন্তু ফেনীর জানাযায় আমীরে জামায়াতের নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য হলো এবং সকল দল মতের মানুষের গণ জোয়ার দেখে তাজ্জব হলাম। সেকি জনস্রোত। গভীর রজনীতেও জনতার স্রোত যেন শেষ হওয়ার নয়। সকল বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, জনপ্রতিনিধি সবাই একবাক্যে যেভাবে মরহুমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বক্তব্য রাখছিলেন তাতে অভিভূত হয়েছি। কঠিন বিপরীত

রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও একজন মানুষ কিভাবে সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারেন তা উক্ত জানাযায় না গেলে উপলব্ধি করতে পারতাম না। তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বি ফেনীর এক সময়ের মুকুটহীন সম্রাট বর্তমান কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের সভানেত্রীর উপদেষ্টা জয়নাল আবেদীন হাজারী উনার ইন্তেকালে ভূয়সী প্রশংসা করে তার জন্য যে মন্তব্য করেছিলেন তা প্রার্থিব জগতে একটি বড় ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি। যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল বার বার মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর চেষ্টা করলেও ফেনীর কোন রাজনৈতিক বিরোধী শক্তিও উনার বিপক্ষে স্বাক্ষ্য প্রদান করার স্পর্ধা দেখায়নি। এতে প্রমাণিত হয় তিনি একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী মানুষ ছিলেন।

শেষ বিদায়ে ইতিহাস রচনা করে গেলেন : ঐতিহাসিক জানাযা শেষে দাফনের প্রাক্কালে রচিত হলো আরেকটি ইতিহাস। আমি একজন খাটিয়া বহনকারী হিসেবে সেই ইতিহাসের নিকটতম প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। সাবেক রাহবারে জামায়াতকে কবরে নামানোর ক্ষেত্রে সেই ইতিহাস রচনা হল। বর্তমান আমীর জামায়াত মুহতারাম ডা. শফিকুর রহমান নিজেই কবরে নেমে মরহুমের বড় ছেলেকে সাথে নিয়ে নিজ হাতে প্রাণপ্রিয় দায়িত্বশীলকে কবরে শায়িত করলেন। বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনে এটি একটি জীবন্ত ইতিহাস। মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) জীবিত থাকা অবস্থায়ও ছিলেন জীবন্ত এক ইতিহাস। শেষ বিদায়েও রচনা করে গেলেন আরেকটি ইতিহাস। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন ইতিহাসে এমন বিরল ঘটনা আর ঘটেনি। বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসেতো বিরলই বটে।

একজন মকবুল আহমাদের জন্য সম্মানিত আমরা। সম্মানিত ফেনীবাসী, সম্মানিত সমগ্র বাংলাদেশ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জান্নাতে মাকামে আ'লা দান করুন। আমাদেরকে উনার রেখে যাওয়া কাজকে সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন॥

লেখক- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক এমপি।

খাঁটি মুমিন হতে হলে তাগূতের পাক্কা কাফির হতে হবে

অধ্যাপক গোলাম আযম

ঈমান আনার সময়েই এ বিষয়ে সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আল্লাহর মর্জি, ইচ্ছা ও হুকুমের বিরোধী যত বড় শক্তিই হোক, এমন কোনো তাগূতকে কোনো অবস্থায়ই মেনে নেব না। একমাত্র প্রভু হিসেবে যাঁর নিকট আশ্রয় নিয়েছি তিনিই আমার একমাত্র রব, বাদশাহ ও ইলাহ। তিনিই সর্বাবস্থায় আমার জন্য যথেষ্ট। হাসবুনাল্লাহ।

সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

> فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا
>
> অর্থাৎ- যে 'তাগুত'- এর প্রতি কুফরী করে ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে এমন মযবুত রশি ধরে, যা কখনো ছিঁড়বে না।

কুরআন মাজীদে আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম গুণাবলি উল্লেখ করার পর এ আয়াতে তিনি বলেছেন, আল্লাহর যে পরিচয় আয়াতুল কুরসীতে দেওয়া হলো তাঁর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনতে হলে একটা শর্ত পূরণ করতে হবে। শর্তটি হলো 'তাগূতের কাফির হওয়া'। প্রথমে তাগূতের পাক্কা কাফির হতে হবে। তারপর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে সত্যিকার খাঁটি মুমিন হওয়া সম্ভব। তাগূতকে মানতে অস্বীকার না করে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তাদের ঈমান মোটেই মযবুত নয়। কারণ, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে আল্লাহর সাথে বান্দাহর যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তা তাগূতের দাপটে ছিন্ন হয়ে যায়। তাই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আগেই তাগূতকে না মানার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তাগূতের পরিচয় কী?

কুরআনের কোনো কোনো বাংলা অনুবাদ 'তাগূত' অর্থ দেখেছি 'শয়তান'। শয়তান অবশ্যই একটি তাগূত। কিন্তু তাগূত শব্দের অর্থ শয়তান নয়। তাগূত শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা জানা অত্যন্ত জরুরী। যদি তাগূত সম্পর্কে সঠিক ধারণাই না থাকে তাহলে এর প্রতি কুফরী করা কেমন করে সম্ভব হবে? কুফরী করার অর্থ মানতে অস্বীকার করা। কারা কারা তাগূত তা জানা না থাকলে কীভাবে মানতে অস্বীকার করবে? طَاغُوتِ (তাগূত) আরবী শব্দ। এর বাংলা অনুবাদ হলো সীমা লঙ্ঘনকারী। طَغٰى মানে সীমা লঙ্ঘন করেছে। ফিরাউন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে 'ইন্নাহূ তাগা' অর্থাৎ- নিশ্চয়ই সে সীমা লঙ্ঘন করেছে। তাই সীমা লঙ্ঘন করা বলতে কী বোঝায়, তা জানতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা কতক কাজ করতে আদেশ করেছেন, আর কতক কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি মানুষকে আদেশ পালন করতে যেমন বাধ্য করেন না, তেমনি নিষিদ্ধ কাজ থেকে ফিরে থাকতেও বাধ্য করেন না। তিনি মানুষকে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার ইখতিয়ার বা ক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহর নাফরমানি করার এ ক্ষমতার দুটো সীমা তিনি ঠিক করে দিয়েছেন। একটা প্রাথমিক সীমা, অপরটি চূড়ান্ত সীমা।

প্রাথমিক সীমা হলো ফিস্‌ক (فِسْقٌ)। আর চূড়ান্ত সীমা হলো কুফর (كُفْرٌ)। ফিস্‌ক মানে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা। আর কুফর হলো হুকুমকে অস্বীকার করা। যে নামায আদায় করা আল্লাহর হুকুম বলে স্বীকার করে; কিন্তু নামায পড়ে না, সে কাফির নয়; বরং ফাসিক। যে আল্লাহর হুকুমকেই অস্বীকার করে, সে কাফির।

যে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার এ দুটো সীমা লঙ্ঘন করে, সে হলো তাগূত। ঐ সীমা কীভাবে লঙ্ঘন করা হয়, তা বুঝতে পারলেই তাগূতকে চেনা যাবে। যেমন- কয়েকজন মুসলমান যুবক বন্ধু তাস খেলছে। আযান শুনে তাদের একজন 'নামাযে যাই' বলে উঠে গেল। আর সবাই বলে উঠল, আরে বস্‌, খেলাটা নষ্ট করিস্‌ না। এ বয়সেই মোল্লা হয়ে গেলি? যারা তাকে নামাযে যেতে বাধা দিল তারা নামাযকে অস্বীকার না করলেও নিজেরা নামাযে গেল না। তাই তারা ফাসিক। তারা নিজেরা ফাসিক হতে পারে, এর ইখতিয়ার তাদের আছে; কিন্তু আল্লাহর এক বান্দাহকে নামায থেকে ফিরিয়ে রাখার কোনো ইখতিয়ার তাদের নেই। তাদের এ কাজটি ফিস্‌ক্-এর সীমা লঙ্ঘন। নিজে ফাসিক হওয়ার ব্যাপারে স্বাধীন, কিন্তু অন্যকে ফাসিক বানানোর অধিকার নেই।

তেমনিভাবে যে কাফের তার কুফরী করার ইখতিয়ার আছে বটে, কিন্তু যদি সে অন্য লোককে ঈমান আনতে বাধা দেয়, ঈমানদারকে কুফরী করতে বাধ্য

করে বা চেষ্টা করে তাহলে সে কুফরীর সীমা লঙ্ঘন করল।

আল্লাহ্ বলতে চান, দেখ্ তোকে আমি এ স্বাধীনতা দিয়েছি যে, ইচ্ছা করলে ফাসিক হবি বা কাফির হবি। আমার অবাধ্য হওয়ার সীমা এটুকুই। তোকে পৃথিবীতে একাই পাঠিয়েছি। একাই আমার কাছে ফিরে আসবি। তোর বিচারও আলাদাভাবেই করা হবে। আমার দেওয়া শাস্তিও তোকে একাই ভোগ করতে হবে। কিন্তু অন্য কাউকে আমার অবাধ্য বানানোর চেষ্টা করার কোনো ইখতিয়ার তোকে দিইনি। আমার অবাধ্যতার সীমাও তুই লঙ্ঘন করলি।

যেসব শক্তি প্ররোচনা দিয়ে, ধোঁকা দিয়ে, লোভ দেখিয়ে বা ভয় দেখিয়ে মানুষকে আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে চেষ্টা করে তারাই তাগূত। তারা মানুষকে আল্লাহর অবাধ্য বানিয়ে তাদের হুকুমের গোলাম বানাতে চায়।

কারা তাগূতী শক্তি?

তাগূতের সংজ্ঞা জানা গেল। কোন্ কোন্ শক্তিকে তাগূত বলা যায় তা চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে কেমন করে তাগূতকে মানতে অস্বীকার করা যাবে? এটা অত্যন্ত জরুরী। তাগূতের কুফরী করতে হলে তাগূতকে ঠিকভাবে চিনতে হবে।

কুরআন থেকে কয়েক রকমের তাগূতকে চেনা যায়। এসবকে ভালোভাবে চিনতে পারলেই তাগূতকে অমান্য করা সম্ভব। পাঁচ রকমের শক্তিকে তাগূত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যথা-

১. নাফস ও শয়তান; ২. ইসলাম বিরোধী প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতি; ৩. শাসনশক্তি; ৪. রিয্ক বন্ধ করার ভয় দেখানোর শক্তি; ৫. অন্ধ আনুগত্যের দাবিদার শক্তি।

১. নাফস ও শয়তান :

মানবদেহটি আসল মানুষ নয়। কুরআনের ভাষায় 'রূহ' হলো আসল মানুষ। এটা নৈতিক সত্তা বা বিবেক। কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ, তা বোঝার শক্তিকেই মানুষ বলা হয়। এটা বস্তু নয়। এর অস্তিত্ব সব মানুষই অনুভব করে।

দেহ বস্তু দিয়ে তৈরি। অন্যান্য পশুর যেমন বিবেকশক্তি নেই, দেহেরও নৈতিক চেতনা নেই। বস্তুজগতের প্রতি দেহের প্রবল আকর্ষণ। এটাই স্বাভাবিক। দেহের যাবতীয় দাবিকে একসাথে নাফস বলা হয়। বাংলায় একে প্রবৃত্তি বলা যায়। সকল মানুষেরই এ তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে যে, প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ এমন কিছু করে ফেলে, যা বিবেক সমর্থন করে না। করার পর

বিবেক দংশন করে। মানুষের মধ্যে এ দুটো সত্তাই রয়েছে। একটি বস্তুসত্তা, অপরটি নৈতিক সত্তা।

নাফসের যেহেতু নৈতিক চেতনা নেই, তাই যা করা নৈতিক দিক দিয়ে উচিত নয়, তা করার জন্য সে দাবি জানায়। আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার জন্য নাফস তাড়না দেয়। তাই নাফস বা প্রবৃত্তিই হলো এক নম্বর তাগূত। নাফসের হুকুম অমান্য করার সিদ্ধান্ত ছাড়া আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা অর্থহীন। কারণ, নাফসকে অমান্য করা ঈমানের দাবি বলে না জানলে ঈমান আনা সত্ত্বেও নাফসের গোলামি চলতে থাকবে। এ ঈমানের কোনো মূল্য নেই।

সূরা নাযি'আতের ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.

অর্থাৎ- "আর যে (আখিরাতে) নিজের রবের সামনে খাড়া হওয়ার ভয় করে এবং নাফসকে অসৎ কামনা থেকে ফিরিয়ে রাখে, বেহেশতই হবে তার ঠিকানা"। নাফস শব্দের অর্থ আগেই লিখেছি 'প্রবৃত্তি'। এ আয়াতে هَوَىٰ শব্দটির অর্থ কুপ্রবৃত্তি।

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, বেহেশত পেতে হলে নাফসের দাবিকে অগ্রাহ্য করতে হবে। প্রবৃত্তিকে কুপ্রবৃত্তি হওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখতে হবে। ঈমানের উদ্দেশ্য তো বেহেশতে যাওয়াই। যদি নাফস নামক তাগূতকে মানতে অস্বীকার করা না হয় তাহলে বেহেশত পাওয়া যাবে না।

শয়তান তো অবশ্যই তাগূত। সে সব সময় আল্লাহর হুকুম অমান্য করার জন্য কুমন্ত্রণা দেয়। কিন্তু সে মানুষকে জোর করে নাফরমানি করাতে পারে না। সে মানুষের নাফসকে তার অনুগত বা বাধ্য করে। তাই শয়তানকে নাফস থেকে আলাদা কোনো শক্তি হিসেবে গণ্য করা যায় না। এ কারণেই প্রথম নম্বর তাগূত হিসেবে নাফসের সাথে শয়তানকে গণ্য করা উচিত। যারা তাগূত শব্দের অর্থ শয়তান লিখেছেন তারা তাগূতের মর্ম বুঝেননি।

২. সামাজিক কুপ্রথা :

ইসলাম বিরোধী বা শরীআতের সীমার বাইরে যত রীতিনীতি ও প্রথা সমাজে চালু রয়েছে, এ সবকে তো কুপ্রথাই বলতে হয়। আইনের চেয়েও এদের শক্তি অনেক বেশি। আইন প্রয়োগ করার জন্য সরকারি শক্তির প্রয়োজন হয়; কিন্তু

সামাজিক কুপ্রথা নিজের শক্তিতেই চালূ থাকে। এমনকি আইন করেও কুপ্রথা বন্ধ করা যায় না। যেমন যৌতুক প্রথা। যৌতুকবিরোধী কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও এ কুপ্রথা বেড়েই চলেছে। আলেম সমাজের জোরদার ওয়ায-নসীহত সত্ত্বেও মাযার পূজার জৌলুশ কমছে না। বিয়ে-শাদিতে তো কুপ্রথার কোনো সীমাই নেই।

এসব কুপ্রথা বিরাট তাগূতি শক্তি। আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কুপ্রথা হুকুম চালিয়েই যাচ্ছে। এসবকে অমান্য করার সিদ্ধান্ত না থাকলে ঈমান আনা সত্ত্বেও আল্লাহর নাফরমানি চলতেই থাকবে। সূরা বাকারার ১৭০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

অর্থাৎ- "যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যেসব হুকুম নাযিল করেছেন তা পালন কর, তখন তারা বলে, আমরা তো তা-ই করব, যা আমাদের বাপ-দাদাকে করতে দেখেছি।"

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আগেই যদি কুপ্রথাকে অমান্য করার ফায়সালা না করা হয় তাহলে ঈমান আনা সত্ত্বেও এ তাগূতী শক্তিকে মেনে চলতে থাকবে।

৩. শাসনশক্তি :

আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে হুকুম করার সুযোগ তো শাসনশক্তির হাতেই সবচেয়ে বেশি। তাই এটা অত্যন্ত শক্তিমান তাগূত। ফিরাউন ও নমরূদ শাসনশক্তির দাপটেই তো মানুষকে আল্লাহর বদলে তাদের দাস বানাত। তাই ঈমান আনার আগেই যদি এ বিষয়ে চেতনা না থাকে যে, আল্লাহর হুকুমের বিরোধী হুকুম যেখান থেকেই আসুক তা অমান্য করে আল্লাহর দাস হিসেবেই জীবন যাপন করব, তাহলে ঈমান আনা সত্ত্বেও শাসনশক্তির যুলুমের ভয়ে আল্লাহর দাসত্ব বাদ দিয়ে শাসনশক্তির দাসত্বই করবে।

শাসনশক্তি মানে শুধু রাষ্ট্রক্ষমতাই নয়। মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্বকেই শাসনশক্তি মনে করতে হবে। স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্ব করার সুযোগ আছে। পিতা-মাতা সন্তানের শাসক। কর্মকর্তা কর্মচারীর উপর শাসক। শাসনক্ষমতা যেখানেই আছে তা আল্লাহর হুকুমের বিরোধী হুকুম চালাতে পারে। তাই ঈমান আনার আগেই সতর্ক হতে হবে যে, আল্লাহর হুকুমের বিরোধী হুকুম যেখান থেকেই আসুক তা কিছুতেই মানা যাবে না।

৪. রিযক বন্ধ করে দেওয়ার ভয় দেখানোর শক্তি :

এ তাগূতি শক্তিটিকে শাসনশক্তির মধ্যেও গণ্য করা যায়; কিন্তু এটাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ, শাসনশক্তির পক্ষ থেকে অন্য যত রকম শাস্তির ভয় দেখিয়ে অন্যায় হুকুমের গোলাম বানানো যাক না কেন, চাকরি থেকে বরখাস্ত করে রিয্‌ক বন্ধ করার ভয় দেখানোর শক্তি সর্বপেক্ষা বেশি মারাত্মক।

মসজিদের ইমাম, মাদরাসা-স্কুল-কলেজের শিক্ষক, কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী যে কর্তৃপক্ষের অধীনে চাকরি করে, ঐ কর্তৃপক্ষ ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় হওয়ার অপরাধে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার ভয় দেখিয়ে ইকামাতে দ্বীনের ফরয দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করতে পারে। রিয্‌কের আসল মালিক আল্লাহ, এ কথা জানা সত্ত্বেও চাকরি চলে যাওয়ার আশঙ্কায় সহজেই দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

তাই ঈমান আনার আগে এ কঠোর তাগূতি শক্তি সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে, যাতে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও মান দুর্বল না হয়। পূর্ব সাবধানতা ছাড়া এত বড় বিপদে স্থির থাকা সম্ভব নয়।

৫. অন্ধ আনুগত্যের দাবিদার শক্তি :

কত মহল এমন আছে, যেখানে কোনো ব্যক্তি অধীনদের কাছ থেকে অন্ধ আনুগত্য দাবি করে থাকে। যেহেতু তিনি বলেছেন, তাই তা মেনে চলতে হবে। যত অযৌক্তিক হোক, তার ইচ্ছা পূরণ করতেই হবে। তার সাথে বিতর্কের কোনো অধিকার কারো নেই। তার নির্দেশ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে হবে। এমন অন্ধ আনুগত্যের দাবিদার শক্তিও তাগূত।

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (স.) ছাড়া অন্য কেউ নির্ভুল নয়। তাই এ দু'জনের আনুগত্য অন্ধভাবেই করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কারোই অন্ধ আনুগত্য দাবি করার অধিকার নেই। কিন্তু এমন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা ধর্মীয় আধ্যাত্মিক নেতা থাকতে পারে, যাদেরকে তাদের ভক্তরা অন্ধভাবে আনুগত্য করে এবং তারাও এ জাতীয় আনুগত্য দাবি করে। সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

অর্থাৎ- তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ওলামা ও দরবেশদেরকে তাদের রব বানিয়ে নিয়েছে।

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর হুকুমের বিরোধী হলেও তাদের কতক আলেম ও পীরকে অন্ধভাবে মেনে চলে। তারা এমন অন্ধ আনুগত্য দাবি করে বলেই

এভাবে তারা তাদেরকে মানে। তাই ঈমান আনার আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আল্লাহ ও রাসূল (স.) ছাড়া অন্য কোনো সত্তাকে অন্ধভাবে মেনে চলবে না।

যত রকম শক্তি, ব্যক্তিত্ব ও সত্তা তাগূত হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য সেসবই উপরিউক্ত পাঁচটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাই পাঁচটি তাগূত নয়, পাঁচ প্রকার তাগূতি শক্তি রয়েছে, যেগুলোর কাফির হওয়ার পূর্বে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে কোনো না কোনো সময় কোনো না কোনো তাগূতের নিকট পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

'উরওয়াতুল উসকা' মানে কী?

প্রথমে উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে, তাগূতের কাফির হয়ে যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হয় তাহলে এমন মযবুত রজ্জু ধরা হয়, যা কখনো ছিঁড়বে না। আয়াতে عُرْوَةُ الْوُثْقٰى বলা হয়েছে, যার অর্থ মযবুত রশি বা হাতল। এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে, তা জানা অত্যন্ত জরুরী।

সকল তাগূতি শক্তিকে অস্বীকার ও অমান্য করার সিদ্ধান্ত নিয়ে যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক অত্যন্ত মযবুত হয়। ঐ সম্পর্কের কথা আল্লাহ তায়া'লা নিজেই কুরআনের সর্বশেষ সূরায় জানিয়ে দিয়েছেন। সূরা নাস-এ মানুষের সাথে আল্লাহর তিন রকম সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে ঈমান আনে আল্লাহর তার রব, বাদশাহ ও ইলাহ।

তাগূতের প্রতি কুফরী করার পর আল্লাহর প্রতি যে ঈমান আনে, তার সাথে আল্লাহর ঐ তিন রকম সম্পর্ক কায়েম হয়। এ সম্পর্ক এত মযবুত হয় যে, তা কখনো ছিন্ন হয় না। কিন্তু যদি ঈমান আনার পূর্বে তাগূতের কাফির না হয় তাহলে মানসিক দিক দিয়ে অপ্রস্তুত অবস্থায় তাগূতের চাপে পড়ে যখন আল্লাহর নাফরমানি করে তখন ঐ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহর সাথে ঐ তিনটি সম্পর্কের আলোচনা করা হলে বিষয়টা উপলব্ধি করা সহজ হতে পারে।

আল্লাহর সাথে মুমিনের সম্পর্কের ধরণ

১. রব হিসেবে সম্পর্ক :

রব মানে প্রতিপালক, লালন-পালনকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী। মায়ের পেটে আমি যখন ভ্রূণ অবস্থায় ছিলাম তখন থেকে এখন পর্যন্ত যিনি আমাকে গড়ে তুলে বাঁচিয়ে রেখেছেন তিনিই আমার রব। মায়ের পেটে আমার দেহ যিনি

গড়েছেন, জন্মের সাথে সাথে যিনি মায়ের বুকে আমার খাবার দিয়েছেন, আমার হৃৎপিণ্ডকে যিনি সচল রেখেছেন, প্রতি মুহূর্তে যিনি আমার নি:শ্বাস জারি রেখেছেন, তিনিই আমার রব। তাঁকে ভুলে যাওয়া কি সম্ভব? তিনি রাব্বুল আলামীন হওয়া সত্ত্বেও নামাযে তাঁকে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' ও 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' জপ করার মাধ্যমে 'আমার রব' হিসেবে আমার অতি আপন বলে অনুভব করতে শেখানো হয়েছে। আমার চেতনায় তাঁকে যেন স্থায়ীভাবে উপস্থিত মনে করি।

২. বাদশাহ হিসেবে সম্পর্ক :

আল্লাহ আমার বাদশাহ। আর আমি তাঁর প্রজা। তাঁরই রাজত্বে আমি বাস করি। এখান থেকে কোথাও যাওয়ার সাধ্যও আমার নেই। আমি চাই সুখ-শান্তি। আমার বাদশাহ যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তবেই আমি সুখে থাকতে পারব। তাই আমার এমন কিছুই করা উচিত নয়, যাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন।

৩. তিনি আমার ইলাহ :

'ইলাহ' শব্দের প্রতিশব্দ মা'বুদ। আবদ মানে দাস। আর মা'বুদ মানে যার দাসত্ব করা হয় বা যিনি মনিব। মনিব হুকুমকারী আর দাস হুকুম পালনকারী। সে হিসেবে ইলাহ মানে হুকুমকর্তা। এক শব্দে ইলাহ-এর অর্থ করা যায় না। তবে হুকুমকর্তা বললে ভাব প্রকাশ পায়।

শুধু হুকুমকর্তা বলা যথেষ্ট নয়। কারণ, মানুষের মধ্যেও অনেকে আমার-আপনার হুকুমকর্তা আছেন। পিতামাতা, সরকার, কর্মকর্তাও হুকুম করেন। তাই ইলাহ মানে 'হুকুমকর্তা প্রভু'। অন্য কোনো হুকুমকর্তা প্রভু নয়। এটুকুও যথেষ্ট নয়। ইলাহ শব্দের সঠিক অর্থ হয় 'একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু'। আমার ইলাহ-এর হুকুমের বিরোধী হুকুম করলে আমি পিতার হুকুমও মানি না। তিনি পিতার হুকুম মানতে বলেছেন; কিন্তু তাঁর হুকুমের খেলাফ হলে মানতে নিষেধও করেছেন। তাই আমি শুধু একজনের হুকুমই মানি। তাঁর হুকুমেই পিতার হুকুম মানি। তাই আল্লাহ আমার 'একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু'।

তাগূতের হুকুম মানলে এসব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়

আল্লাহর হুকুমের বিরোধী যেসব হুকুম তাগূতের পক্ষ থেকে আসে তা পালন করলে আল্লাহর সাথে ঐসব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কেউ যদি নাফসের দাস হয় তাহলে সে আল্লাহর দাস হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

ঈমান আনার সময়েই এ বিষয়ে সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আল্লাহর মর্জি, ইচ্ছা ও হুকুমের বিরোধী যত বড় শক্তিই হোক, এমন কোনো

তাগূতকে কোনো অবস্থায়ই মেনে নেব না। একমাত্র প্রভু হিসেবে যাঁর নিকট আশ্রয় নিয়েছি তিনিই আমার একমাত্র রব, বাদশাহ ও ইলাহ। তিনিই সর্বাবস্থায় আমার জন্য যথেষ্ট। হাসবুনাল্লাহ।

আল্লাহর সাথে এসব সম্পর্কের ব্যাপারে সচেতন থাকলে তিনি মুমিনের অন্তরে এমন দৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা, সাহস ও ধৈর্য দান করেন, যার ফলে কোনো তাগূতি শক্তিই তাঁকে দুর্বল করতে পারে না। এ মানের মুমিন বিপদাপদ, ভয়ভীতি এমনকি মৃত্যুরও পরওয়া করে না; বরং শাহাদাতের জযবায় হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।

কালেমায়ে তাইয়েবার বক্তব্য কী?

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কথাটির অর্থ হলো 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ বা মা'বুদ নেই'। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই একমাত্র মা'বুদ। 'আল্লাহ ইলাহুন ওয়াহিদ' বলেও এ বক্তব্য পেশ করা যায়; কিন্তু এ ভাষায় না বলে 'লা' শব্দ দিয়ে কেন শুরু করা হলো?

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এখানে 'লা' বা 'না' শব্দ দ্বারা সকল তাগূতি শক্তিকে অস্বীকার করা হয়েছে। প্রথমে তাগূতকে অস্বীকার না করলে আল্লাহকে সত্যিকারভাবে একমাত্র ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। প্রথমে কুরআনের যে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে এর দাবি তখনই পূরণ হয়, যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা হয়। অন্য কোনোভাবেই ঐ দাবি পূরণ হতে পারে না।

একটি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যাক। কেউ যদি ধানের ফসল বুনতে চায় তাহলে তাকে প্রথমে জমি থেকে সকল আগাছা দূর করতে হবে। আগাছা রেখেই যদি ধানের বীজ ফেলা হয়, তাহলে ফসল হওয়া দূরের কথা, বীজের ধানও নষ্ট করা হলো।

মানুষের মনের জমিও তাগূতের আগাছায় ছেয়ে আছে। নাফস, কুপ্রথা ইত্যাদি মনের জমি দখল করে আছে। এসবকে উৎখাত না করে ইলাহ হিসেবে আল্লাহকে স্থাপন করা সম্ভবই নয়। তাই আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে ঘোষণা করার আগেই 'লা' বলে তাগূতকে উৎখাত করতে হবে। তাগূতি শক্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে উৎখাত করা সম্ভব নয়।

কালেমা তাইয়েবা এমন কোনো মন্ত্র নয় যে, মুখে তা উচ্চারণ করলেই বেহেশতে যাওয়া যাবে। এ শব্দগুলো কালেমা নয়, এর অর্থ ও বক্তব্যই আসল কালেমা। কালেমায়ে তাইয়েবা উচ্চারণ করার সাথে সাথে এর মর্মকথা বুঝতে হবে। তা না হলে শুধু উচ্চারণ করলেই মুমিন হবে না। ময়না বা টিয়া

পাখিকে শেখালে কালেমা উচ্চারণ করতে পারবে; কিন্তু যেহেতু এর মর্মকথা বোঝার সাধ্য পাখির নেই; তাই পাখি মুমিন বলে গণ্য হবে না।

আসলে কালেমায়ে তাইয়েবা হলো জীবনের নীতি-নির্ধারণী ঘোষণা (Life Policy Declaration)। যে ব্যক্তি কালেমা উচ্চারণ করল সে এর দ্বারা ঘোষণা করল যে, সে তার জীবন কোন্ নীতি অনুযায়ী যাপন করবে। এর দুটো দফা রয়েছে-

১. লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এবং ২. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

প্রথম দফায় ঘোষণা করা হয় যে, আমি আমার গোটা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সব সময়ে একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলব। এর বিরোধী কোনো হুকুম মানব না।

দ্বিতীয় দফায় ঘোষণা করা হয় যে, আল্লাহর হুকুম যে রাসূল (স.) এর প্রতি নাযিল হয়েছে এবং তিনি যেভাবে যে তরীকায় যে হুকুম পালন করেছেন, আমি একমাত্র ঐ নিয়মেই সেগুলো পালন করব; অন্য কোনো তরীকা গ্রহণ করব না। এ দু'দফা পলিসি অনুযায়ী যে মুমিন জীবন যাপন করবে তার সকল কার্জ-কর্মই ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। এমন মুমিনের জীবনে দীনদারি ও দুনিয়াদারিতে কোনো পার্থক্য নেই। যেসব কাজকে দুনিয়াদারি মনে করা হয় তাও যদি আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (স.) এর তরীকা অনুযায়ী করা হয় তাহলে তা দীনদারী হিসেবেই গণ্য হবে।

কুরআন মাজীদের সূরা নাহ্লের ৩৬নং আয়াতে বলা হয়েছে-

أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থাৎ- আল্লাহ দাসত্ব কর এবং তাগূতের দাসত্ব থেকে দূরে থাক।

তাগূতকে না চেনার পরিণাম

হযরত ইব্রাহীম (আ) এর পিতা কাফির ছিলেন এবং নূহ (আ) এর এক ছেলে কাফির ছিল। মুসলমানের ঘরে পয়দা হলে আপনা-আপনিই মুসলিম হয়ে যায় না। পিতা-মাতা যদি সন্তানকে মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা না করেন তাহলে কি আশা করা যায়, সে ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে মুসলিমের গুণাবলি অর্জন করবে। ডাক্তারের সন্তান ডাক্তারি বিদ্যা না শিখলে যেমন ডাক্তার হিসেবে গণ্য হয় না, মুসলিমের সন্তানও মুসলিমের গুণাবলি অর্জন না করলে আল্লাহর নিকট মুসলিম হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

সত্যিকার মুমিন হতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাগূতকে চিনতে হবে, যাতে ঈমান আনার সময়ই তাগূতকে অস্বীকার করতে পারে এবং যখনই তাগূতের সম্মুখীন হয় তখনই দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়।

যারা দ্বীনকে শেখার চেষ্টা করে না, নামায-রোযার ধার ধারে না তাদের কথা বাদ দিলাম। যারা সমাজে দীনদার ও ধার্মিক হিসেবে পরিচিত, তাদের মাঝেও অনেককে ঈমানের দিক দিয়ে বাস্তব জীবনে যথেষ্ট দুর্বল দেখা যায়। তাগূতি শক্তির চাপে ঈমানের উপর দৃঢ় থাকতে তারা সক্ষম হয় না। এর কারণ তালাশ করলে এ কথাই প্রামাণিত হবে যে, তাগূত সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা নেই এবং তাগূতের কাফির না হলে যে ঈমান মযবুতই হতে পারে না সে বিষয়ে সঠিক জ্ঞান নেই।

রাসূল (স.) দ্বীনের ইলম তালাশ করা ফরয বলে ঘোষণা করেছেন। সহীহ ইলম না থাকায় দ্বীনদার লোকও তাগূতের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রথম সিপাহসালার বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক, সংগঠক, ডাকসুর সাবেক জিএস, কেয়ারটেকার সরকারের রূপকার, বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ ও রাজনীতি বিজ্ঞানী অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের লেখা ২০০০ সালে প্রকাশিত "খাঁটি মুমীন হতে হলে তাগূতের পাক্কা কাফির হতে হবে" শীর্ষক পুস্তিকাটি রাহবার পাঠকদের খেদমতে পেশ করলাম। এ মহামনিষীকে আল্লাহ তায়া'লা একটা বিশেষ যোগ্যতা দিয়েছিলেন- তাহলো অনেক জটিল ও কঠিন বিষয়কে সহজ করে উপস্থাপনের কৌশল। ঈমানের মত বিষয়, কালেমায়ে তাইয়্যেবার কোরআনিক ব্যাখ্যা তিনি অত্যন্ত সহজ ভাষায় উপস্থাপন করেছেন এ পুস্তিকায়। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। তাঁর লেখাগুলো কাল থেকে কালান্তরে দ্বীনের পথে কালেমার পথে মানুষকে ডেকে যাবে। আল্লাহ তায়া'লা নামের সাথে মিল রেখে তাঁকে বড় গোলাম হিসেবে কবুল করে জান্নাতে আ'লা দরজা দান করুন। আমীন।

মজলুম জননেতা মকবুল আহমাদ : একজন আদর্শ মানুষ ও আদর্শ সংগঠক

এ. এইচ. এম. হামিদুর রহমান আযাদ

> গণমানুষের নেতা মরহুম মকবুল আহমাদ ছিলেন একজন মুত্তাকী ও উন্নত মানের দ্বীনের দা'য়ী এবং সৎ, সাহসী ও প্রতিভাবান রাজনীতিবিদ। সেইসাথে একজন ধৈর্য্যশীল, শান্ত-শিষ্ট, বিনয়ী-ভদ্র, উদার, পরোপকারী, নিরহংকার ও নির্মোহ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন ধনী-গরিব, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও সংগঠনের ভিতরে বাহিরে জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রিয় ও একজন আদর্শ মানুষ।

১৩ এপ্রিল, ২০২১ সাল। দুপুর বেলা যোহরের নামাজের প্রস্তুতি নেয়ার সময় খবর এলো বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর ও কঠিন সময়ের কান্ডারী মজলুম জননেতা মকবুল আহমাদ মহান রবের ডাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যু সংবাদে মুহূর্তের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে দেশ-বিদেশে সর্বত্র। অনলাইন ও সোস্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন মহলের শোক বাণী ও অসংখ্য মানুষের আবেগ জড়িত বক্তব্য ও মন্তব্য সকলকে কান্নার সাগরে ভাসিয়ে দেয়। এ যেন স্বজন হারানোর প্রচন্ড বেদনা।

গণমানুষের নেতা মরহুম মকবুল আহমাদ ছিলেন একজন মুত্তাকী ও উন্নত মানের দ্বীনের দা'য়ী এবং সৎ, সাহসী ও প্রতিভাবান রাজনীতিবিদ। সেইসাথে একজন ধৈর্য্যশীল, শান্ত-শিষ্ট, বিনয়ী-ভদ্র, উদার, পরোপকারী, নিরহংকার ও নির্মোহ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন ধনী-গরিব, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-

স্বজন ও সংগঠনের ভিতরে বাহিরে জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রিয় ও একজন আদর্শ মানুষ। তাঁর আচার-আচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বর্ণীত মুমিন বান্দার গুণাবলী এবং সাহাবা চরিত্রের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও মায়াবী চেহারার তাকওয়ার উজ্জ্বল ছাপ মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর প্রিয় বান্দার সান্নিধ্যে আসার অনুভূতি জাগ্রত করত। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই এবং কোন দিন এ পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। তাঁর হুসনে খুলুকের (সৎ চরিত্র) সাক্ষী দিচ্ছে আজ অসংখ্য মানুষ ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ। তাঁর প্রশান্ত আত্মা কুরআনের ভাষায় ঘোষণা করা হচ্ছে-

> "হে প্রশান্ত আত্মা চলো তোমার রবের দিকে, এমন অবস্থায় যে, তুমি (নিজের ভালো পরিণামের জন্য) সন্তুষ্ট (আর তোমার রবের নিকট) পছন্দনীয়। তুমি আমার প্রিয় বান্দাহদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"
> (সুরা- আল ফাজর ২৭-৩০)।

সাবেক আমীরে জামায়াত মকবুল আহমাদের সাথে ছাত্রজীবন থেকেই আমার পরিচয়। দীর্ঘদিন তাঁকে জানার ও কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। তাঁর উপর আমীরে জামায়াতের দায়িত্বে আসার পর সরাসরি একসাথে কাজ করার সৌভাগ্যও হয়েছে। তাঁকে আমি কাছ থেকে যেভাবে দেখেছি এর প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, একজন তাকওয়াবান নিরব সংগঠক, আদর্শ নেতা, দ্বীনের দা'য়ী ও সমাজ সেবকের সকল মানদন্ডে তিনি উত্তীর্ণ। সর্বদা সংগঠনের সকল বিষয়ে এতবেশী চিন্তা-ভাবনা করতেন দায়িত্বের পেরেশানী যেন তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াত। জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে রাজনৈতিক কারণে দীর্ঘদিন নিজ বাসায় থাকতে পারেননি। ২০১৪ সালে চরম প্রশাসনিক হয়রানির কারণে তাঁকে একদিনে তিন বারও বাসা পরিবর্তন করতে হয়েছে। তখনকার সময়ে সাংগঠনিক কাজে আমি তাঁর সাথে মিরপুরের এক বাসায় সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর তিনি তাঁর স্বভাবসূলভ ভঙ্গিতে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ভাষায় কুশলাদি বিনিময় করেন। অত:পর বলেন, দীর্ঘদিনের ডায়বেটিক রোগী হওয়ায় প্রতিদিন হাঁটতে হয় বলে এখন ঘরের ভিতরে হাঁটার পর ফ্রেশ হয়ে আসলাম। তখন আমি জানতে চাইলাম কতদিন থেকে এ রোগে ভুগছেন? জবাবে তিনি হেসে বললেন বাংলাদেশের বয়স যতদিন আমার ডায়বেটিকের বয়সও ততদিন। এরপর দীর্ঘ এক ঘটনা বর্ণনা করেন। ১৯৭১ সাল পুরো বছরটি রাজনৈতিক হয়রানীর কারণে তিনি যুবক বয়সে একটি বাড়ীর রান্না ঘরে অন্তরীণ ছিলেন। সংগঠনের নির্দেশে দীর্ঘ প্রায় এক বছর এই ঘুটঘুটে অন্ধকার গৃহেই বন্দী জীবনের মত কাটিয়েছেন। এমনকি রাত্রি বেলাও ঘরের বাহিরে যাওয়ার পরিবেশ ছিলনা। সেই সময় তিনি ডায়বেটিক রোগে আক্রান্ত হন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরো একটি ঘটনা

তুলে ধরেন। ১৯৭২ সালে নবগঠিত বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার জামায়াতসহ ইসলামী দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে দিলে জামায়াতের প্রকাশ্য কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তখন কেন্দ্রীয় জামায়াত অভ্যন্তরীণভাবে দলীয় লোকদের সাথে যোগাযোগ ও খবরা-খবর নেয়ার জন্য বিভাগভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করে। জনাব মকবুল আহমাদকে তৎকালীন চট্টগ্রাম বিভাগের আমীরের দায়িত্ব দেয়া হয়। একদিন সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি সিলেটের উদ্দেশ্যে রওয়ান দেন। বাস স্টেশনে গিয়ে বাসে সিট না পেয়ে লোকাল বাসের ছাদে উঠে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সাংগঠনিক সফর করেন। এ পর্যায়ের একজন দায়িত্বশীল বাসের ছাদে উঠে যাতায়াত ও কঠিন প্রতিকূল পরিবেশে জেলায় জেলায় সফর করা ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের জন্য একটি বিরল দৃষ্টান্ত। সময়ের প্রেক্ষাপটে সংগঠনের প্রয়োজনে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য সদা প্রস্তুত থাকার শিক্ষা তাঁর জীবন ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। সেই সময়ের মত বর্তমান সরকারের জুলুম নির্যাতনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশেও তিনি একই উদাহরণ রেখে গেছেন।

জামায়াতে ইসলামীর এ রাহবার বর্তমান কর্তৃত্ববাদী সরকারের শাসন আমলে সংগঠন ও এদেশের জনগণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সংগঠনের কঠিন সময়েও অসুস্থ শরীরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বৈঠকাদিতে নিয়মিত উপস্থিত হয়ে সহকর্মীদেরকে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তাছাড়া এ সরকারের আমলে দীর্ঘ একযুগ ধরে সংগঠনের অনেক নেতা-কর্মী নিজ বাসায় ঘুমাতে পারছে না। অসংখ্য মিথ্যা মামলা কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গুম, খুন, নির্যাতনের বোবা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে অনেক পরিবার। তাদের আশ্রয়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন এ আপোসহীন নেতা। তাঁর নিজের উপরও মিথ্যা মামলার হুলিয়া ছিল। এ জন্য তিনি বৃদ্ধ বয়সে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অমানবিক জীবন-যাপন করেছেন, জেল খেটেছেন, পুলিশের রিমান্ডে গিয়েছেন। কিন্তু আপোস করেননি। এ যোগ্য সংগঠক এভাবেই সারাদেশের সংগঠনের অগ্রগতির জন্য দুরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার সাথে ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি সর্বাবস্থায় কর্মীদের সাথে সুন্দর ও কোমল ব্যবহার করতেন। কোন সময় কারো মনে কষ্ট দেয়া তাঁর স্বভাব বিরোধী ছিল। সদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, বাচন ভঙ্গি ও নম্র-ভদ্র, অকৃত্রিম আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। সাংগঠনিক নিয়ম-শৃংখলা অনুসরণে কঠোর হলেও রাগ, বিরাগ ও কর্তৃত্ববাদীতা তাকে কখনো স্পর্শ করতে দেখিনি। স্নেহ, ভালবাসা, অকৃত্রিম মমতা ও উদারতার তিনি অনন্য দৃষ্টান্ত।

তিনি জামায়াতের কঠিন সময়ে মুল কান্ডারীর দায়িত্ব পালনকালে তৎকালীন আমীরে জামায়াত ও সেক্রেটারী জেনারেলসহ ৫ জন শীর্ষ নেতার মিথ্যা মামলায় ফাঁসি হয়েছে। অনেক কেন্দ্রীয় নেতা কারাগারে বন্দী অবস্থায়

জীবন দিয়েছেন। এসব পরিবারের উপর চালানো হয়েছে সরকারের নির্যাতন। সেই কঠিন ও প্রতিকূল পরিবেশে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। অস্থিরতা ও বিষন্নতার উর্ধে থেকে ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি মোকাবিলা করতেন। সব সময় সহকর্মীদের সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে পরামর্শ করে কাজ করতেন। এ সকল গুণাবলী একজন সাধারণ শিক্ষককে অসাধারণ মানুষ বানিয়েছে এবং জামায়াতে ইসলামীর ন্যায় একটি সংগঠনের আমীরের মর্যাদায় উপনীত করেছে।

এ প্রিয় নেতা ঢাকা ও নিজ এলাকায় অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে জনগণের সেবা করেছেন। তাছাড়া তিনি সহকর্মীদের ব্যক্তিগত খোঁজ-খবর রাখতেন এবং কারো সমস্যা থাকলে তা বিভিন্ন উপায়ে সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। কেন্দ্র থেকে জেলা/উপজেলা এমনকি সাধারণ কর্মীদেরও খোঁজ-খবর নিতেন। কুতুবদিয়া উপজেলা নিবাসী একজন রেলওয়ে স্টাফ ও জামায়াতের রুকন মফিজুর রহমান ভাই দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হলে বহুবার তার শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং চিকিৎসার খরচ যোগাড় করে দিয়েছিলেন। যতবার মরহুম মকবুল আহমদের সাথে আমার দেখা হয়েছে ততবার মফিজ ভাইয়ের পরিবারের ব্যাপারে তাকিদ দিতেন। পরবর্তীতে মফিজ ভাই মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারকে কক্সবাজার শহরে বসবাসের ব্যবস্থা করা এবং সন্তানদের পড়া-লেখা ও সংসার খরচের জন্য নিয়মিত টাকা পাঠাতেন। দুনিয়ার দৃষ্টিতে নিজের আত্মীয় বা এলাকার লোক না হয়েও দ্বীনের কারণে তিনি যত পেরেশান ছিলেন আমি একই এলাকার অধিবাসী বা আত্মীয় হয়েও তা পারিনি বলে অত্যন্ত লজ্জিত হতাম।

২০১৭ সালের ০৯ অক্টোবর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক চলাকালে তিনি মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হন। ঐ সময় তাঁকে কাশিমপুর-২ নম্বর কারাগারে 'বকুল' এর একটি কক্ষে রাখা হয়। দীর্ঘ ২৭৩ দিন কারাভোগের পর ২০১৮ সালের জুলাই মাসে তিনি জামিনে মুক্তি লাভ করেন। ২০১৮ সালে আমিও মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হয়ে একই জেলখানার একই কক্ষে ১০ মাসের অধিক সময় বন্দী ছিলাম। কারাগারে থাকাকালে নামাজের ইমাম, বাবুর্চি, সেবক ও বিভিন্ন শ্রেণীর বন্দীদের কাছে মকবুল সাহেবের কারাজীবনের আচরণ ও মানুষের সেবা সম্পর্কে যা শুনেছি তা সত্যিই আমাদেরকে অবিভূত করেছে। তিনি এসব কারাবন্দীদের ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন এবং দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। তাঁর চেষ্টায় অনেকে কুরআন পড়া শিখেছেন, নামাজ পড়া শিখেছেন। একজন বন্দী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও অপর বন্দীদের মানবিক স্বার্থে পাশে দাঁড়াতেন। শুধু তাই নয়, কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পরও তিনি তাদের খোঁজ-খবর রাখতেন। তাদেরকে মুক্ত করার জন্য আইনী সহযোগিতা এবং তাদের সন্তানদের বিয়ে-শাদীর জন্য

তিনি সাহায্য করেছেন। মরহুম মকবুল সাহেবের এসব উপকারের কথা বর্ণনা দিয়ে অনেক বন্দী আমার সামনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। সম্পূর্ণ অচেনা একজন মানুষ এত দরদি হতে পারে তা তাদের নিকট অবিশ্বাস্য। আসলে জামায়াতে ইসলামী এ ধরণের চরিত্রের মানুষই তৈরী করে।

এরূপ আরো অনেক পরিবার ও ব্যক্তির বিপদের সময় পাশে দাঁড়িয়েছেন যার বর্ণনা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে দেয়া সম্ভব নয়। তিনি এত মানুষের সেবা করেছেন যে, পরোপকারী ও সমাজসেবক হিসাবে মকবুল সাহেব সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হলে পৃথক একটি পুস্তক রচনা হয়ে যাবে।

মরহুম মকবুল আহমাদ ছিলেন দ্বীনের একনিষ্ট একজন দা'য়ী। যেখানে যেতেন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হলে কুশলাদি বিনিময়ের পর তাদেরকে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত দিতেন। কারো সাথে পরিচয় হলে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু মহলের নাম ঠিকানা ফোন নম্বর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। সরাসরি সাক্ষাত ও ফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্য বিতরণ করা তার নিয়মিত কাজের অংশ ছিল। দাওয়াতী কাজে এতো বেশী সচেতন ছিলেন জেলাখানা ও পুলিশ রিমান্ডেও তিনি তা ভুলেননি। রিমান্ড শেষে যখন তাকে আদালতে আনা হলো তার আইনজীবি প্রাইভেট আলাপে তার কাছে জানতে চেয়েছিলেন রিমান্ডে আপনাকে কি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল? জবাবে তিনি হেসে বললেন, তারাতো আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, আমিও তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। আমি এসব পুলিশ কর্মকর্তাদের বলেছি আপনারাও তো এদেশের সন্তান এবং মুসলমান। আপনারা কি কুরআন পড়েন? নিয়মিত নামাজ পড়েন? আপনাদের পরিবারে স্ত্রী-কন্যা পর্দা করে? সন্তানরা কি কুরআন পড়তে জানে? তার কথা শুনে পুলিশ কর্মকর্তারা অবাক হয়ে বলেছে স্যার আমাদেরকে তো আর কোন দিন কেউ এভাবে বলেনি। নামাজ, রোজা আদায়ের চেষ্টা করব। রিমান্ডে যেখানে মানুষ ভয়ে আতংকে থাকে সেখানে তিনি ধৈর্য্য ও সাহসীকতার সাথে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে গেছেন যা একটি বিস্ময়কর বিষয়।

২০১২ সালে আমি সংসদ সদস্য হিসাবে সরকারী সফরে চীনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। এ সময় আমীরে জামায়াতের অনুমতি ও দোয়া নেয়ার জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে দোয়া করে দিয়ে এক বান্ডিল ইসলামী সাহিত্য হাতে তুলে দিয়ে বললেন, চীনে অনেক বাংলাদেশী নাগরিক আছে এই বইগুলো তাদের মাঝে বিতরণ করবে। সময় হাতে থ াকলে প্রবাসীদের একটি দাওয়াতী সভা করে সংগঠন কায়েম করে আসবে। তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক চীন সফরে বিশ্রাম ও অবকাশের সময়গুলো দাওয়াতী কাজে ব্যবহার করি। তাতে এতবেশী বরকত হয়েছে যে ঐ সময়ে যারা দাওয়াত কবুল করেছিলেন তারা আজ চীনে কর্মরত বিভিন্ন অঞ্চলে

বাংলাদেশী প্রবাসীদের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত ছড়িয়ে দিচ্ছেন। দাওয়াতী কাজে তিনি কুরআন, হাদিস ও বিভিন্ন লেখকের লিখিত ইসলামী সাহিত্য মানুষের মাঝে বিতরণ করতেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি নিজেও কয়েকটি বই লিখেছেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থ হলো "জাপান সফর- দেখার অনেক, শিখার অনেক" এবং "ইসলামী আন্দোলনের পথে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত হওয়াই আমাদের কাজ"।

মরহুম মকবুল আহমদ জামায়াতে ইসলামীর ন্যায় একটি বড় রাজনৈতিক দলের প্রধান। একটি বড় রাজনৈতিক জোটের শীর্ষ নেতা ছিলেন। তিনি সাংগঠনিক কাজে যেমন দেশে-বিদেশে চষে বেড়িয়েছেন, তেমনি ২০ দলীয় জোটের স্বৈরাচার বিরোধী ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের সভা-সমাবেশ বাস্তবায়নে অগ্রবর্তী সৈনিকের ভূমিকা পালন করেছেন। বয়সে ভারাক্রান্ত এ বর্ষীয়ান নেতা মিথ্যা মামলার হুলিয়া ও শারীরিক অসুস্থতা উপেক্ষা করে সারাদেশে ২০ দলীয় জোটের বিভিন্ন সভা-সমাবেশে অংশগ্রহণ করে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি রাজনীতিতে ব্যাপক আলোচিত ছিলেন না। কারণ তিনি প্রচার বিমুখ ছিলেন। প্রচারণার কাজে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হয়ে নিজেকে সব সময় লুকিয়ে রাখতেন। একজন নির্মোহ, নিরহংকার ও সজ্জন মানুষ হিসাবে সর্বমহলে সমাদৃত ছিলেন। সংগঠনের বাহিরেও তার ছিল সুবিশাল গ্রহণযোগ্যতা।

বিএনপি, আওয়ামীলীগসহ সকল দলের নেতা, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের কাছে একজন সৎ, পরহেজগার, নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তার ইন্তেকালের খবর শুনে লকডাউনের মাঝে মধ্যরাতে জানাযায় অসংখ্য মানুষের উপস্থিতি মরহুমের জনপ্রিয়তা প্রমাণ হয়েছে।

তার সম্পর্কে আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় নেতা ও তাঁর নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বি জয়নাল হাজারী সোস্যাল মিডিয়ায় বলেন, "মরহুম মকবুল আহমদ সাহেব একজন ভদ্রলোক ছিলেন। মনে হয় জীবনে কারো সাথে কোন দুর্ব্যবহার করেননি। পরহেজগার মানুষ ছিলেন, সৎ মানুষ ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি আরো বলেন, যারা যে ভাবে নেন না কেন, আমি এই মানুষটাকে সৎ হিসাবেই বিবেচনা করি। এমনকি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি কোন ক্ষতিকর ভূমিকায় ছিলেন না। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না।"

জয়নাল হাজারির কথার সত্যতা মিলিয়ে দিবেন ২০১৫ সালে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ও মরহুম মকবুল আহমাদ সাহেবের একই ইউনিয়নের বাসিন্দা জনাব আব্দুল আউয়াল মিন্টুর প্রদত্ত বক্তব্যে। ঐ বছর মরহুম মকবুল আহমাদ সাহেবের বিরুদ্ধে দাগনভূঞা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার 'জনৈক বাঙ্গালী' ৭১ সালের তথাকথিত মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগ

উত্থাপন করে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করার জন্য ঢাকায় আসেন। মরহুম মকবুল সাহেব এই সংবাদ পেয়ে বিষয়টি নিয়ে আব্দুল আউয়াল মিন্টু সাহেবের সাথে আলাপ করার জন্য আমাকে বলেন। আমি মিন্টু সাহেবের কাছে এ প্রসঙ্গ তুললে তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেন। বাঙ্গালী সম্পর্কে অনেক কটু মন্তব্য করে বলেন, আমার স্যার মকবুল আহমাদের গায়ে ১৯৭১ সালের কোনো কালিমা নেই। তিনি একজন আল্লাহ ওয়ালা ও সৎ, শান্তশিষ্ট, পরোপকারী, কোমল হৃদয়ের মানুষ। আমাদের এলাকায় তার বিরুদ্ধে কোন অমুসলিমেরও অভিযোগ নেই। তার বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ আনলে তা মোকাবিলার জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করলাম। স্যারের কাছে আমার সালাম ও এ কথা পৌঁছে দিবেন। এক আল্লাহ ছাড়া কেউ স্যারের ক্ষতি করতে পারবে না। ট্রাইব্যুনাল প্রসিকিউটরের পক্ষ থেকে মরহুম মকবুল আহমাদ সাহেবের বিরুদ্ধে উত্থাপিত কথিত অভিযোগ তদন্তের জন্য একাধিকবার টীম পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কাউকে বাদী হওয়ার জন্য রাজি করাতে পারে নাই। যে সকল হিন্দুদের বাদী হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিল তারা মকবুল সাহেবের মতো নিষ্কলুষ মানুষের বিরুদ্ধে বাদী হওয়া থেকে বিরত থাকে। এরপর ট্রাইব্যুনাল এ ব্যাপারে আর কোন উদ্যোগ নিতে সাহস করেনি।

দ্বীনের এ মর্দে মুজাহিদ ইন্তেকালের কিছু সময় আগেও মানবতার কল্যাণে কতো পেরেশান ছিলেন কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন, এখানে জীবন মৃত্যর মাঝে বসেও তিনি অন্যদের খোঁজ-খবর নিয়েছেন। কিভাবে তার পরিচিত কিছু লোকের আয়ের ব্যবস্থা করে তাদের পরিবারের দুর্দশা দুর করা যায় সেই আকাংখা। নিজের জন্য বা পরিবারের জন্য কোন আক্ষেপ নাই। দিনে বেশ কয়েকবার তাকে ডাক্তার হিসেবে খুব কাছ থেকে দেখেছি প্রতিবারেই মাথা নাড়িয়ে বলেছেন কোন কষ্ট নেই। যেন প্রিয় রবের সাক্ষাতের ঘ্রাণ তার সব কষ্ট দূর করে দিয়েছে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছেন জীবনের সেই কাংখিত মুহূর্তের জন্য।

দুপুর ১১টায় দেখেছি তখন তাঁর জাগতিক অবস্থা ভয়াবহ খারাপ সবাই বুঝতে পারছিলাম। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি, বাকীটা মহান আল্লাহর বিশেষ রহমতের অপেক্ষা। তখনও তিনি মাথা নাড়িয়ে বলেছিলেন তাঁর কোন কষ্ট নাই। এর কিছুক্ষণ পরেই আল্লাহ তাঁকে কবুল করলেন।

মরহুম মকবুল আহমদ এ পৃথিবী ছেড়ে চিরদিনের মতো আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন আর কখনো ফিরে আসবেন না। কিন্তু আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন অনেক শিক্ষা ও উপদেশ। যা জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। দেশের মানুষ ও দেশ-বিদেশের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ তাকে আজীবন স্মরণে রাখবে। দেশ, জাতি

ও ইসলামী আন্দোলনের জন্য তিনি যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন তার জন্য যুগ যুগ ধরে তিনি অমর হয়ে থাকবেন। তিনি সারাজীবন আল্লাহর দ্বীনের পথে নিবেদিত ছিলেন এবং এজন্য জীবন উৎসর্গ করার শপথ করেছিলেন। সবসময় শহীদি মৃত্যু কামনা করেছেন। সেই মৃত্যু আল্লাহ তায়া'লা মহামারীর আক্রমণে হাসপাতালের বিছানায় কবুল করেছেন। আমরা রাব্বুল আ'লামীনের কাছে এই মুনাজাত করি যে তিনি যেন তার জীবনের সমস্ত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে নেকিতে ভরপুর করে দেন। তার নেক আমল কবুল করে শহীদের মর্যাদা দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করুন। তার রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ যেন লক্ষ লক্ষ ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেই তৌফিক দান করুন, আমীন॥

লেখক- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক এমপি।

ইসলামী সমাজ বিপ্লব

মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী

বিশ্বের কোথাও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে মুসলিম জাহান থেকে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীকে পাততাড়ি গুটাতে হবে এই আশংকায় তারা ইসলামী আন্দোলনের প্রতি খড়গহস্ত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো মুসলিম জাহানে অত্যধিক তৎপর হওয়ার কারণে ইসলামী আন্দোলনের মোকাবেলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিজয়ী শক্তি হিসাবে দাঁড়ানোর প্রয়াস পাচ্ছে। ফলে উক্ত আন্দোলন দু'টির পদ্ধতিগত দিক কোন না কোন পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মনে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়- যা অনেকাংশে হতাশার কারণ হিসাবেও দেখা দিতে পারে।

বিশ্বের প্রায় সবকটি মুসিলম রাষ্ট্রেই কোন না কোনো পর্যায়ে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোথায় একটা ইসলামী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। অন্য কথায় ইসলামী আন্দোলন পূর্ণভাবে জাগতিক সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়নি। প্রায় সবগুলো রাষ্ট্রেই ইসলামের প্রতিপক্ষ (আভ্যন্তরীন শত্রু ও বহি:শত্রু) শক্তি প্রয়োগ করে এ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। মূলকথা যেসব রাষ্ট্রে ইসলামী আন্দোলন চলছে সেখানে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তৎপরতায় ইসলামী আন্দোলনকে বহুমুখী আক্রমনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

আভ্যন্তরীন শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রধানত: দুই ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের আক্রমণ হলো তত্ত্বগত। যথা: তথাকথিত আলেম সমাজের পক্ষ থেকে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইসলামী জনতাকে বিক্ষুব্ধ করার অপচেষ্টা, তথাকথিত ওরিয়েন্টালিস্টদের পক্ষ থেকে ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা (আধুনিকীকরণের নামে) যা যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করে, সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তথাকথিত প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের ক্ষুরধার লিখনী-যা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে যুব মানসে আবেগ ও উন্মাদনা সৃষ্টি করে। আর এক ধরনের আক্রমণ হয়ে থাকে ধর্মহীন রাষ্ট্রদর্শনে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শাসক গোষ্ঠী, উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা ও বড় বড় পুঁজিপতিদের পক্ষ থেকে। যাকে আমরা বাস্তব প্রতিবন্ধকতা বলে অভিহিত করতে পারি। এই সব শক্তির প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সহযোগিতা রয়েছে জাতীয়তাবাদী অথবা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পেছনে।

ইসলামী আন্দোলনকে আভ্যন্তরীণ প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করার সাথে সাথে বিশ্বের সব কয়টি বৃহৎ শক্তির আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। ইংগ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী হোক অথবা রুশ-চীন নয়া সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী হোক ইসলামী আন্দোলনের প্রতি সবাই একই ভাবে হিংস্র আক্রোশের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কারণ ইসলামী আন্দোলনের বিজয়কে তারা তাদের বিশ্ব নেতৃত্বের প্রতি একটা প্রকাশ্য হুমকি স্বরূপ মনে করে। মুসলিম জাহানের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ভৌগলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের প্রভাব এখানে অক্ষুন্ন রাখতে বদ্ধপরিকর। বিশ্বের কোথাও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে মুসলিম জাহান থেকে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীকে পাততাড়ি গুটাতে হবে এই আশংকায় তারা ইসলামী আন্দোলনের প্রতি খড়্গহস্ত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো মুসলিম জাহানে অত্যধিক তৎপর হওয়ার কারণে ইসলামী আন্দোলনের মোকাবেলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিজয়ী শক্তি হিসাবে দাঁড়ানোর প্রয়াস পাচ্ছে। ফলে উক্ত আন্দোলন দু'টির পদ্ধতিগত দিক কোন না কোন পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মনে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়- যা অনেকাংশে হতাশার কারণ হিসাবেও দেখা দিতে পারে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যেখানে অধিকতর বিজয়ী সেখানে ইসলামী আন্দোলনের আদর্শিক গুরুত্বকে অনেকাংশে খাটো করে দেখার প্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং আন্দোলনকে রাতারাতি গণমুখী করার অস্থিরতা কর্মীদের মনে হীনমন্যতাবোধ সৃষ্টি করে দেয়। সেই সাথে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পদ্ধতির প্রতিও কিছুটা ঝোঁক প্রবণতা দেখা দেয়। ফলে ইসলামী আন্দোলনের কর্মপদ্ধতির প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি হওয়ায় কর্মীরা কাজে উৎসাহ হারাতে বাধ্য হয়।

পদ্ধতিগত সমস্যা

ইসলামী আন্দোলনের স্বতন্ত্র কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির উৎস রাসূল (স.) এর অনুসৃত কর্মনীতি। কিন্তু তার যথার্থ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন স্থান, কাল ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন পরিচালকদের প্রজ্ঞা ও যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলনের মধ্যেও আমরা চরিত্রগত পার্থক্য দেখতে পাই। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য জাতীয় শত্রু খতম করতে চায়। আর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন চায় শ্রেণী শত্রু খতম করতে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গণতান্ত্রিক ও অহিংস পথে পরিচালিত না হয়ে হিংসাত্মক পথে পরিচালিত হলে শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে যেতে বাধ্য। এজন্যেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। জাতীয়তাবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মপদ্ধতির সাথে ইসলামী আন্দোলনের কর্মপদ্ধতির পার্থক্য তাই তত্ত্বগত ও বাস্তব ভিত্তিক।

ইসলামী আন্দোলনের মূল কথা মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম করে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করা, যার অন্তর্নিহিত দাবীই হলো সমাজে যাবতীয় জুলুম শোষণ ও অশান্তির মূলোৎপাটন করে সামগ্রিক কল্যাণ ও সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা। মানুষের সমাজের সব অশান্তির মূল কারণ মানুষের উপর মানুষের প্রভূত্ব। এই প্রভুত্ব কিভাবে কাদের মাধ্যমে কায়েম হয়ে আছে তা জানা এবং তাদের প্রভুত্ব খতম করার উপায় বের করা এ আন্দোলনের অনিবার্য দাবী। আধুনিক বিশ্বে এই প্রভুত্ব তিন শ্রেণির মানুষের কুক্ষিগত। এক: ধর্মহীন শাসকগোষ্ঠী। দুই: বড় বড় সরকারী আমলা। তিন: বড় বড় পুঁজিপতি গোষ্ঠী। অতীতের ফেরাউন, হামান এবং কারুন গোষ্ঠীরাই এই প্রভুত্বের অধিকারী ছিল। সমাজে এদের কর্তৃত্ব খতম না হলে ইসলাম কায়েম হতে পারে না। এর জন্যে প্রয়োজন একটা সামগ্রিক সর্বাত্মক বিপ্লবের। জনগণের আবেগ অনুভূতিকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলকেও বিপ্লব বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তাতে ক্ষমতার বদল হয় মাত্র, জনজীবনে তেমন কোন পরিবর্তন আসে না। সন্ত্রাসবাদী কায়দায় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করাকেও বিপ্লব বলে অভিহিত করা হয়। এতে প্রভূত্ব তিন শ্রেণির হাত থেকে এক শ্রেণির নামে কোন এক ব্যক্তি বা দলের হাতে আসে। জনগণের কোন কল্যাণ এতে হয় না। তাই ইসলামী সমাজ বিপ্লবের জন্যে তথাকথিত গণ-বিপ্লবের চরিত্র আমরা হুবহু অনুসরণ করতে পারি না। আধুনিক বিশ্বে ইসলামী সমাজ বিপ্লবের জন্য আধুনিক উপায় অবলম্বন অপরিহার্য। কিন্তু এই আধুনিক উপায় অবলম্বন করতে গিয়ে ইসলামী আন্দোলনের মূল চরিত্র বিসর্জন দেয়া চরম বিপদজনক। প্রগতিশীল বিশ্বের গতিধারা সম্পর্কে জ্ঞানের মৌলিকত্ব একান্তই অপরিহার্য। শুধু ইসলাম অথবা শুধু আধুনিক বিশ্ব সম্পর্কে চিন্তার অধিকারী লোকই যেখানে বিরল সেখানে একই সাথে ইসলাম

ও আধুনিক জ্ঞানের মৌলিকত্বের অধিকারী লোক খুঁজে বের করা যে কত মুশকিল তা বলাই বাহুল্য। এই ক্ষেত্রে উভয় দিকেই ভাসাভাসা জ্ঞান সম্বল করে আন্দোলনের গতিধারা সম্পর্কে যে প্রস্তাব ও পরিকল্পনা পেশ করা হয় তা অনেকাংশেই একদেশদর্শী হতে বাধ্য। কিছু সংখ্যক উভয় দিকের মৌলিক জ্ঞানের অধিকারী লোক অথবা কিছু ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও আধুনিক বিশ্বের গতিধারা সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এদিকে নিয়োজিত থাকা উচিত।

কর্মসূচীর ব্যাপকতা :

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করলেই যারা একে প্রতিহত করতে চায় তাদের কলা-কৌশলের দিকে তাকালেও আমরা ইসলামী বিপ্লবের ব্যাপক কর্মসূচীর স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে- অতীতের ফেরাউন, নমরূদ, হামান আর কারুনের ন্যায় বর্তমানে শাসক গোষ্ঠী, আমলা গোষ্ঠী ও পুঁজিপতিরাই ইসলামের পথে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। মূলতঃ সমাজে এরা সংখ্যালঘু গোষ্ঠী। কিন্তু সমাজের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক চাবিকাঠি এদের হাতে।

একদিকে আমলা গোষ্ঠী ও পুঁজিপতিদের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে একে প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠী ও ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষ থেকে জনমনকে বিক্ষুব্ধ করে দৈহিক নির্যাতনের পথও বেছে নেয়া হয়। দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে এ আন্দোলনকে নির্মূল করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে অপপ্রচার ও মিথ্যা প্রচারের উপর এরা অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। তদুপরি সকল প্রকারের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই তিন গোষ্ঠীর সহায়তায় প্রায় সর্বত্রই ইসলামী আন্দোলনকে খতম করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে এরা সবাই জনগণের শত্রু। জনগণের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও এরা জনগণের সহায়তায় ইসলামী আন্দোলনকে ব্যর্থ করতে প্রয়াস পেয়ে থাকে। শত্রুপক্ষের এসব কার্যক্রমের দিকে লক্ষ্য রেখে একদিকে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আদর্শিক চেতনাবোধ জাগিয়ে তোলা ও সর্ব প্রকার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, নিজস্ব প্রকৃতির আলোকে ইসলামী আন্দোলন একই সাথে আদর্শবাদী, গণমুখী ও বিপ্লবী চরিত্র সম্পন্ন হতে হবে। সত্যিকারের ইসলামী বিপ্লবের জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশই অনুকুল পরিবেশ এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই সার্থক পদ্ধতি। এ জন্যেই বিশ্বের বৃহৎ শক্তিসমূহের ষড়যন্ত্রে মুসলিম জাহানের কোথাও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারছে না। সামরিক একনায়কতন্ত্রের কবলে একদিকে ইসলামী আদর্শের প্রচার ও প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে জনমন থেকে ইসলামী আদর্শের ছাপ ও গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ মুছে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। অন্যদিকে বল প্রয়োগ করে তৌহিদী জনতাকে

ভীত সন্ত্রস্ত করা হচ্ছে। দেশের পরিস্থিতি যাই হোক না কোন, একদিকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনমনে আদর্শিক চেতনাবোধ তীব্র থেকে তীব্রতর করতে হবে অন্যদিকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জনমনে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টির প্রয়াস পেতে হবে। কোন কাল্পনিক ব্যবস্থা নয় বরং প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টির মাধ্যমে গণ অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টাই হবে সত্যিকারের গণমুখী প্রচেষ্টা। আর এর সহায়ক হিসাবে পাশাপাশি একদিকে থাকবে সাংস্কৃতিক কর্মসূচী এবং অন্যদিকে থাকবে যথার্থ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। নতুবা গণ-অভ্যুত্থান অংকুরেই বিনষ্ট হবে অথবা সাফল্যের পথে এসে ব্যাহত হবে। মনে রাখা উচিত, ইসলাম বিরোধী শক্তির বিপক্ষে ও ইসলামের স্বপক্ষে গণজাগরণ সৃষ্টির চেয়ে উত্তম প্রতিরোধ ব্যবস্থা আর দ্বিতীয়টি নেই।

পরিচালকদের দায়িত্ব :

ইসলামী সমাজ বিপ্লবের এই মহান কাজে যারা আত্মনিয়োগ করেছে তাদেরকে প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে তিনটি বিষয়ের খতিয়ান অবশ্যই নিতে হবে।

নিজের শক্তির সঠিক মূল্যায়ন: নিজের শক্তি ও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা সম্পর্কে ধারণা না থাকলে কোন পদক্ষেপকে সাফল্য মন্ডিত করা যায় না। তাই সব সময় নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধির ও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। যে আন্দোলনে এই রূপ আত্মসমালোচনা ও আত্মবিশ্লেষণ নেই সে আন্দোলন কোন বাস্তবমুখী ভূমিকা নিতে পারে না। কিন্তু আত্মসমালোচনা আত্মবিস্মৃতিতে পরিণত হলে অসুবিধা আছে। আত্মশক্তিকে স্বীকার করেই তা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আত্মসমালোচনা আত্মশক্তি বৃদ্ধি ও তার সঠিক প্রয়োগের জন্য, হীনমন্যতাবোধের শিকারে পরিণত হবার জন্য নয়। নিজস্ব শক্তির সঠিক মূল্যায়ন বলতে আন্দোলনের সামগ্রিক অবস্থা ও কর্মীদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জনকে বুঝায়।

পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ: যে দেশে ও যে সমাজে আন্দোলন চলছে সে দেশ, সে সমাজের পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মন মানসিকতার সাথে অবশ্যই পরিচিত হতে হবে। আদর্শবাদী আন্দোলন অবশ্য গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাওয়া সমাজের তালে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না সত্য, কিন্তু নিজস্ব খাতে মানুষের চিন্তাকে প্রবাহিত করতে হলে মানুষের মানসিকতা কোন্ খাতে প্রবাহিত হচ্ছে তা জানা একান্তই অপরিহার্য। মানুষের জন্যে কখন কোন্ কথা বলা প্রয়োজন, মানুষের মন কখন কোন্ কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত কি তাদের চাহিদা বা আন্দোলন পরিচালকদের নখদর্পণে থাকতে হবে।

বিরোধী শক্তির পরিচয়ঃ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিরোধী শক্তির সঠিক মূল্যায়ন অপরিহার্য। সমাজকে কারা কিভাবে ভুল পথে পরিচালিত করে ইসলামী আদর্শের প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে, সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল না হলে তাদের খপ্পর থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করা আদৌ সম্ভব নয়। খোদাদ্রোহী শক্তি দেশের ও বাহির থেকে মানুষের নৈতিক অধ:পতন ঘটিয়ে তাকে মানসিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক গোলামে পরিণত করে কুটনৈতিক চাল চেলে অথবা শক্তি প্রয়োগ করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সদা তৎপর। এদের মোকাবিলায় ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকেও যথার্থ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এ পর্যায়ে আল কোরআনের নির্দেশ হলো- "খোদাদ্রোহী শক্তির মোকাবিলায় তোমরাও যথে াপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ কর।"

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী :

যে কোন আদর্শের সার্থক বিজয়ের জন্য অন্য কথায় পরিপূর্ণ বিপ্লবের জন্য তিনটি বিষয় অত্যাবশ্যক।

(এক) সৎ, যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।

(দুই) বিস্তৃত মজবুত ও সক্রিয় সংগঠন।

(তিন) ব্যাপক সমর্থন ও বলিষ্ঠ জনমত।

সৎ, যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব :

যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন সমাজের সর্বস্তরে। চিন্তার ক্ষেত্রে, মাঠে-ময়দানে এবং অফিস-আদালতের সর্বত্রই ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনার উপযোগী পর্যাপ্ত পরিমাণ লোক অপরিহার্য। ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের মধ্যে তিনটি গুণের সমাবেশ অবশ্যই থাকতে হবে।

এক: সততা ও খোদভীতি, দুই: যোগ্যতা ও পারদর্শিতা, তিন: সাহসিকতা ও বলিষ্ঠতা। যোগ্যতা ও সাহসিকতা ছাড়া যাদের মধ্যে কেবল সততা ও খোদাভীতি আছে তাদের দ্বারা কোন বিপ্লব সাধিত হতে পারে না। যাদের মধ্যে জ্ঞান ও বিচক্ষণতা আছে কিন্তু সততা ও সাহসিকতা নেই তাদের জ্ঞান মাঠে-ময়দানে তেমন একটা কাজে আসে না। যাদের সাহসিকতা আছে কিন্তু সততা, জ্ঞান ও বিচক্ষণতা নেই তাদের সাহস ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, সৃষ্টির কাজে নয়। সাহসী ব্যক্তির মধ্যে যদি বিচক্ষণতা থাকে আর সততা না থাকে তাহলে সে বিচক্ষণতার সাথে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করেও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে। খোদাভীতি ও সততার অভাবে দুনিয়ার ইতিহাসে যোগ্যতা ও সাহসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই নমরূদ, ফেরাউন, হিটলার

আর মুসোলিনী নামে পরিচিত হয়েছে। তাদের যোগ্যতা এবং সাহসিকতা সৃষ্টি জগতের আতংকের কারণ হয়েছে সত্য কিন্তু মানুষের কল্যাণে আসেনি মোটেই। পক্ষান্তরে সততা, যোগ্যতা ও সাহসিকতা এই গুণাবলীর অপূর্ব সমাবেশ যাদের মধ্যে ঘটেছিল তারা দুনিয়ার ইতিহাসে সিদ্দিকে আকবর এবং ফারুকে আযম নামে পরিচিত। নেতৃত্বের জন্য উল্লেখিত তিনটি গুণাবলীর সাথে সামাজিক বা গণমুখী চরিত্র অত্যাবশ্যক। গণমুখী চরিত্র না থাকায় অনেকের যোগ্যতাই স্বীকৃতি পায়না। অন্য কথায় জনগণ তাঁর থেকে যথার্থ উপকৃত হতে পারে না।

ইসলামী আন্দোলনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন আছে। কিন্তু ব্যক্তি পূজা ইসলামে নিষিদ্ধ। তাই জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ন্যায় কোন এক ব্যক্তির ইমেজ গড়ে তোলা ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাস্তব অসুবিধা। ব্যক্তির ইমেজের নামে যে দেবমূর্তি গড়ে উঠে ইসলামী আন্দোলনে যৌথ নেতৃত্বের প্রভাবে তাকে চুরমার করতে হবে। উল্লেখিত তিনটি গুণের সমাবেশ একই ব্যক্তির মধ্যে প্রায়ই সম্ভব হয়ে উঠে না। যৌথ নেতৃত্ব এই অভাবও পূরণ করতে সক্ষম হয়। নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলী কোন গবেষণাগারে সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি হয় মাঠে-ময়দানে কাজের মধ্য দিয়ে।

বিস্তৃত, মজবুত ও সক্রিয় সংগঠন :

সংগঠনের মূল উপাদান হচ্ছে নেতৃত্ব, সুশৃংখল কর্মীবাহিনী এবং উৎসাহী সমর্থক ও শুভাকাংখী।

সংগঠনের মূল কাজ হলো নেতা ও কর্মীবাহিনীর সক্রিয় ও শক্তিশালী যোগাযোগের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের কাছে আন্দোলনের মূল বক্তব্য পৌছে দেয়া। উর্ধ্বতন সংগঠনের পক্ষ থেকে দু-ধরনের বক্তব্য অধস্তন সংগঠনের কাছে পৌছান হয়ে থাকে। এক ধরনের বক্তব্য কেবল কর্মীদের উদ্দেশ্যে। উক্ত বক্তব্য ভালভাবে অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা কর্মীদের নৈতিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব। দ্বিতীয় ধরনের বক্তব্য সাধারণ মানুষের জন্য, যা সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌছে দিয়ে আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই সক্রিয় সংগঠনের কর্মীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সংগঠনের কর্মী ও শাখা সংখ্যা কি পরিমাণে বাড়াতে হবে সে হিসেবের প্রয়োজন নেই। তবে একটা দেশের সর্বস্তরের মানুষের অভাব, অভিযোগ পরিস্থিতি ও মানসিকতার সঠিক বিবরণ কেন্দ্রীয় সংগঠন জানতে সক্ষম হয় সংগঠনকে এতটুকু বিস্তৃত মজবুত ও সক্রিয় অবশ্যই হতে হবে। এ জন্য উর্ধ্বতন সংগঠনের কাছে নিম্নতম সংগঠনের প্রকৃত অবস্থা ও কার্যক্রমের নির্ভুল বিবরণী পৌছানো একান্তই অপরিহার্য। নিয়মিত পরামর্শ ও সমালোচনার ভিত্তিতে কর্মীদের সমন্বয় সাধন ও সংগঠনের স্থায়ী ও ইস্যু ভিত্তিক পলিসি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন একটি আদর্শবাদী সংগঠনের জীবনী শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে।

ব্যাপক গণসমর্থন ও বলিষ্ঠ জনমত :

ইসলামী আন্দোলনের জাগতিক লক্ষ্য মানুষের সমাজে কল্যাণ ও সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। তাই মানুষের সমর্থন নিয়ে মানুষের মন জয় করেই এ আন্দোলন সত্যিকারের সাফল্য লাভ করতে পারে। মনে রাখা উচিত, সাধারণ মানুষ শান্তিকামী। ভালো জিনিস গ্রহণ করা এবং খারাপ জিনিস বর্জন করা মানবতার স্বাভাবিক দাবী। কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে মানুষ প্রায়ই মানবতার ডাকে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়ে থাকে। সমাজের প্রভাবশালী সংখ্যালঘু ব্যক্তিবর্গের দাপটে তারা প্রায়ই ভুলপথে পরিচালিত হতে বাধ্য হয়। জনগণ ভালো চায় সত্য, কিন্তু এ ভালোর প্রতি তাদের স্বাভাবিক আবেগ অনুভূতিই কেবল কাজ করে থাকে। কিসে ভালো হবে না হবে তা একযোগে তাদের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। সমাজের প্রভাবশালী সক্রিয় ব্যক্তিরা প্রচার প্রোপাগান্ডার জোরে যা কল্যাণকর বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হয় জনমত সে দিকেই ধাবিত হয়।

নিজের মতাদর্শের মাহাত্ম্য প্রচার ও বিপরীত মতাদর্শের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা এটা একটা প্রচলিত নিয়ম। কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিপক্ষ প্রত্যক্ষ ভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। কুৎসা রটানোর সাথে সাথে শক্তি প্রয়োগ এবং ভীতি প্রদর্শনের পথও তারা বেছে নেয়, যাতে করে ইসলামী ব্যবস্থার রূপরেখা তথা আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের বক্তব্য জনমনে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ না পায়। তাছাড়া জনমত গড়ে তোলার আধুনিক প্রচার মাধ্যমগুলো ইসলাম পন্থীদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে জনমত গড়ে তোলাকে অনেকাংশে অসম্ভব মনে হয়। এটা কষ্টসাধ্য, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অসম্ভব বললে সত্যের পরিপন্থী হবে। একটা সক্রিয় সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সে অনুযায়ী কাজ হলে প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতা ছাড়াই যাবতীয় প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে ইসলামের পক্ষে জনমত গড়ে উঠতে বাধ্য। ইসলামের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার মূল মাধ্যম কর্মীবাহিনী। যদি তারা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সততা বুদ্ধিমত্তা সাহসিকতা সামাজিকতার (গণমুখী) পরাকাষ্ঠা দেখাতে সক্ষম হয় তা হলে কোন শক্তিই এ পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না। জনমত স্বপক্ষে আনার জন্য কর্মী সংখ্যা ব্যাপক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সংখ্যার চেয়ে বেশী প্রয়োজন হলো গণমুখী চরিত্র সম্পন্ন কর্মীদের নিজ নিজ পরিসরে স্থায়ীভাবে জনগণের সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলা। কোন বৃহত্তম আদর্শের পক্ষে সাময়িক পদক্ষেপ গ্রহণ করে রাতারাতি কোন গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত করা সম্ভব নয়। এক একটা অভ্যুত্থানের জন্যে

নির্দিষ্ট সময় সুযোগ বেছে নিতে হবে। সময়ের একটা স্বাভাবিক গতিধারায় মানুষের মনে কোন বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রতি অথবা রাজনৈতিক কর্মসূচীর প্রতি মোহ হয়ে থাকে। এই মোহ যেমন হঠাৎ করে কাটানো যায় না, তেমনি শত চেষ্টা করেও স্থায়ী করা যায় না। ইসলামী বিধান ছাড়া সমাজে আর যত বিধানই চালু হয় তা এরূপ একটির প্রতি মোহ ও অপরটির প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করেই চালু হয়ে থাকে। এজন্যে এগুলো কোন অবস্থাতেই স্থায়ী হতে পারেনা। মানুষের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই দুনিয়াতে ক্ষমতার হাত বদল হয়, কিন্তু মানুষের সমাজে স্থায়ী শান্তি কায়েম হতে পারে না। ইসলামী সমাজ বিপ্লবের সংগ্রামে যারা নিয়োজিত মানুষের মনে মোহ ও বিদ্বেষ সৃষ্টির এই স্বাভাবিক গতির দিকে যেমন তাদের চেয়ে থাকলে চলবে না তেমনি একে উপেক্ষা করলেও চলবে না। বরং মানুষের মন ও মানসিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে সদা সক্রিয়ভাবে তাকে নিজস্ব খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সমাজে একটা বিপ্লবী পরিবর্তন আনতে হলে যে প্রবল শক্তি ও জনমতের প্রয়োজন তা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার ও তার পৃষ্ঠপোষকদের দুর্বলতার প্রতি অংগুলি নির্দেশের চেষ্টা করতে হবে। মানুষের সমাজে শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতনের জন্যে এক দিকে দায়ী প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা আরেক দিকে দায়ী সমাজের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব। মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে এই প্রচলিত ব্যবস্থার (যাকে আমরা খোদাহীন জীবন ব্যবস্থা বলে থাকি) এবং প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের (যাকে আমরা অসৎ নেতৃত্ব বলে থাকি) বাস্তব কুফল (যা সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করছে) তুলে ধরে এর বিরুদ্ধে একটা স্বাভাবিক ও স্বত:স্ফূর্ত জনমত সৃষ্টি করতে হবে। আরও অগ্রসর হয়ে এর বিরুদ্ধে মানুষকে সোচ্চার ও প্রতিবাদমুখর করে তুলতে হবে। তৃতীয় ধাপে প্রতিবাদ মুখর গণশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ও নেতৃত্ব পরিবর্তন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা উৎখাত করে যে নতুন ব্যবস্থা ও নতুন নেতৃত্ব (আল্লাহর প্রভুত্ব ও সৎ নেতৃত্ব) প্রতিষ্ঠা আমরা করতে চাই তার প্রতি মানুষের মনে একটা স্বাভাবিক ও স্বত:স্ফূর্ত আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। মানুষের মুখে মুখে এর চাহিদার কথা উচ্চারিত হতে হবে এবং শেষ পর্যায়ে উক্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরকে সর্বশক্তি নিয়োগে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ পর্যায়ে কর্মীদের ভূমিকা যত বলিষ্ঠ হবে জনমতও হবে তত ব্যাপক ও শক্তিশালী। মানুষের সামনে ইসলামী সমাজের রূপরেখা পেশ করার ব্যাপারে নৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের কথাকে সর্বস্তরের মানুষের মনের কথা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে দার্শনিক-তাত্ত্বিক জটিলতা পরিহার করে মানুষের দু:খ-দুর্দশার বাস্তব চিত্র তুলে ধরে এক কথায় খোদার আইনের সমাধান পেশ করতে হবে। জনমত সৃষ্টির জন্য প্রত্যেকটি লোকের ঘরে ঘরে যাওয়া জরুরীও নয়, সম্ভবও নয়। মানুষের ঘরে ঘরে যাদের আনাগোনা, সমাজের বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রের সাথে যাদের যোগাযোগ তাদের সক্রিয় করে

তুলতে পারলেই এরূপ জনমত সৃষ্টি হতে পারে। উল্লেখিত পর্যায়গুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলামী আন্দোলনের গতিধারা সুষ্ঠু ও নির্ভুল খাতে প্রবাহিত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করার মাধ্যমেই ইসলামী সমাজ বিপ্লব চূড়ান্তরূপ লাভ করতে সক্ষম হবে।

ইসলামী সমাজ বিপ্লবের পূর্বশর্ত

বিপ্লব কথাটা আজকাল একটা সস্তা বুলিতে পরিণত হয়েছে। যার তার মুখে যেখানে সেখানেই আজকাল এ শব্দটা উচ্চারিত হতে শোনা যায়। বুঝে হোক, না বুঝে হোক এ কথাটার এত বেশী আলোচনা থেকে অন্তত: একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয় যে, জনমতে সচেতন ভাবে হোক আর অবচেতন ভাবেই হোক মানুষ এই 'বিপ্লব' শব্দটার বাস্তব প্রয়োগ দেখতে চায়। একটা বিপ্লব দরকার, আর জোড়াতালি নয়- কথাটা এ পর্যন্ত এক ও অভিন্ন। কিন্তু কোন ধরনের বিপ্লব চাই? এ প্রশ্নের উত্তরে বিপ্লব প্রয়াসীদের বিপ্লব শব্দের সাথে হয় ইসলামী না হয় সমাজতান্ত্রিক শব্দটা যোগ করতে দেখা যায়।

যারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের সামনে নিকট অতীতের বিপ্লবের মডেল রয়েছে দুটি বৃহত্তম সমাজতান্ত্রিক দেশে। এই উপমহাদেশে তাদের সুসংগঠিত তৎপরতা শুরু হয় রুশ বিপ্লবের পূর্ব থেকেই। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে ও বিপ্লবের তাত্ত্বিক মত পার্থক্যের কারণে তারা প্রথমত: দ্বিধা বিভক্ত হয়। বর্তমানে তাদের দল উপদলের সঠিক সংখ্যা এবং তাত্ত্বিক মত পার্থক্যের ধরন ধারণ জানাটা বাস্তবে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অবশ্য রুশ পন্থী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে আর কোন তাত্ত্বিক মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে বলে জানা যায়নি। একটি বিরাট পরাশক্তির সার্বিক সহযোগিতা সত্ত্বেও সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমকারী এই মহল এখন তাদের বিপ্লবের চূড়ান্ত দিন ক্ষণ খুব নিকটে বলে মনে করে এমন ইশারা ইঙ্গিত আমাদের জানার সুযোগ হয়নি। বরং তাদের কোন কোন মুখপাত্রের মতে অন্তত: আর পনের বছরের আগে তারা এমন চিন্তা করতে প্রস্তুত নন। রাজনীতিতে তাদের সাম্প্রতিক কালের আপোষমূলক ভূমিকাও সম্ভবত: এ কারণেই।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রয়াসীদের মধ্যে যারা অতি বিপ্লবী এবং তড়িঘড়ি কিছু ঘটাতে চেয়েছেন তারা তাদের পক্ষের অনুকূল পরিবেশকে অবশেষে বিপক্ষেই ঠেলে দিয়েছেন। তাদের আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণে এটাই ধরা পড়ার কথা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রুশপন্থী ধারা তাদের প্রতিপক্ষের এসব পদক্ষেপকে হঠকারী এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে ক্ষতিকরই মনে করে এসেছে। অতিবিপ্লবী এবং হঠকারী চিন্তাধারার প্রভাব থেকে নিজস্ব জনশক্তি ও সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলোকে মুক্ত রাখতে পারা রুশপন্থী সমাজতন্ত্রীদের একটা বড় রকমের সাফল্য বলতে হবে। ১৯৬৫ সনে ইন্দোনেশিয়ার ঘটনা এবং ১৯৭৯ এর শেষ লগ্নে আফগানিস্তানের ঘটনা থেকে তারা অবশ্য অবশ্যই

এ মূল্যায়ণ করে থাকবেন যে, অপরিপক্ক অবস্থায় বিপ্লবের চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়ার পরিণাম কত অশুভ হতে পারে। ইসলামী বিপ্লবের এমন প্রয়াসী যারা তারা ভাল করেই জানেন নিকট অতীতে এ বিপ্লবের এমন কোন মডেল আমাদের সামনে নেই যার অনুসরণ করা যেতে পারে। অতি সাম্প্রতিককালের ইরানের ইসলামী বিপ্লবের চূড়ান্ত রূপরেখা জানার সুযোগ এখনও আসেনি। এ বিপ্লব টিকে থাক, ষোল কলায় সফল হোক এটা সকলেরই আন্তরিক কামনা। কিন্তু যে চূড়ান্ত পর্যায় অতিক্রম করলে একটি বিপ্লবকে চূড়ান্ত রূপে ইসলামী বিপ্লবের মডেল রূপে গ্রহণ করা যায় ইরানের ইসলামী বিপ্লব সে পর্যায় ইতিমধ্যেই অতিক্রম করেছে, না এখনও বাকী আছে এ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়ণের অবকাশ আছে। অতএব ইসলামী বিপ্লব প্রয়াসীদের সামনে অনুসরণ ও অনুকরণ যোগ্য প্রকৃত মডেল রাসূল (স.) এর নেতৃত্বে সংঘটিত বিপ্লব ছাড়া আর কোনটিই হতে পারে না। দূর অতীতের সে মডেল সামনে রেখে আমাদের ভূখন্ডে সুসংগঠিত ভাবে ইসলামী বিপ্লবের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সুসংগঠিত প্রচেষ্টা শুরু হবার অনেক পরে, এই ঐতিহাসিক সত্যতা ও বাস্তবতা উপেক্ষণীয় নয়।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বিপ্লবী জীবন ইতিহাস থেকে কোন রোমান্টিক কর্মকান্ড আবিষ্কারের অবকাশ নেই। সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের মত কর্মকান্ডের সাথে রাসূলের সংগ্রামী জীবনের কোন দূরতম সম্পর্ক ইসলামের জাত শত্রু কোন ঐতিহাসিকের পক্ষেও দেখানো সম্ভব হয়নি। নিছক জনগণের ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে তিনি হঠাৎ করে কিছু করে ফেলেছেন, এমন শিক্ষাও তাঁর জীবন থেকে জানা যায় না। তিনি নবী ছিলেন, বুজুর্গ ছিলেন এই কারণে বিনা বাধায় তাঁর কাফেলা চূড়ান্ত বিজয় লাভে সক্ষম হয়েছে এরূপ মন্তব্যও দুনিয়ার কোন ঐতিহাসিক করতে পারেনি। তার নেতৃত্বে সংঘটিত বিপ্লবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাধা প্রতিবন্ধকতার দুর্লংঘনীয় প্রাচীর অতিক্রম করতে হয়েছে এটাই ইতিহাসের প্রকৃত সাক্ষ্য।

রাসূলের সেই সফল বিপ্লবের পিছনে যে উপাদানগুলো আমরা মূখ্য রূপে দেখতে পাই তা নিম্নরূপ :

প্রথম ১৩ বছর মক্কায় কিছু সংখ্যক যোগ্য ও সৎ লোক তৈরী হয়েছে। মক্কী জীবনের শেষের দিকে মক্কায় আগত মদিনার প্রভাবশালী লোকদের মাধ্যমে মদিনাবাসীদেরকে সংগঠিত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সেই সুযোগে মদিনাবাসীর সমর্থন এসেছে ইসলামের পক্ষে।

রাসূল (স.) মক্কা থেকে মদিনায় আসার পর ইসলাম বিজয় যুগে পদার্পণ করে। জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হলে ইসলামী সমাজ গঠনের যাত্রা শুরু হয়। এই বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটানো এবং তা ধরে রাখার মত জনশক্তি আল্লাহর রাসূল মদিনায় আসার আগেই তৈরী করেছিলেন।

এই পরিবর্তনের মধ্যে ইসলামী বিপ্লবের কাফেলার অগ্রগতিকে ব্যাহত করার জন্য মদিনার ভিতর এবং বাহির থেকে যুগপৎ ভাবে উপর্যুপরি আঘাত এসেছে। সেই আঘাতের মুকাবিলা করে বিপ্লবকে টিকিয়ে রাখার মত প্রতিরোধ ক্ষমতাও এ বিপ্লবের মহানায়ক হযরত মুহাম্মদ (স.) অর্জন করেছিলেন। দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বকালে সর্বযুগের তুলনায় একমাত্র ষোল আনা সফল এই বিপ্লবকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করলে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়কে আমরা ইসলামী বিপ্লবের পূর্বশর্ত হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

এক : মজবুত সাংগঠনিক ভিত্তি

রাজধানী শহর থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যায়ের মানুষের মাঝে ইসলামের বিপ্লবী চেতনা পৌঁছে দেয়ার এবং সর্বস্তরের সক্রিয় ও সচেতন জনশক্তিকে বিপ্লবের পক্ষে কাজে লাগাবার মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হবে এই সাংগঠনিক ভিত্তি। নিছক কিছু লোকের একত্রিত হয়ে যাওয়ায় এ ভিত্তি তৈরী হয় না। সংখ্যাশক্তিও এখানে তেমন বিবেচ্য বিষয় নয়। সমাজের সক্রিয় ও সচেতন অংশ-সংখ্যা তাদের যাই হোক না কেন, যদি বিপ্লবের সত্যিকারের চেতনা জেনে বুঝে তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে, বিপ্লবের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে জেনে বুঝে সচেতন ভাবে নিজের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করে নেয় এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আর যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের মাঝে এক দেহ এক প্রাণ হয়ে প্রতিনিয়ত তৎপরতা চালাতে থাকে। ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপরতা ও গণসংযোগের মাধ্যমে জাতির বিবেক বুদ্ধি ও সিদ্ধান্তকারী শক্তিতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত এই মজবুত সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ার কাজকে অব্যাহত রাখতে হবে।

দুই : সক্রিয় ও সচেতন জনমত

নিষ্ক্রিয় এবং অবচেতন জনমত কোন বিপ্লবী পরিবর্তনের জন্য সহায়ক নয়। বিপ্লব যে আদর্শের ভিত্তিতেই হোক না কেন তার প্রতিপক্ষ থাকবেই। এই প্রতিপক্ষ জনমতকে কলাকৌশলের মাধ্যমে যেমন বিভ্রান্ত করতে পারে, ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার উদ্যোগ নিতে পারে, তেমনি ভয় ভীতির সৃষ্টির মাধ্যমে, বল প্রয়োগের মাধ্যমে স্তব্ধ করার ব্যবস্থাও করতে পারে। অবচেতন এবং নিষ্ক্রিয় জনমত এসবের মোকাবিলায় বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। তাই এইরূপ জনসমর্থন বা জনমত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর হলেও তা কার্যক্ষেত্রে বিপ্লবের সহায়ক হতে পারে না। পক্ষান্তরে বিপ্লবের পক্ষের জনগোষ্ঠী সংখ্যা শক্তির বিচারে সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনেক নীচে এমনকি অনুল্লেখযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও যদি সক্রিয় এবং সচেতন হয় তাহলে প্রতিপক্ষের উভয়বিদ কৌশলের মোকাবিলায় ময়দানে টিকে থাকতে বরং ময়দান দখলে রাখতে সক্ষম হয়।

তিন : ধারণ ক্ষমতা

বিপ্লব সংঘটিত করা নি:সন্দেহে কঠিন কাজ। কিন্তু তার চেয়েও কঠিন হল বিপ্লবকে ধরে রাখা। মানুষের সমাজে কোন বিপ্লব সংঘটিত করার মাধ্যমে যেমন মানুষেরই একটি সক্রিয় অংশ, তেমনি এ বিপ্লবকে ধরে রাখা-সফল রূপ দেয়ার বাহনও মানুষের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। সমাজ জীবনের স্নায়ু কেন্দ্রে যাদের অবস্থান তারা যদি বিপ্লবকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে না পারে, আর তাদের স্থান দখলের মত যথাযোগ্য জনশক্তি যদি তৈরী না হয় তাহলে যে কোন বিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এ ধরনের স্নায়ুকেন্দ্রের দায়-দায়িত্ব পালন উপযোগী লোক রেডিমেড যেমন পাওয়া সম্ভব নয় তেমনি কোন জরুরী পদক্ষেপ নিয়ে রাতারাতি এরূপ দক্ষ জনশক্তি তৈরী করাও সম্ভব নয়। বস্তুতঃ সত্যিকারের বিপ্লব যাদের কাম্য তাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় বিপ্লবের ধারণ ক্ষমতা সৃষ্টির এই বিষয়টি সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনার মধ্যে অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য।

চার : প্রতিরোধ ক্ষমতা

রাসূলের নেতৃত্বে সংঘটিত বিপ্লবের পরেও আমরা দেখতে পাই ভিতর ও বাহির থেকে একে নস্যাৎ করার জন্য প্রতিপক্ষ চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র আঁটতে কসুর করেনি। আজকের দিনেও যদি কোথাও বিপ্লব সফল হয় তাহলে ভিতর ও বাহির থেকে তাকে ব্যর্থ করার জন্যে বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার আশংকা রয়েছে। বরং আধুনিক যুগে এ ধরনের ষড়যন্ত্র অতীতের তুলনায় অনেকগুণ বেশী তীব্র হওয়াটাই স্বাভাবিক।

ইসলামী বিপ্লবের যারা স্বপ্ন দেখেন, মনে প্রাণে একান্ত নিষ্ঠার সাথে নিজেদের জীবদ্দশায় এরূপ একটা সফল বিপ্লব দেখে যাওয়ার আকুল আগ্রহ পোষণ করেন, তাদের মনে রাখতে হবে, বিপ্লবের শ্লোগান শুনে কেউ পথ খালি করে দেবে না। চতুর্মুখী-রণ চাতুর্যের মাধ্যমে তারা একে ব্যর্থ করার আগ্রাসী প্রচেষ্টা চালাবে। বিশেষ করে ইসলামী বিপ্লব চূড়ান্ত পর্যায়ে কায়েমী স্বার্থের মূলে যে আঘাত হানবে তার পূর্বাহ্নেই তারা পাল্টা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার তাগিদেই। সে অবস্থার স্বার্থক মোকাবিলায় শক্তি ও পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া কোন বিপ্লবই টেকসই হতে পারে না। ইসলামী বিপ্লবের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটার সঙ্গত কোন কারণ নেই। অবশ্য আমরা সক্রিয় ও সচেতন জনমত বলতে যা বুঝাতে চেয়েছি, বিপ্লবের প্রতিপক্ষের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও চর্তুমুখী আঘাতের মুকাবিলায় সেটাকেই সত্যিকারের প্রতিরোধ ব্যবস্থা মনে করি।

পাঁচ : সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্রান্তের মুকাবিলা

উল্লিখিত চার দফা প্রস্তুতির সাথে সাথে আজকের বিশ্বে পরাশক্তির নানাবিধ কুট-কৌশল এবং চক্রান্তের মোকাবিলায় যোগ্যতা এবং প্রস্তুতি অপরিহার্য।

মরক্কো থেকে নিয়ে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সর্বত্রই ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে। কোথাও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এককভাবে কোথাও সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ এককভাবে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মরণ আঘাত হানছে। কোথাও যৌথ-ভাবে তারা এ আঘাত হানছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকলেও ইসলামী পূনর্জাগরণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে তারা এক ও অভিন্ন। বাংলাদেশে এই উভয় পরাশক্তির পাশে আর একটি বাড়তি শক্তি কার্যকর রয়েছে। যা মূলত: এ ভূখন্ডে দুই পরাশক্তির আড়ৎদারের ভূমিকা পালন করছে। তাদের উভয় শক্তির পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের মূল হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হবার আশংকা রয়েছে। শক্তি এবং বুদ্ধি উভয় দিক দিয়ে তাদের কলাকৌশলের মোকাবিলা করার মত যোগ্যতা অর্জন করাও স্বার্থক ইসলামী বিপ্লবের জন্য অপরিহার্য।

যারা সত্যিকার অর্থে ইসলামী বিপ্লবের প্রয়াসী তাদেরকে নিছক ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত না হয়ে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা ভাবনা করে পদক্ষেপ নিতে হবে। উপরোক্ত শর্তাবলী পুরণের কাজকে সময় সাপেক্ষ ও দীর্ঘ সূত্রিতা মনে করে অধৈর্য্য ও অসহিষ্ণু হয়ে রাতারাতি কিছু করতে চাইলে বিপ্লবের বাঞ্ছিত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কাজকে আবার বিলম্বিতই করা হবে। এমনকি অপরিণামদর্শী ও অপরিপক্ক পদক্ষেপ দীর্ঘদিনের লালিত একটি সম্ভাবনাকে সুদূর পরাহতও করে ফেলতে পারে। ইসলামী বিপ্লব প্রয়াসী সংগঠিত জনশক্তির সচেতনতা ও দুরদর্শিতা এর রক্ষাকবচ।

লেখাটি সাবেক আমীরে জামায়াত, চার দলীয় জোট সরকারের সফল ও দুর্নীতিমুক্ত কৃষি ও শিল্পমন্ত্রী বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ও ইসলামী চিন্তাবিদ, সুলেখক এবং আল্লাহর দ্বীনের পথে প্রাণ উৎসর্গকারী নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী (রহ.) এর "গণতন্ত্র, গণবিপ্লব ও ইসলামী আন্দোলন" শীর্ষক পুস্তক থেকে চয়নকৃত। বইটি তিনি আশির দশকের শেষ দিকে লিখেছিলেন। ১৯৯০এর জুনে বইটি প্রথম প্রকাশ পায়। হুজুগে বিপ্লবের চিন্তায় বিভোর এক জেনারেশনের সামনে তিনি উপস্থাপন করেছিলেন একটি কাংখীত ও টেকসই ইসলামী বিপ্লবের দিক নির্দেশনা। লেখায় তখনকার প্রেক্ষাপটের একটা ছাপ থাকলেও হেদায়াতটা ইসলামী আন্দোলনের স্থায়ী পলিসির অংশ। 'রাহবার' এর পাঠকগণ ইসলামী সমাজ বিপ্লবের পদ্ধতিগত বিষয়টি নিয়ে আমাদের পূর্বসূরীদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ক্লিয়ার ম্যাসেজ পাবেন বলে আশা করি। মহান আল্লাহ তায়া'লা তাঁর এ মহান বান্দাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানিয়ে নিন। আমাদেরকে তাঁর রেখে যাওয়া আমানতকে কামিয়াবীর মঞ্জিলে টেনে নিয়ে যেতে মেধা, শক্তি, সাহস, কৌশল ও দূরদর্শিতা দান করুন। আমীন।

আমার দেখা মুহতারাম মকবুল আহমাদ

রফি উদ্দিন আহমদ

তিনি আমানতদারীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। ব্যক্তি জীবন ও দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবনে কারো পক্ষ হতে আমানতদারীর ব্যাপারে অভিযোগ তো দুরের কথা সামান্য প্রশ্ন তোলারও সাহস হয়নি। তাঁর এ আমানতদারীর বিষয়টি শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি আমানতদারীর শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

যে কোন মানুষকে সঠিকভাবে জানতে হলে, বুঝতে হলে, মূল্যায়ন করতে হলে অতি কাছ থেকে দেখতে হয়, উঠা বসা ও লেনদেন করতে হয়। মুহতারাম মকবুল আহমাদ (রহ.) এর সাথে দীর্ঘ ৩৩/৩৪ বছর আমার একসাথে কেটেছে। তাঁর সাথে উঠা বসা হয়েছে। এক সাথে অনেক সাংগঠনিক সফর করেছি। খুব কাছ থেকে তাঁকে জানার, বুঝার, শিক্ষা গ্রহণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সাংগঠনিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাঁর সাথেই ছিলো আমার সম্পর্ক সবচেয়ে বেশী গভীর ও বহুমুখি। ব্যক্তিগত সমস্যাদি নিয়ে শুধু তাঁর সাথেই আলোচনা করতাম। পারস্পরিক সুখ-দু:খের ছোট বড় সব বিষয়ে আমরা একে অন্যের সাথে বিনা দ্বিধায় শেয়ার করতাম। পারিবারিক পরিসরের ছোট খাট সামাজিক অনুষ্ঠানেও হাজির থাকা আমাদের মধ্যে নিয়মে পরিণত হয়েছিলো। দু'পরিবারের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। অবশ্য পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে সম্পর্ক সাংগঠনিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

যারাই তাঁকে মনের গভীরতা দিয়ে দেখেছেন, তারা নিশ্চয় তাঁর মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর জীবনের ঝলক দেখেছেন। অধ্যাপক গোলাম আযম মুহতারামের (রহ.) জীবনের সাথে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর জীবনের মিল খুঁজে পাওয়া যেত। মকবুল আহমাদ সাহেবের

জীবন ছিলো অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি, পরিকল্পিত ও সাজানো গোছানো। সময়ানুবর্তিতা ছিলো তাঁর সারা জীবনের অনুসরণীয় উদাহরণ। সব সময় তিনি ছোট বড় প্রতিটি কাজ সময় মতই করার চেষ্টা করতেন। অন্যদেরও এ ব্যাপারে তাকিদ দিতেন। তিনি সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। পোষাক-আশাক ছিলো সাদা মাটা। বছরের পর বছর একই ধরনের জামা, সেন্ডেল ও জুতা পরতে তাকে দেখা গিয়েছে। ব্যবহার অনুপোযোগী হওয়ার আগ পর্যন্ত শুধু পুরানো হওয়ার কারণে এগুলো তিনি বাদ দিতেন না। কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে খুব বেশী সচেতন ছিলেন। শেষদিকে এসে ছেলেদের কারণে মূল্যবান পাঞ্জাবী পরতে দেখা গেছে। ছেলে মেয়েরাই নিজেদের পছন্দমত জামা কাপড় ক্রয় করে নিয়ে আসতো। তাঁকে পরার অনুরোধ জানাতো। তাঁর দায়িত্বশীল হওয়ার কারণে নয়, তার সুন্দর আচরণের কারণে অফিসের সকল স্টাফ তাঁকে শুধু সম্মান করতো না, ভালোবাসতো। শুধু নিজ এলাকায় নয়, ফেনী শহরের সর্ব সাধারণ এবং সংগঠনের সর্বস্তরের জনশক্তির নিকটও তিনি বিশেষ সম্মান ও ভালোবাসার পাত্র ছিলেন। বাসার দারোয়ান ও অন্য সকল ভাড়াটিয়ারা তাঁকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতো। তিনিও দারোয়ানদের অসুবিধা ও সমস্যার কথা জানতেন, সহযোগীতা করতেন, সম্মানজনক আচরণ করতেন।

তাঁর জীবনের সাথে সম্পর্কীত কিছু খন্ডচিত্র তুলে ধরা হলো :

আদল ও ইনসাফ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ হলো-

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

অর্থাৎ- 'যখন কথা বলো, ন্যায্য কথা বলো। যদিও বিষয়টি তোমার আত্মীয়-স্বজনের সাথেই সংশ্লিষ্ট হোকনা কেন।' (সূরা আনআম-১৫২)

এ বিষয়ে মকবুল সাহেব ছিলেন আপোষহীন ও অনমনীয়। তার মুখে শুনা ও ব্যক্তিগতভাবে জানা তিনটি ঘটনা।

১. মকবুল সাহেবদের পরিবার নিজেদের জায়গা-জমি কামলা দিয়ে নিজেরাই চাষাবাদ করাতেন। তাদের পিতা সংসার পরিচালনার সাথে সাথে চাষাবাদের কাজও তদারকি করতেন। ভাইয়েরা সকলেই লিখাপড়া করতো। মকবুল সাহেব নিজেও ফেনীতে লজিংএ থেকে লিখা পড়া করছিলেন। এক পর্যায়ে বাড়ী এসে দেখলেন যে পিতা তাঁর এক ভাইকে পড়া লিখা বাদ দিয়ে চাষাবাদ তদারকির দায়িত্ব দিয়েছেন। নিজেরা সবাই লিখা পড়া করবে, আর একভাই একা সংসারের ঘানি টানবে, এটা তাঁর নিকট ইনসাফের খেলাফ মনে হলো। তিনি পিতার কাছে প্রস্তাব করেন, হয় আমাদের সকলের পড়ালিখা

বন্ধ করে সবাইকে সাংসারিক কাজে লাগান অথবা জায়গা জমি সব বর্গা দিয়ে তাকেও পড়ালিখার সুযোগ করে দিন। তার চাপাপাপিতে বাধ্য হয়ে পিতা দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সে ভাই পরে লিখা পড়া শেষে সিনিয়র সরকারী অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শেষ করে বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

২. একই এলাকার এক পরিবারের সাথে তাঁদের পরিবারের ঘনিষ্টতা সৃষ্টি হয় এবং সেটা অনেকটা আত্মীয়ের পর্যায়ে পৌছায়। এর মধ্যে মকবুল সাহেবের সাথে ঘনিষ্টতা ছিলো অনেক গভীরের। সে পরিবারের সাথে পাশ্ববর্তী একটা সংখ্যালঘু পরিবারের জমি সংক্রান্ত জটিলতা চলে আসছিলো। অনেক চেষ্টার পরও সমস্যার সমাধান হচ্ছিলোনা। এক পর্যায়ে দুপক্ষ তাঁকে এককভাবে সমস্যা সমাধানের নি:শর্ত দায়িত্ব অর্পন করে। দু'পক্ষের কথা শুনে ও কাগজ পত্র দেখে তিনি সংখ্যালঘু পরিবারের পক্ষে রায় প্রদান করেন এবং মুসলিম পরিবারটিকে রায় মেনে নিতে বাধ্য করেন। এ কারণে মুসলিম পরিবারটি ক্ষুব্ধ হয়ে দূরে সরে যায়। পরে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে পরিবারটি নিজেরাই এগিয়ে এসে পূর্ব সম্পর্ক আবার গড়ে তোলে, যা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিলো।

৩. তার ঘনিষ্ট জনদের একজনের ছেলের সাথে অপরিচিত একজন যুবকের অর্থনৈতিক সমস্যা হয়। যুবকটি তার পরিচিত এক ব্যক্তির মাধ্যমে বিষয়টি মকবুল সাহেবের নজরে আনে। মকবুল সাহেব নিজের ঘনিষ্টজনকে সমস্যাটি সমাধানের নির্দেশ দেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগীতাও করেন। এতে করে দীর্ঘদিন চলে আসা সমস্যাটি এক সপ্তাহের মধ্যে ইতি ঘটে। সাধারণভাবে ইনসাফের নীতি অবলম্বন করা গেলেও জালেম শত্রুর সাথে ইনসাফের আচরণ অনেক কঠিন। সে ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সফল। ১৯৯৬ এর নির্বাচনে তিনি আমাদের পক্ষ হতে ফেনী দাগনভূঁঞা নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থী ছিলেন। নির্বাচনের দিন আওয়ামী সন্ত্রাসীরা অনেকগুলো কেন্দ্র থেকে আমাদের বের করে দিয়ে ব্যালটে সীল মেরে বাক্স ভর্তি করতেছিলো, কিছু এলাকা আমাদের প্রভাবাধীন ছিলো। সে সব এলাকার আমাদের নির্বাচনী কর্মীগণ মকবুল সাহেবের কাছে কেন্দ্র দখলের অনুমতি দাবী করে। তাঁর পরামর্শ ছিলো তোমরা ব্যাপক ভোটার উপস্থিতির ব্যবস্থা কর। কর্মীদের চাপাচাপির এক পর্যায়ে তিনি বলেন সীল মারা এমপি বানিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে তোমাদের অবৈধ আবদার রক্ষায় আমাকে বাধ্য করার পরিবেশ তৈরীর চেষ্টা করছ। তোমাদের ময়দানে কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। সবাই নিজ নিজ বাড়ী চলে যাও। নির্বাচনের উত্তপ্ত ময়দানে চারিত্রিক এ দৃঢ়তা প্রদর্শন নিশ্চয় সহজ বিষয় ছিলো না। কেউ তার সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমালঙ্ঘন করলে তার পিছনে না লেগে তাকে ক্ষমা করে দিতেন এবং বিষয়টি মন থেকে মুছে

ফেলতেন। তিনি বলেছেন, চট্টগ্রামের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর মধ্যে আমি এ আচরণ দেখেছি। ব্যবসায়ীর যুক্তি ছিলো কারো পিছনে লেগে সময় ব্যয় করে প্রতিশোধ নেয়া যেতে পারে, কিন্তু এতেতো কোন লাভ নেই বরং ঐ মেধা ও সময় ব্যবসাতে লাগিয়ে আমি লাভবান হতে পারি। মকবুল সাহেব এ চিন্তা ধারার অধিকারী ছিলেন। তাঁকে কখনো প্রতিশোধ পরায়ন হতে দেখা যায়নি। বিরোধীরা আদর্শিক বিরোধীতার সাথে সাথে তাঁকে সম্মানও করতো। নিজেদের মধ্যে তাঁর উন্নত নৈতিকতার বিষয়ে আলোচনা করতো।

অপচয় পরিহার করে চলা : আল্লাহর নির্দেশ হলো لَا تُبَذِّرْ তুমি অপচয় করোনা। মকবুল সাহেব সর্বক্ষেত্রে এ নির্দেশ মেনে চলার চেষ্টা করতেন। তিনি সব সময় স্বল্প মূল্যের লুঙ্গি ব্যবহার করতেন। টাওয়াল ব্যবহার না করে সারা জীবন সাধারণ মানের মধ্যম সাইজের গামছা ব্যবহার করে গেছেন। পানির অপচয় থেকে বাঁচার জন্যে অযুর সময় পারতপক্ষে ট্যাপ ব্যবহার না করে মগ, জগ বা বদনা ব্যবহার করতেন। কফ ও থুথু ফেলার সময় টিস্যু ব্যবহার করতেন। তবে পুরো টিস্যু একসাথে ব্যবহার করতেন না। দু'ভাগ করে একভাগ ব্যবহার করতেন, অন্যভাগ পরে ব্যবহারের জন্যে পকেটে রেখে দিতেন। পানির ট্যাপ বন্ধ করা, লাইট, ফ্যান অফ করার ব্যাপারে তিনি খুব সচেতন ছিলেন। অন্যদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। কাগজের ছোট টুকরোটি ফেলে না দিয়ে প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যে সংরক্ষণ করতেন। লিখার পরিমাণের আলোকে কাগজের সাইজ নির্ধারিত হতো। এ জন্যে বিভিন্ন সাইজের কাগজ তৈরী রাখতেন। খাওয়ার প্লেটে খাদ্য কণাও যেন থেকে না যায়, খেয়াল রাখতেন। যে পরিমাণ পানি পান করতেন, গ্লাসে সে পরিমাণ পানি ঢালতেন। সময়ের প্রতিটি মিনিট, সেকেন্ড কাজে লাগানোর চেষ্টা করতেন। চিকন লিখার কলম ব্যবহারের চেষ্টা করতেন। ছোট ছোট অক্ষরে লিখায় অভ্যস্ত ছিলেন। ফ্যানের গতিও প্রয়োজন মোতাবেক নিয়ন্ত্রিত হতো। বক্তৃতা ও আলোচনায় সময়ের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। পয়েন্ট ভিত্তিক আলোচনায় অভ্যস্ত ছিলেন। বৈঠকী আলোচনায় প্রসঙ্গের বাহিরে যেতেন না। কর্মপরিষদ সদস্য, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও নায়েবে আমীর হিসেবে দীর্ঘসময় সাধারণ চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করেছেন। দায়িত্ব পরিবর্তনের সাথে তার চেয়ার, টেবিল ও অফিস রুমে কোন পরিবর্তন আসেনি। কথাবার্তা ও চালচলনেও কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। নির্মোহ জীবনের তিনি ছিলেন বাস্তব উদাহরণ। তাঁর টেলিফোন ইনডেক্সটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। বড় ডায়রী ব্যবহার না করে ছোট নোট বই আকারের ডাইরী ব্যবহার করতেন। তাঁর রুমে কখনো এসি লাগাননি। সব সময় নতুন খাম ব্যবহার না করে সময় সুযোগমত পুরাতন খাম ব্যবহার করতেন। ভালো মানের ব্যবহৃত খামগুলো সংরক্ষণ করতেন। তাঁর পাঠানো নোটগুলো হতো সংক্ষিপ্ত ও ছোট কাগজে। কিন্তু বিষয়বস্তু বুঝতে অসুবিধা হতো না। হাসিটাও যেন মেপে মেপে হাসতেন।

তিনি ছিলেন নীরব সমাজ কর্মী :

তাঁর সেবামূলক কাজসমূহ চলতো এত নিবৃত্তে যে, তার এ কাজের পরিধি সম্পর্কে অতি কাছের লোকদেরও ধারণা ছিলো না। বিধবা, দুঃস্থ পরিবারসমূহের সাহায্য সহযোগিতা, গরীব ছাত্রদের লিখা পড়ার ব্যবস্থা, কণ্যা দায়গ্রস্থদের বিবাহ ও পূণর্বাসন ইত্যাদি বিষয়ে সংগঠনের বাহিরে তাঁর বিরাট কর্ম পরিধি ছিলো। এ ব্যাপারে সকল পরিচিত জনেরা তাকে আর্থিক সহযোগিতা যোগাতো। নিজেও তিনি বিভিন্ন জনকে টেলিফোন করতেন। দেশের বাহিরের পরিচিত জনেরাও তাঁকে সহযোগিতা করতেন। সমাজ সেবার এ কাজটিতে নেহায়েত প্রয়োজন না হলে অন্য কাউকে জড়াতেন না। জানাতেন না। পরিবর্তিত পরিস্থিতে এ কাজ পূর্বের মত চালু রাখতে পারেন নি।

২০-২৫ বছরের কয়েকজন যুবক তাঁর কাছে আসতো পোশাক আশাকে বুঝা যেত তারা সাধারণ পরিবারের ছেলে। এদের মধ্যে একটা ছেলে প্রতি মাসে আসতো। অন্যেরা মাঝে মধ্যে। আলোচনাক্রমে জানা গেলো যে একজনকে প্রতিমাসে, অন্যদের মাঝে মধ্যে পড়ালিখা বাবদ সাহায্য করা হয়।

একবার আমার কাছে কিছু টাকা ও একটা নোট পাঠান যে নতুন বিয়ের উপযোগী পাঁচটা শাড়ী কিনে নির্দিষ্ট সময়ে ঠিকানামত পৌছাতে হবে। আমি সে দায়িত্ব পালন করি। এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা হয়নি। আরেকবার আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয় জিলা সংগঠনের মাধ্যমে একজন মহিলার খবর নেয়ার। যোগাযোগ করে জানা যায় মহিলার স্বামী একটি বেসরকারী কলেজে অধ্যাপক ছিলেন তিনি রোড এক্সিডেন্টে মারা যাওয়ায় পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে। পরে পুরানো ঢাকার একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ব্যবস্থা হয় এবং প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বিয়ে করে স্বামীকে নিয়ে সম্ভবত নিজেদের জেলায় চলে যায় মহিলাটি। অফিসের ৬/৭ গ্রেডের একজন স্টাফের ছোট ভাই ছাত্রদের দায়িত্বশীল পর্যায়ের জনশক্তি ছিলো। আর্থিক সমস্যার কারণে তার পড়ালিখা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়। মকবুল সাহেব চাকুরী করে ফেরত দেয়ার শর্তে একটা বিশেষ ফান্ড থেকে তার জন্যে বড় অংকের পরিমাণ টাকা কর্জে হাসানা হিসেবে পাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ আছে।

আমানতদারী :

তিনি আমানতদারীর উজ্জল দৃষ্টান্ত ছিলেন। ব্যক্তি জীবন ও দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবনে কারো পক্ষ হতে আমানতদারীর ব্যাপারে অভিযোগ তো দূরের কথা

সামান্য প্রশ্ন তোলারও সাহস হয়নি। তাঁর এ আমানতদারীর বিষয়টি শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি আমানতদারীর শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। মরহুম মাষ্টার সফিক উল্লাহ ভাইয়ের মুখে শুনেছি, চট্টগ্রাম বিভাগের দায়িত্ব পালনের সময় হাতে সেলাই করা ছোট একটা কাপড়ের থলে সাথে নিয়ে ঢাকায় আসতেন তিনি আর ভিতরে হিসাবের খাতা, টাকা থাকত, যেখানে খুচরা এক, দু'টাকার নোটের সাথে খুচরা পয়সাও থাকত। নিজের টাকা পয়সার সাথে কখনো বায়তুলমালের টাকা পয়সা মিলাতেন না। বর্তমান সময়ের মত বায়তুলমালের আলাদা বিভাগ ও পদ্ধতি তখন চালু করা সম্ভব ছিলোনা। কিন্তু নিজস্ব সতর্কতার কারণে হিসাব নিয়ে কখনো তাঁকে প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হয়নি। মগবাজারেও তার টেবিলের ড্রয়ারে খাত ভিত্তিক আলাদা আলাদা খাম থাকতো। এক খাতের টাকা অন্য খাতের সাথে কখনো মিশাতেন না।

অফিসের গাড়ী ব্যবহারের ব্যাপারেও তিনি খুবই সতর্ক ছিলেন। গাড়ী ব্যবহারে নীতিমালা সব সময় মেনে চলতেন। তাঁর নামে বরাদ্ধকৃত সংগঠনের গাড়ীটিকে কখনো মালিকানাধীন গাড়ীর মতো ব্যবহার করতেন না। গাড়ীতে করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনা নেয়াকে তিনি অনুমোদন করতেন না। ছোট ছেলে ও ছোট মেয়েকেও নিজস্ব দায়িত্বে আসা যাওয়া করেই লিখা পড়া করতে হয়েছে। সংগঠনের প্রতিটি জিনিসের প্রতি তিনি যত্নবান ছিলেন। সব সময় সচেতন দায়িত্বানুভূতি তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো। কারো আমানতদারীর দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতেন না। এমারতের শেষ দিকে তাকে একটি বিষয়ে বুঝাতে বর্তমান আমীরে জামায়াত ও আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। বিষয়টা শেষ পর্যন্ত তাঁর দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো দায়িত্বশীলদের সর্বাবস্থায় নৈতিকতা ও আমানতের ব্যাপারে রুখসতের পথ পরিহার করে আজমতের পথেই চলা উচিত। যেন কারো মধ্যে কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন সৃষ্টি না হয়।

লিখার পরিসর না বাড়িয়ে আর একটি শিক্ষণীয় ঘটনার উল্লেখের মাধ্যমে লিখার ইতি টানছি। ঘটনাটি ছিলো এ রকম- আল-ফালাহ বিল্ডিং এর চার তলায় জিলা আমীর সম্মেলন ও শূরার অধিবেশন চলতো। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও ওখানেই হতো। জিলা আমীর ও শূরা সদস্যগণের মধ্য হতে কেউ কেউ সম্মেলনে আসার সময় ছোট বাচ্চাদের সাথে নিয়ে আসতেন। এমনি এক সম্মেলনে এক ভাই তার ৭/৮ বছরের বাচ্চাকে সাথে নিয়ে আসেন। নামায ও খাওয়ার পর সকলে বিশ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এমনি সময় বাচ্চাটি বমি করে তাদেরসহ ও আশে পাশের আরো তিন চার জনের বিছানাপত্র নষ্ট করে ফেলে। ঘটনাক্রমে ছেলেটির পিতা কোন প্রয়োজনে বাহিরে ছিলেন। আশ পাশের ভাইয়েরা বাচ্চাটিকে সামলে নেয় এবং বমি পরিষ্কারের জন্যে

তার পিতার অপেক্ষায় থাকে। অবশ্য বমি খুব বেশী দূর্গন্ধযুক্ত ছিলো। এমনি অবস্থায় মকবুল সাহেব সেখানে পৌছান, সব জেনে চলে যান। কিছুক্ষণ পর পানিসহ বালতি, নেকড়া ও গামছা নিয়ে ফিরে আসেন। কাউকেও কিছু না বলে মুখে নাকে গামছা বেধে আশাপাশসহ পুরো এলাকা পরিষ্কার করা শুরু করেন। তাঁর কাজ দেখে কেউ কেউ এগিয়ে আসার চেষ্টা করলে সবাইকে বারণ করে নিজে একাই সবকিছু পরিষ্কার করে এমনভাবে স্থান ত্যাগ করেন, যেন এটা অতি স্বাভাবিক একটা বিষয় ছিলো। পরবর্তী পর্যায়েও এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে শুনা যায়নি। অথচ ইচ্ছা করলে অভ্যর্থনারুমে অবস্থানরত ক্লিনার বা পিয়নদের দ্বারা কাজটি তিনি করাতে পারতেন। এই ছিলো তাঁর বিশেষত্ব। তাঁর বিদায়ে ব্যক্তিগতভাবে আমি দরদী মনের অবিভাবককে হারিয়েছি।

আল্লাহ তার বিশেষত্বপূর্ণ বান্দাটির মানবীয় দূর্বলতাসমূহ মাফ করে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকামে স্থান দিন, আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন৷৷

ঢাকা, ৭/৭/২১ইং।

লেখক- কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ।

বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্যে ইসলামের বিজয় অনিবার্য

ইসলামই হচ্ছে আগামী সভ্যতার ধর্ম। একে নজীরবিহিন ভূমিকা পালনের জন্য সে আহূত হবে। কেননা, ইসলামের শত্রুরা স্বীকার করুক আর নাই করুক এ ভূমিকা অপর কোন ধর্ম বা মতবাদ দ্বারা পালিত হতে পারে না। আমরা বিশ্বাস করি, গোটা মানবজাতি আর অধিককাল এ ধর্মকে এড়িয়ে থাকতে পারবে না। আত্মরক্ষার গরজে তাগিদেই মানুষ একে গ্রহণ করবে।

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

[লেখক : বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সম্পাদক, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক সিনিয়র সেক্রেটারী জেনারেল, ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি। ১৯৯১ সালে সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের প্রেক্ষাপটে তিনি "বিশ্বপরিস্থিতি ও ইসলামী আন্দোলন" নামে একটি বই লিখেন। কামারুজ্জামান ভাই পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও মানবরচিত মতবাদের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে ইসলামের অনিবার্য উত্থানের পক্ষে যে মত ব্যক্ত করেছেন সিকি শতাব্দীর পর তা আরো দেদীপ্যমান। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সকল কুফরী ও তাগুতী শক্তি ইসলামী রেনেসাঁর ভয়ে কম্পমান। আগামী দিনে তাদের সে কাঁপুনি বাড়বে বৈ কমবে না। একটি অনিবার্য বিপ্লবের ঝাঁকুনি দেয়ার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে শক্তভাবে ও দুর্বার গতিতে। মহান আল্লাহ মরহুম কামারুজ্জামান ভাইয়ের আত্মত্যাগ কবুল করুন। তাকে জান্নাতে মাকামে আ'লা নসিব করুন। আমীন।]

এই পতন এত দ্রুত হবে অনেকে কল্পনা করেননি

প্রখ্যাত সোভিয়েত ঔপন্যাসিক আলেকজান্ডার সোলঝেনেৎসিন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্প্রতিক পরিবর্তন ও ঘটনাবলী সম্পর্কে বলেছেন, "এ সম্পর্কে আমি অনেক আগেই বলেছিলাম। কিন্তু তা এত দ্রুত গতিতে হবে আমি কল্পনা করতে পারিনি।" তাঁর একথা অনেকেরই কথা। কেননা কমিউনিউজমের

লৌহ যবনিকার পতন এত দ্রুত ঘটবে একথা কেউই সম্ভবত ভাবতে পারেননি। সেখানকার ঘটনাবলী এত দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে যা নিয়ে মন্তব্য করাও কঠিন। তবে একথা এখন নিশ্চিত বলা যায়, "আদর্শ হিসেবে কমিউনিজম ব্যর্থ হয়েছে।" এবিসি টেলিভিশনের সাথে প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গরবাচেভ বলেছেন, " সোভিয়েত ইউনিয়নে যে কমিউনিজম চালু করা হয়েছে তা দীর্ঘ ৭৪ বছর পর ব্যর্থ হয়েছে এবং তা সারা বিশ্বের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।" ৬ই সেপ্টেম্বর '৯১ আমেরিকান টেলিভিশন নেটওয়ার্ক এবিসিকে দেয়া সাক্ষাতকারে একই সময়ে রুশ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলেতসিন বলেছেন, "কমিউনিজম সোভিয়েত জনগণের জন্য কেবল দু:খ বয়ে এনেছে।"

কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জনতার রোষ

১৯৮৯ সালে পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিত্যাগের পর সোভিয়েত ইউনিয়নেও সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাংগন ও বিপর্যয় ঘটে। আদর্শ হিসেবে মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ পরিত্যাগ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী থেকে এগুলো বাদ দেয়া হয়। মি: গরবাচেভ তাঁর 'পেরেস্ত্রইকা' ও 'গ্লাসনস্টের' মাধ্যমে কয়েক বছর আগে থেকেই যে সংস্কার ও নতুন ভাবনার কথা বলেন এক পর্যায়ে তাই নিয়ে আসে সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজম চূড়ান্তভাবে ধরাশায়ী হয়ে পড়েছে এখন। কমিউনিস্ট পার্টি, কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি ও সাবেক সেনাপ্রধান সম্মিলিতভাবে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে কমিউনিজমের শেষ রক্ষা করতে গিয়ে যেন কমিউনিজমের পতনকেই ত্বরান্বিত করেছে। ইতিমধ্যেই ব্যর্থ-অভ্যুত্থানের নায়করা গ্রেফতার হয়েছেন, কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতা নিষিদ্ধ হয়েছে। লেনিনের মূর্তি উপড়ে ফেলা হয়েছে। সর্বহারার একনায়কত্ব তথা লেনিনের প্রলেতারিয়ার একনায়কত্বের নামে কমিউনিস্ট পার্টির যে নিকৃষ্ট একনায়কত্ব সোভিয়েত জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে জনমনে কেমন তীব্র অসন্তোষ ও রোষ জন্মেছিল, বাইরে থেকে তা কল্পনা করাও কঠিন।

সোভিয়েত জনগণের হাতেই মৃত্যুই হলো কমিউনিজমের

মিথ্যা মোহ ও ছলনা দিয়ে কমিউনিস্টরা পৌণে এক শতাব্দী যাবত সোভিয়েত জনগণকে বন্দী করে রেখেছিল এক অমানবিক জিন্দানখানায়। সুযোগ পেয়ে জনগণ তার প্রতিশোধ নিয়েছে। বাহ্যিক বিবেচনায় গরবাচেভ-ইয়েলতসিনের হাতে কমিউনিস্ট পার্টি বা সোভিয়েত বিপ্লবের মৃত্যু ঘটলেও মূলত এই কৃতিত্ব সোভিয়েত জনগণের। অর্থাৎ খোদ সোভিয়েত জনগণের হাতেই মৃত্যু ঘটলো কমিউনিজমের বা কমিউনিস্ট পার্টির। জনতার ক্ষোভ ও

রুদ্ররোষ কতটা তীব্র তা অনেক ঘটনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। "বিপ্লবের মহানায়ক ইয়াকভ সভেদলবের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার সময় জনতা তাকে চিহ্নিত করেছে জারের খুনী হিসেবে।" দেড় কোটির বেশী সদস্যের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে আরেকটি মন্তব্য : "সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি পাল্টাবে না। তার শেষ আর একমাত্র পরিবর্তন হবে জনগণের কাছে মাফ চেয়ে, নিজেকে ভেঙ্গে দিয়ে রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে লুপ্ত হবে।" -এ মন্তব্য করেছেন গরবাচেভ-এর একজন উপদেষ্টা মিঃ স্তনিস্লাভ সাতালিন (কমসোমলস্কায়া প্রাভদা)।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি জনগণের ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে একের পর এক নেতার পার্টি থেকে পদত্যাগের ঘটনায়। প্রথমে বাল্টিক প্রজাতন্ত্রের নেতারা পদত্যাগ করলেন। তারপর মোলদাভিয়ার প্রেসিডেন্ট, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট, কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট নূর সুলতান জনরবায়েভ, উজবেক প্রেসিডেন্ট, রুশ পেসিডেন্ট বরিস ইয়েলতসিনের পর সবশেষে মিখাইল গরবাচেভ পার্টি থেকে পদত্যাগ করলেন।

ভিলিনিয়াস, রিগা, তাল্লিন ও ক্লাইপেদা থেকে নামিয়ে ফেলা হয়েছে লেনিনের মূর্তি। মস্কো ও লেনিনগ্রাডে পার্টি অফিসে হয়েছে গণহামলা। ক্রেমলিন থেকে লাল পতাকা নামিয়ে দিয়েছে জনগণ। সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টি যে জমিদারী রাজত্ব কায়েম করেছিল তা খতম হয়ে গেছে। পার্টির সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সারা সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি এসে দাঁড়িয়েছে শেষ অবস্থায়। কিছু কট্টরপন্থী আন্ডারগ্রাউন্ডে যাবার চিন্তা করছে। কেউ নাম বদলানোর কথা বলছে। এখন স্মৃতিসৌধ থেকে লেনিনের মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সোভিয়েত যুবকরা আংকল লেনিনকে বিদায় দিবেন দ্রুতগতিতে।

কমিউনিজমের সৃষ্ট বিভ্রান্তি থাকবে অনেকদিন পর্যন্ত

"খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে সবকিছু। এমন অবিশ্বাস্য গতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক পরিবর্তন হতে চলেছে, তার সাথে চিন্তা ও সম্ভাবনা তাল রাখতে পারছে না। পরিবর্তন হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের মানচিত্রের, দেশের ও মনের।" (সন্তোষ গুপ্ত, বাংলার বাণী ২৬.৮.৯১)

এই দ্রুত বদলে যাওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘটনাবলীকে সোভিয়েতের বৃহত্তর জনগণ সহজে ও স্বাভাবিকভাবে মেনে নিলেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা এখনও মার্ক্স-লেনিন তথা কমিউনিজমকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাচ্ছে। কমিউনিজমের মায়াজালের বিভ্রান্তি থেকে পিতৃভূমির

সন্তানগণ বের হয়ে আসলেও উপমহাদেশের কমিউনিস্টরা তা স্বীকার করতে রাজী নয়। আমাদের রাজধানী ঢাকার রাজপথে তো কতিপয় কমিউনিস্ট মার্ক্স-লেনিন-মাও সেতুং এর ছবি নিয়ে এক হাস্যকর মিছিলের আয়োজন করে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজে যেখানে কমিউনিজম ত্যাগ করে পালাচ্ছে, তখনও আমাদের দেশের কমিউনিস্টদের বোধোদয় হয়নি। কমিউনিজম রক্ষার শপথে তাদের আন্তরিকতা কতটুকু জানি না। তবে তাদের এসব আচরণ যে বিভ্রান্তির ফসল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কমিউনিজম বিশ্বব্যাপী মানবজাতীকে যে বিভ্রান্তি ও বিকৃতি উপহার দিয়েছে তা কমিউনিজমের মৃত্যুর পরও অনেক দিন পর্যন্ত অবশেষ থাকবে।

পুঁজিবাদের নিপীড়ন ও শোষণ থেকে উদ্ধার করে কমিউনিজম সাম্যের যে চটকদার শ্লোগানের আবরণে মানবতাকে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের কবলে বন্দী করেছিল সেজন্য মানবজাতিকে কড়া মূল্য দিতে হয়েছে। কমিউনিজম স্বর্গ নির্মাণের জন্য কোটি কোটি মানুষকে হত্যা, গুম, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ও দীর্ঘ কারাবন্দীর নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। মানুষের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সাহিত্য, শিল্পকলা, সুকুমার বৃত্তির গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। মানবতাবিরোধী শ্রেণীশত্রু খতমের তত্ত্ব প্রচার করে মানুষকে নিষ্ঠুরতা ও প্রতিহিংসার পথে ঠেলে দেয়া হয়েছে। মানুষের দুশমন, ডাকাত ও খুনীদেরকে জাতীয় বীর আখ্যা দিয়ে মানবিক মূল্যবোধের অবমাননা করা হয়েছে। মানুষের স্বাভাবিক, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক সহমর্মিতা ধ্বংস করে মানুষকে পেট সর্বস্ব জীবে পরিণত করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে মানবিক বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। মানুষের সহজাত ধর্মের প্রতি আকাংখা, মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের আবেগ ও ভালবাসাকে খতম করে দিয়ে মানবসভ্যতার ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছে কমিউনিজম। পশ্চিমা পুঁজিবাদ যেমন মানবতার রক্ত শোষণের অপরাধে অপরাধী, তেমনি কমিউনিজম অপরাধী, তার মিথ্যা প্রপাগান্ডা ও মানবতাকে বিভ্রান্তি উপহার দেওয়ার জন্য।

কমিউনিজম বেঁচে ছিল প্রপাগান্ডার বদৌলতে

পৌণে এক শতাব্দী কাল পর্যন্ত কমিউনিজম টিকেছিল তার মিথ্যা প্রপাগান্ডার অসাধারণ কৌশল অবলম্বন করে। মি. মিখাইল গরবাচেভ তাঁর "পেরেস্ত্রইকা ও নতুন ভাবনা" নামক বিশ্বময় সাড়া জাগানো গ্রন্থে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে কমিউনিজম যে বন্ধ্যাত্ব নিয়ে এসেছিল এবং তা কিভাবে প্রপাগান্ডার মাধ্যমে ঢেকে রাখা হয় তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

"দেশ তার কাজের গতি হারাতে শুরু করেছিল। অর্থনৈতিক ব্যর্থতা দেখা দিচ্ছিল প্রায়শই। নানা সমস্যা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল ও পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছিল এবং অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর সংখ্যা বেড়েই চলছিলো। সামাজিক জীবনের অচলাবস্থা ও আরো অন্যান্য উপদ্রব সমাজ জীবনে দেখা দিতে লাগল। আর্থ-সামাজিক বিকাশ ব্যাহত হয় এ রকম একটি লাগাম তৈরী হয়েছিল। আর এসব কিছুই ঘটলো যখন কিনা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব আর্থ-সামাজিক প্রগতির নতুন সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কিছু অদ্ভুত ছবি ফুটে বার হচ্ছিল: একটা শক্তিশালী যন্ত্রের বিশাল চাকা ঘুরছিল, যখন হয় তার প্রেরক যন্ত্রটি হড়কে যাচ্ছিল নয়ত তার বেল্টগুলি ছিল ঢিলে।"

"দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আমরা প্রথম বুঝতে পারলাম অর্থনৈতিক উন্নতির হার ম্লান হয়ে এসেছে। তাছাড়া, উৎপাদনের দক্ষতায়, উৎপন্নের মানে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা সৃষ্টিতে এবং উন্নত কারিগরি কৌশলের ব্যবহারে ব্যবধান ক্রমশ বাড়তেই লাগল এবং মোটেই তা আমাদের অনুকূলে নয়।"

পৃথিবীর সবচাইতে বড় ভূ-খন্ডের মালিক সোভিয়েত ইউনিয়ন। আয়তন ৮৬ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫শ' ৯৬ বর্গমাইল। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। অথচ মিখাইল গরবাচেভ উল্লেখ করেছেন: "অর্থনীতি ক্রমশই ব্যাপকভাবে সংকুচিত হচ্ছিল। অর্থনৈতিক বিকাশের পড়তি হার এবং অচলাবস্থা সোভিয়েত সমাজ জীবনের অন্য দিকগুলোকেও প্রভাবিত করছিল। একটা অবিশ্বাস্য পরিস্থিতি গড়ে উঠছিল। ইস্পাত, কাঁচামাল, জ্বালানী ও শক্তি উৎপাদনে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নেই এইসব জিনিসের ঘাটতি দেখা যাচ্ছিল অপচয় কিংবা অনিপুণ ব্যবহারের কারণে। খাদ্যশস্যের অন্যতম প্রধান উৎপাদক হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টন শস্য কিনে আনতে হচ্ছে। প্রতি হাজার লোকের জন্য আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক চিকিৎসক ও হাসপাতালের শয্যা অথচ স্বাস্থ্য বিভাগের ক্রটি-বিচ্যুতি ও দুরবস্থা অবর্ণনীয়। আমাদের রকেট খুঁজে বের করতে পারে হ্যালির ফমেট, আর উড়ে যেতে পারে বিস্ময়কর নির্ভুলতার সঙ্গে শুক্র গ্রহের পথে। কিন্তু এরই পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বগুলোকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব সুস্পষ্ট।

দুর্ভাগ্যবশত এখানেই শেষ নয়। আমাদের জনগণের মতাদর্শগত নৈতিক মূল্যবোধ ক্রমশ ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতিকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আগ্রহের অভাব দেখা দিয়েছিল। জীবনযাত্রার মান কমে আসছিলো এবং খাদ্য সরবরাহে অসুবিধা ঘটছিল। বিঘ্ন দেখা

দিয়েছিল গৃহনির্মাণ ও ভোগ্যপণ্য সরবরাহে। মতাদর্শগত স্তরেও সমসাময়িক সমস্যাগুলির গঠনমূলক বিশ্লেষণের প্রচেষ্টায় এবং নতুন ভাবধারার ক্ষেত্রে আরও বেশী বাধা ছিল, লাগাম ছিল। সাফল্যের প্রচার- বাস্তব বা কাল্পনিক সাফল্য ক্রমশ প্রাধান্য পাচ্ছিলো। স্তুতি ও চাটুকারিতাকেই উৎসাহ দেওয়া হচ্ছিল, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের ও জনগণের প্রয়োজন ও মতামত উপেক্ষিত হচ্ছিল। সমাজবিজ্ঞানের পন্ডিতি তাত্ত্বিকতা উৎসাহ পেয়ে বাড়-বাড়ন্ত হচ্ছিল, অথচ সৃজনশীল চিন্তাকে সমাজবিজ্ঞানের আঙ্গিনা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়েছিল, আর ফালতু এবং চটকদারি মূল্যায়ন ও মতামতগুলিকেই ঘোষণা করা হয়েছিল অবিসংবাদী সত্য বলে। চিন্তার বিকাশে ও সৃজন প্রচেষ্টায় অপরিহার্য বৈজ্ঞানিক, তাত্ত্বিক ও অন্যান্য আলোচনাগুলোকে ছেঁটে ফেলা হয়েছিল। এ ধরনের নেতিমূলক প্রবণতাই সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা, এমনকি শিক্ষা প্রক্রিয়ায় এবং চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছিল, যেখানে মাঝারি মাপের চিল্লানেওয়ালারাও প্রসাদ লাভ করেছে।

সমস্যা রহিত বাস্তবতার উপস্থাপনার ফল হয়েছে বিপরীত; কথা ও কাজের ফারাক গড়ে উঠেছে যা জনগণকে করেছে উদাসীন ও ঘোষিত শ্লোগানে অবিশ্বাসী। এটা খুবই স্বাভাবিক যে এই পরিস্থিতিতে বিশ্বাসহীনতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। মঞ্চ থেকে যাই ঘোষিত হয়েছে, ছাপা হয়েছে কাগজে ও পুঁথিপত্রে তাতেই প্রশ্ন উঠেছে। জনমানসের নৈতিকতায় শুরু হয়েছে অবক্ষয়; মদ্যপান, ড্রাগ-আসক্তি এবং অপরাধ বেড়ে চলেছে এবং আমাদের স্বধর্মবিরোধী বাজারী সংস্কৃতির একঘেয়ে ঢংয়ের অনুপ্রবেশ বয়ে এনেছে নিম্নরুচি, অশালীনতা, আর এভাবেই বেড়েছে মতাদর্শগত বন্ধ্যাত্ব।

"জনগণের জন্য আন্তরিক আগ্রহ, তাদের জীবনযাত্রা ও কাজের মান, অনুকূল সামাজিক পরিবেশের ভাবনার জায়গায় প্রায়ই স্থান করে নিত অন্ত:সারশূন্য রাজনৈতিক ভড়ং ও অঢেলভাবে পুরস্কার, খেতাব ও বোনাস বিতরণ। 'সবকিছুই চলে যায়' গোছের একটি মনোভাব গড়ে উঠেছিল; শৃংখলা ও দায়িত্ববোধের মান ক্রমশ নেমে যাচ্ছিল। আর এ সবকিছুই ঢাকার চেষ্টা হচ্ছিল জমকালো প্রচার ও হরেক রকম বার্ষিকী উদযাপনের মধ্য দিয়ে- স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় দুই স্তরেই।" (পৃষ্ঠা ১০, পেরেস্ত্রইকা ও নতুন ভাবনা : মিখাইল গরবাচেভ)

সোভিয়েত প্রপাগান্ডার যে দাপট কমবেশী আমরাও তা উপলব্ধি করেছি। বাংলা ভাষায় ওরা অনেক 'প্রপাগান্ডা মেটারিয়েলস' ছড়িয়েছে। সোভিয়েত প্রপাগান্ডা মেটারিয়েলস কথাটা আমার নিজের নয়। বাংলাদেশস্থ সাবেক সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মিঃ স্মিরনভ কথাটা বলেছিলেন। আমাদের সাথে একবার

একগাদা সোভিয়েত বই-পুস্তক এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "দিজ আর সোভিয়েত প্রাপাগান্ডা মেটারিয়েলস।" একথা বলে তিনি বেশ হাসলেন। কৌতুক করে বলেছিলাম, সত্যিই প্রপাগান্ডা মেটারিয়েলস। যা হোক, বিনা পয়সায় বা নামমাত্র পয়সায় এত বই-পুস্তক ও প্রচারপত্র সম্ভবত: আর কেউ ছড়ায়নি। তাই একথা বলা বোধ হয় বাহুল্য হবে না যে, সোভিয়েত সাম্রাজ্য এতদিন টিকে ছিল শক্তিশালী প্রপাগান্ডা মেশিনারীর বদৌলতে।

কমিউনিজম থেকে পুঁজিবাদ আশ্রয় গ্রহণ সমস্যার সমাধান নয়

সচেতন ব্যক্তি মাত্রই এ বিষয়ে অবহিত যে, আজকের সোভিয়েত ইউনিয়নে সংস্কারের সূচনা কোসিগিনের সময় থেকেই হয়েছিল। কট্টরপন্থীদের কারণে কোসিগিন শেষ পর্যন্ত টিকতে পারেনি। যা কোসিগিনের পক্ষে সম্ভব হয়নি গরবাচেভ ইয়েলতসিন তাই সম্ভব করলেন। সোভিয়েত জনগণ তাদের সাথে ছিল বলেই তারা এ পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছেন। ১৪জন পূর্ণ সদস্য ও ৮ জন প্রার্থী সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত পলিটব্যুরোতে ১৯৮৫ সালে গরবাচেভ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ এবং তিনিই দায়িত্ব গ্রহণ করে ইতিহাসের এই যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করলেন।

সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের এই পতনে পাশ্চাত্য স্বাভাবিকভাবেই উল্লসিত। তাদের মতে গণতন্ত্রহীনতা ও স্বাধীনতাহীনতাই সোভিয়েত জনগণ তথা মানুষের মূল সমস্যা। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ ব্যবস্থা চালু হলেই যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের মতে বিশ্ব ইতিহাস একথা প্রমাণ করে না যে, পাশ্চাত্যের তথাকথিত গণতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানব সমস্যা সমাধানে নির্ভেজাল বা মানবতার মুক্তির নিশ্চিত পথ। একথা ঠিক যে, কমিউনিজমের মৃত্যু হয়েছে এবং কমিউনিজম এখন জাদুঘরে রাখার বস্তু। ১৯৮৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারী মি: গরবাচেভকে লেখা এক ঐতিহাসিক পত্রে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনী আরও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন: "আপনার দৃষ্টি যদি আরও একটু প্রসারিত করেন, তবে উপলব্ধি করবেন যে, প্রাথমিকভাবে যে জিনিসটি আপনাদের নিশ্চিত সফলতা দিতে পারে তা হচ্ছে, আপনার পূর্বসূরীদের নীতির ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করা। সে নীতির ভিত্তি খোদা ও ধর্ম থেকে দূরে সরে যাওয়া; সেটা যেটা সোভিয়েত ইউনিয়নের জনতার জন্য নি:সন্দেহে মারাত্মক ও কঠিনতম আঘাত হেনেছে এবং আপনাদের অবশ্যই অবগত হতে হবে যে, এ জিনিসটির অবর্তমানে বিশ্বের বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

অবশ্যই এটা সম্ভব যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাবেক ক্ষমতাবান সমাজবাদী

সব ব্যক্তিত্বের ভুল পদ্ধতি ও কর্মকান্ড পশ্চিমা জগতের প্রতি প্রলোভন জাগাবে। কিন্তু সত্য নিহিত রয়েছে অন্যত্র। আপনি যদি বর্তমান সন্ধিক্ষণে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদের কেন্দ্রকে স্বর্গ জ্ঞান করে সেখানে আশ্রয় নেয়ার মাধ্যমে শুধুমাত্র সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী অর্থনীতির অন্ধ গিটগুলোকে মুক্ত করতে অভিলাষ রাখেন, তবে আপনি সমাজের কোন রোগই উপশম করতে সক্ষম হবেন না। কারণ মার্ক্সবাদ এবং মার্ক্সবাদভিত্তিক অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়া অবক্ষয়ের শেষ পর্যায়ে এসে পৌছেছে। পশ্চিমা জগতও একইভাবে অবক্ষয়ের এ প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়েছে, অবশ্য ভিন্নপথে অন্যান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে।"

"জনাব গরবাচেভ সবাইকে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। ব্যক্তি মালিকানা, অর্থনৈতিক সমস্যা ও স্বাধীনতাহীনতা আপনাদের প্রধান সমস্যা নয়। বরং আপনাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে সত্যিকারের খোদা-বিশ্বাসের অনুপস্থিতি। সেটা তো এমন এক সমস্যা যা পাশ্চাত্যকে নোংরামি ও অচলাবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সে অবস্থা বিরাজ করবে। সকল সত্ত্বা ও সৃষ্টির উৎস যে খোদা তাঁর বিরুদ্ধে দীর্ঘ ও অর্থহীন সংগ্রামই আপনাদের প্রধান সমস্যা।"

"জনাব গরবাচেভ এটা আজ সবার নিকট স্পষ্ট যে, এখন থেকে সমাজবাদ বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের জাদুঘরগুলোতে তালাবদ্ধ হয়ে থাকবে। কেননা মানব সন্তানদের সত্যিকারের প্রয়োজনের ব্যাপারে কোন উত্তর মার্ক্সবাদে নেই। কারণ এটি একটি বস্তুবাদী মতবাদ এবং বস্তুবাদ দ্বারা বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতাবাদের অনুপস্থিতির সমস্যা থেকে মানবজাতি মুক্তি পেতে পারে না। অথচ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানব সমাজের ত্রুটিই মৌলিক সমস্যা।"

"কমিউনিজম নামক বিশ্বে আজ আর আমাদের জন্য কিছুই নেই। কিন্তু গুরুত্বসহকারে আমি বলতে চাই যে, মার্ক্সবাদী কুহেলিকার প্রাচীর ভাংতে গিয়ে পাশ্চাত্যের বড় শয়তানের জিন্দানখানায় ধরা দিবেন না।"

মানব রচিত মতবাদসমূহের ব্যর্থতা

মানুষের তৈরী মতবাদের এই ব্যর্থতা সম্পর্কে ইমাম খোমেনীর এই মূল্যায়নের প্রায় ৪৬ বছর আগে বিশ্বনন্দিত ইসলামী চিন্তানায়ক মাওলানা মওদূদী (রহ.) লিখেছেন, "সমস্ত আলামত একথা ঘোষণা করছে যে, মানুষের ইতিহাস দ্রুত সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে। মানুষের গড়া সমস্ত মতবাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং ভীষণভাবে ব্যর্থও হয়েছে। বর্তমানে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষের ইসলামের দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।" (ইসলামী

রেনেসাঁ আন্দোলন/ তাজদীদে এহইয়ায়ে দীন : মাওলানা মওদূদী। ১৯৪৩ সালে প্রথম প্রকাশ)

মাওলানা মওদূদী (রহ.) "ইসলাম আওর জাদীদ মায়াশী নযরিয়াত" (ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ) নামক গ্রন্থে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অন্ত:সারশূন্যতা সম্পর্কে গভীর ও সূক্ষ্ম আলোচনা করেন। ১৯৬১ সালে প্রথম প্রকাশিত এই গ্রন্থে তিনি অকাট্য যুক্তি-প্রমাণসহ একথা তুলে ধরেন যে, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র প্রভৃতি আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদসমূহ নয় বরং মানুষের প্রকৃত অর্থনৈতিক সমস্যার সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান একমাত্র ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তিতেই সম্ভব।

রাশিয়ার ভিন্ন মতাবলম্বীদের রক্তের উপর দিয়ে যে ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী লিখেছেন, বাহ্যত একে 'মজুরদের ডিক্টেটরশিপ' বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা শ্রমিক-মজুরদের উপর চাপিয়ে দেওয়া কমিউনিস্ট পার্টির ডিক্টেটরশিপ। আর এই ডিক্টেটরী শাসন কোন হালকা ধরনের শাসন নয়। সরকার একক ও লা-শরীক জমিদাররূপে দেশের সমগ্র জমির একচ্ছত্র মালিক। কারখানা ও ব্যবসার মালিক হিসাবে সেখানে কোন ব্যক্তি নেই। তাদের উৎখাত করে এমন এক পুঁজিদারের উদ্ভব ঘটেছে যার হাতে উৎপাদনের সকল উপায়-উপাদান। সেই সঙ্গে সমগ্র দেশের রাষ্ট্রশক্তিও তার একনায়কত্বে কেন্দ্রীভূত। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বাস্তব রূপ এটাই।"

রাশিয়াকে কমিউনিস্টরা কি করুণ এক জিন্দানখানায় পরিণত করেছে মাওলানা মওদূদী উল্লিখিত গ্রন্থে তার চিত্র তুলে ধরেছেন। "কোন কর্মী যখন রাত্রিবেলা নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করে না, তখন তার স্ত্রী স্বাভাবিকভাবেই বুঝে নেয় যে, সে গ্রেফতার হয়েছে। পরে তার (স্বামীর) ব্যবহার্য জিনিসগুলো পুলিশ নিজে অফিসে পৌছে দেয় এবং এই দ্রব্যাদি গ্রহণ করার অর্থ এই হয় যে, সে যা ধারণা করেছিল, তাই ঠিক। সে কিছু জিজ্ঞাসা করলে অবশ্য অফিসের তরফ থেকে তাকে কোন উত্তরই দেয়া হয় না। কোন কোন দিন এমনও হয় যে, তার প্রেরিত দ্রব্যাদি ফিরে আসে। আর এরূপ ঘটলেই বুঝতে হবে যে, তার স্বামী 'মহান লেনিনের' জন্য উৎগর্গিত হয়ে গিয়েছে।"

কিন্তু এখন কি গোটা মানবজাতির সম্মুখে এইরূপ কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে যে, খাদ্য ও আযাদী- এই দু'টি এক সঙ্গে সে লাভ করতে পারে না? সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই জেলখানায় পরিণত করা এবং কয়েকজন কমরেডকে তার 'জেলার' ও দ্বাররক্ষী নিযুক্ত করাই কি বর্তমান সময় খাদ্য লাভের একমাত্র ও সর্বশেষ উপায়?"

পুঁজিবাদের ব্যর্থতা

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করেছেন মাওলানা মওদূদী (রহ.)। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে স্বভাবতই যে স্বার্থপরতা আছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। এই পূর্ণ বিকশিত রূপ এতদূর মারাত্মক হয়ে দেখা দেয় যে, মানব সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি বিধায়ক সমস্ত মানবীয় গুণ-গরিমা তার নিকট ম্লান হয়ে যায়। --- ধন-সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণ ক্রমশ সীমাবদ্ধ হয়ে একটি ভাগ্যবান কিংবা অধিকতর সতর্ক মানবগোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়ে পড়ে এবং সমাজ কার্যত দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি শ্রেণী হয় ভাগ্যবানদের দল- বিপুল ধন-সম্পত্তির মালিক এবং অপরটি হতভাগ্য দরিদ্রের দল, যাদের দুই বেলা ক্ষুন্নিবৃত্তির পরিমাণ খাদ্যও জুটে না। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা যাবতীয় ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে কেবলমাত্র নিজেদের আরাম-আয়েশ ও সুখ-সম্ভোগের জন্য ব্যয় করবে এবং এর পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য জাতির বৃহত্তর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেও কুণ্ঠিত হবে না। আর দরিদ্র হতভাগাদের দল ধন-সম্পদের সকল প্রকার অংশ ও সুযোগ-সুবিধা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হবে।

"এই ধরনের অর্থব্যবস্থা একদিকে সুদখোর, মহাজন, শোষক, কারখানা মালিক ও যালেম জমিদার-জায়গীরদার সৃষ্টি করে। আর অপরদিকে মজুর কৃষকদের এক সর্বহারা বুভুক্ষুদের দল তৈরী করে।" [ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ]

পুঁজিবাদী শোষণ, নিপীড়ন ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ এক সময় অনেক আবেগ ও স্বপ্ন নিয়ে ছুটেছিল কমিউনিজমের পিছনে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কমিউনিজম বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর বিপুল অংশের মধ্যে নতুন এক আশাবাদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। পুঁজিবাদের অবাধ লুণ্ঠনতন্ত্রের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে মানুষ কমিউনিজমের মায়া মরীচিকার পিছনে পড়েছিল। কিন্তু আজ বাস্তবতার কশাঘাতে কমিউনিজমের স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার পর মানুষ তার সমস্যা সমাধানের জন্য কোথায় ফিরে যাবে? আমাদের পরিচিত এ পৃথিবী নামক গ্রহটিতে আর যেসব মানব রচিত মতবাদ আছে যেমন রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ- এসব মতবাদের কোন কোনটি আদিকাল থেকেই চলে আসছে। অতীত কাল থেকে অসংখ্য মতবাদের জন্ম হয়েছে। বর্তমানে মতবাদ হিসেবে যে কয়টির স্থিতি এখনও দেখা যায় তারই উল্লেখ এখানে করা হয়েছে। "এ মতবাদগুলোর কোনটিই মানুষের জীবন সমস্যার সুষ্ঠু ও সার্বিক কোন সমাধানই দিতে পারেনি। বরং দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যাই সৃষ্টি হয়েছে এসব মতবাদের কারণে। এগুলোর এ ব্যর্থতার পর মানবতা হয়তো আশান্বিত

থাকতে পারে যে, এতদপেক্ষাও উন্নত ও কল্যাণকর কোন মতাদর্শ রচিত হবে এবং মানবতার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দিবে। কিন্তু বিগত তিন-চারশ' বছরের জ্ঞানের ইতিহাস একথা প্রমাণ করে যে, কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের পর আর কোন মতাদর্শই মানবসমাজে রচিত হয়নি, উদ্ভাবিত হয়নি। এতে করে একথা জোর দিয়েই বলা যেতে পারে যে, দুনিয়ার আর কোন নতুন মতবাদ আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আদর্শ ও মতবাদের দিক দিয়ে দুনিয়ার মানবতা বন্ধ্যা হয়ে গেছে। বর্তমানের মতবাদ সমূহের তুলনায় উন্নত ও অধিকতর মানবতাবাদী আর কোন মতবাদ রচিত হওয়া বাস্তবিকই সম্ভব নয়।" [বিশ্ব সমস্যা ও ইসলাম : মুহাম্মদ আবদুর রহীম]

পাশ্চাত্যের অনেক মনীষীর দৃষ্টিতে

বিশ্বের মানবরচিত মতবাদসমূহ যে মানুষের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ এই সিদ্ধান্তে শুধুমাত্র মুসলিম মনীষীগণই পৌছেননি। বরং পাশ্চাত্যের অনেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বর্তমান সভ্যতাকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে হলে মানবজাতিকে ধর্ম ও নৈতিকার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া দারকার। শুধু তাই নয়, তাদের অনেকে পাশ্চাত্য মতাদর্শের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং সুস্পষ্টভাবে ইসলামী আদর্শের কথাই জোর দিয়ে বলেছেন। সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য বিশিষ্ট গণিতবিদ আইযার শকরাভিচ লিখেছেন, "আজ সোভিয়েত চরিত্রের যে প্রকাশ ঘটেছে, তা সমাজতান্ত্রিক অভিশাপেরই বাস্তব ফল। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ যেমন মানুষের ব্যক্তি জীবন বিরোধী, তেমনি তা প্রতিটি জাতির শত্রু। আদর্শ তার স্বার্থ হাসিলের জন্য মানুষের আশা-আকাংখা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে সফল। বস্তুত সব মানুষের সব জাতির সর্বনাশ এর মূল প্রবণতা।" [Form under the Ruble]

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্ব বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী মিঃ আন্দ্রে শাখারভ বলেছেন, "আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নে ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে বাস করছি। নিছক অগণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের দৈহিক নিপীড়ন এর মূল কারণ নয়। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ আহত না হলে মানুষ এসবও সয়ে যেতে পারে।-- বর্তমান সোভিয়েত ব্যবস্থা দাবী করে মিথ্যার স্তূপে বিবেকের নিরবচ্ছিন্ন সহাবস্থান। যে মানুষ নিজেকে মানুষ মনে করে, সে আত্মার এই বিনাশ সাধন, এই আধ্যাত্মিক দাসত্বকে স্বীকার করে নিতে পারে না। আমাদের স্বাধীনতার সর্বশেষ অংশ হলো আত্মার স্বাধীনতা। আমরা যদি একে দূর্নীতি ও দুশ্চরিত্রের পদানত হতে দেই, তাহলে আমরা মানুষ বলে গণ্য হবো না।" [As breathing and Contiousness Return.]

পশ্চিমী সভ্যতা যে ব্যর্থ হয়েছে তা পশ্চিমা পন্ডিতগণই বিভিন্নভাবে বলেছেন। মানবাত্মা, মানব সম্পর্ক ও মানব সমাজের ধ্বংস সাধন করে পশ্চিমী সভ্যতা যে বৈষয়িক উন্নতি করেছে, তাও আজ বুমেরাং হয়ে দেখা দিয়েছে। এফ,এম,সি নরথ্রুপ- এর ভাষায়, "আমাদের যে সভ্যতা তার যে অবদান নিয়ে গৌরব করে, তাই আজ তার জন্য ধ্বংসকারী হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হচ্ছে আমরা যতই সভ্য হচ্ছি, সভ্যতাকে ধরে রাখার ব্যাপারে ততই আমরা অক্ষম হয়ে পড়েছি।" [The meeting of East and West]। আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের যে সংকট, এ সংকট শুধু সমাজতন্ত্রের বা কমিউনিজমের সংকট নয়। এ সংকট হচ্ছে মানবরচিত মতবাদসমূহের সংকট। মানবরচিত মতবাদ তার সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার কারণেই এক অনিবার্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন এবং গোটা বিশ্ব মানবতা আজ মানবরচিত মতবাদের বন্দীশালা থেকে বের হয়ে আসতে উদগ্রীব।

মাবতার এ আর্তনাদ শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেই নয়। এ আর্তনাদ আজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে পাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বত্র। মানবরচিত মতবাদসমূহের ব্যর্থতা ও বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে বিশ্ববাসীর জন্য ইসলাম যে আশার সঞ্চার করেছে, বা ইসলামের পথে প্রত্যাবর্তন এবং মানুষ, পৃথিবী ও বিশ্ব জাহানের মহান স্রষ্টার দিকে ফিরে যাওয়ার যে আকাংখা সৃষ্টি হয়েছে, তারই প্রতিধ্বনি আমরা পাই জর্জ বার্নার্ডশ'র উক্তিতে। তিনি বলেছিলেন, "আমি মুহাম্মদ (স) কে অধ্যয়ন করেছি। আমার বিশ্বাস তাঁকে মানবজাতির ত্রাণকর্তা বলাই কর্তব্য। আমি বিশ্বাস করি, যদি তাঁর মত কোন ব্যক্তি আধুনিক জগতের একনায়কত্ব গ্রহণ করতেন তবে তিনি এর সমস্যগুলো এমনভাবে সমাধান করতে পারতেন, যাতে বহু আকাংখিত শান্তি ও সুখ অর্জিত হতো। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, মুহাম্মদের (সাঃ) ধর্ম আগামী দিনে পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করবে।"

আজকের মানুষের জন্য ইসলামের প্রয়োজন

মিশরের বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ মন্তব্য করেছেন : "এতদসত্ত্বেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ভবিষ্যতকাল এ ধর্মের জন্য নির্ধারিত। এ ধর্মীয় ব্যবস্থার সুউচ্চ ও মহান পরিকল্পনা এবং এমন একটা ব্যবস্থার জন্য মানবজাতির স্বাভাবিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইসলামই হচ্ছে আগামী সভ্যতার ধর্ম। এক নজীরবিহিন ভূমিকা পালনের জন্য সে আহূত হবে। কেননা, ইসলামের শত্রুরা স্বীকার করুক আর নাই করুক এ ভূমিকা অপর কোন ধর্ম বা মতবাদ দ্বারা পালিত হতে পারে না।

আমরা বিশ্বাস করি, গোটা মানবজাতি আর অধিককাল এ ধর্মকে এড়িয়ে থাকতে পারবে না। আত্মরক্ষার মহা তাগিদেই মানুষ একে গ্রহণ করবে।"

"আজকের মানুষের জন্য ইসলামে প্রয়োজন রাসূলুল্লাহ (সা:) এর যুগের মানুষের জীবনে ইসলামের প্রয়োজনের মতোই তীব্র। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এমনি এক পরিস্থিতিতে অতীতে যা ঘটেছে আজকে বা আগামীতেও তাই ঘটবে।"

মানবতা নতুন নেতৃত্বের সন্ধানে

শুধু মতবাদসমূহই ব্যর্থ হয়নি বরং বর্তমান বিশ্ব-নেতৃত্বও বিশ্বের কোটি কোটি বনি আদমের সমস্যা সমাধানে নিদারুণভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্ব-মানবতা আজ নতুন পথ ও নতুন নেতৃত্ব উভয়েরই সন্ধানে। সাইয়েদ কুতুব শহীদ এ সম্পর্কে তাঁর Milestone নামক গ্রন্থে বলেছেন, "It is essential for mankind to have a new leadership. The leadership of mankind by western men is now on the decline, not because western culture has become poor metarially of because its economic and military power has become weak. The period of the western system has come to an end primarily because it is deprived of there life giving value which enabled it to the leader mankind."

পাশ্চাত্য যেভাবেই মূল্যায়ণ করুক : ইসলামের উত্থান অনিবার্য

স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বে যে ভারসাম্যহীনতার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে, তার অবসানের জন্য একটি নতুন শক্তির উত্থান অনিবার্য হয়ে উঠেছে। রাসূল (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী আজকের বিশ্বের বাস্তবতা, মানবরচিত মতবাদসমূহের ব্যর্থতা ও বন্ধ্যাত্ব, বিশ্বের চিন্তাশীল মনীষীগণের নতুন ভাবনা সবকিছু মিলিয়ে একথা আজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলামই আগামী দিনের মানুষের মুক্তির পথ এবং ইসলামের উত্থান ঘটবে স্বাভাবিকভাবেই। পাশ্চাত্য ইতিমধ্যেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, ইসলামই হচ্ছে বর্তমান পুঁজিবাদের একমাত্র Political প্রতিদ্বন্দ্বী। কারণ, কমিউনিজমকে আর তত্ত্ব হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বী গণ্য করা হয় না। ইসলামের উত্থানের মধ্যে পাশ্চাত্য যেন বিপদ সংকেত দেখতে পাচ্ছে। তাই সত্যিকার ইসলামী জাগরণকে পাশ্চাত্য অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখছে এবং মৌলবাদ বলে গালি দিচ্ছে। হিউম্যানিজমের নামে মানবজাতিকে আবারও বিভ্রান্ত করার জন্য পাশ্চাত্যে বড় তোড়জোড় চলছে। ইসলামের অনিবার্য উত্থানকে তারা বাঁকা দৃষ্টিতে দেখছে, তার অনেক প্রমাণ ইতিমধ্যে লক্ষ্য

করা গেছে। বছর খানেক আগে আলজিরিয়ায় যখন প্রথমবারের মত স্থানীয় নির্বাচনে ইসলামপন্থীদের বিজয় হলো, তখন পাশ্চাত্যপন্থী একটি পত্রিকা [হংকং থেকে প্রকাশিত International Herald Tribune] 'A shock from Algiars' শিরোনামে খবর পরিবেশন করে। অর্থাৎ নির্বাচনে ইসলামপন্থীদের সাফল্যকে তারা সহজভাবে নিতে পারেনি। অনুরূপভাবে আফগানিস্তানের মুজাহিদগণ যখন স্পষ্ট করে দিলেন যে, তারা বিজয়ী হলে একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েম করবেন, তখন পাশ্চাত্য হাত গুটিয়ে নিল। এখনও মুজাহিদরা আফগানিস্তানে সরকার গঠন করতে পারেনি। আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত থেকে ইসলামের উত্থান সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ইসলামের উত্থানের প্রতিপক্ষ পাশ্চাত্য কিভাবে দেখছে তার আরেকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উধৃত হচ্ছে: "Of late however the world has witnessed the emergence of another Powerful force, not yet manifest in such forceful terms as nuclear weapons but one which nevertheless affects one seventh of the worlds population directly and even a larger proportion indirectly. This new force is the emergence of Islamic Fundamentalism." [Pakistan's Islamic Bomb: maj gen. D.K. Palit and PKS. Namboodri]

পাশ্চাত্য বা ইসলামের প্রতিপক্ষ শক্তি যে ভাবেই দেখুক না কেন, মানুষের জন্য এবং পৃথিবী নামক এ গ্রহের জন্য আজ ইসলামের উত্থান অনিবার্য হয়ে উঠেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ইসলামের এই স্বাভাবিক উত্থানকে পৃথিবীর কোন শক্তিই রুখতে পারবে না।

স্মৃতিতে জীবন্ত রাহবার মকবুল আহমাদ

মুহাম্মদ আবদুর রব

‘মানুষ মরনশীল’ এ কথাটি সবারই জানা। কিন্তু কিছু লোক আছেন যারা মরেও অনেকের হৃদয়ে বেঁচে থাকেন। এ ধরনেরই একটি নাম মরহুম মকবুল আহমাদ। জীবন বাজী রেখে আল্লাহর পথে আমৃত্যু লড়েছেন যাঁরা তাঁদেরই একজন আমাদের প্রিয় রাহবার জীবন্ত দা’য়ী জনাব মকবুল আহমাদ। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সকল মানুষ এবং প্রাণীকেই মৃত্যুর মিছিলে শরীক হতে হয়। কেউ জানেনা কার মৃত্যু কখন হবে, কোথায় হবে এবং কিভাবে হবে। সূরা আন্ নিসার ৭৮নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ

“তোমরা যেখানেই অবস্থান করোনা কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই।”

কাজেই মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় “মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই” কিন্তু বাঁচার কোন উপায় নাই। তবে আল্লাহ যাদেরকে পছন্দ করেন তাদেরকে দিয়ে দুনিয়ায় কিছু নেক কাজ করান।

কুরআনে সূরা আল মুলক এর ২নং

“হে প্রশান্ত আত্মা! তোমার পালনকর্তার দিকে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে আস, আমার বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ কর এবং আমার জান্নাতের মধ্যেও।” আমার দৃঢ় আস্থা মায়াবী পৃথিবীর ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ এ অঞ্চলে চরম নির্যাতনের শিকার ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ পাঁচ নেতার ফাঁসির মঞ্চে ঝুলে আল্লাহর পথে জীবন দানের স্বাক্ষী হয়েই মহান মালিকের দরবারে পৌঁছে গেছেন আমাদের এ নেতা।

আয়াতে আল্লাহ বলেন-

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলকারী আল্লাহ সে বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন।"

মরহুম মকবুল আহমাদ আমার মূল্যায়নে সে নিরীখে একজন উত্তম আমলকারীর পর্যায়ে পড়েন বলে মনে হয়।

আমার সাংগঠনিক জীবনে- জনাব মকবুল আহমাদ :

কেবলমাত্র ছাত্র ইসলামী আন্দোলন থেকে ছাড় পেলাম। নরমদিল সম্পন্ন, বিদগ্ধ, মনমাতানো, হৃদয়-কাড়া নেতা ছাত্র আন্দোলনে আমার পাওয়া সর্বশেষ সভাপতি ভাই আবু নাসের মোহাম্মদ আবদুজ্ জাহের একই সময়ে চট্টগ্রামের কোন এক গৃহকোণে আমাদের চারজন সদস্যকে তুলে দিলেন বৃহত্তর আন্দোলনের তদানিন্তন চট্টগ্রাম বিভাগীয় দায়িত্বশীল জনাব মকবুল আহমাদের হাতে। সনটি ছিল ১৯৭৩ এর প্রথম দিকে। সেই থেকে মহান রাব্বুল আলামিনের মেহেরবাণীতে এ আন্দোলনে লেগে আছি। মাত্র অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনিই পুন:সাক্ষাতকার গ্রহণ করলেন- নিভৃতে কোন এক গৃহ কোণে। শপথ নেয়ার ব্যবস্থা হলো। দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে তুলে দিলেন তখনকার চট্টগ্রামের রাহবার মাষ্টার হুদা সাহেবের হাতে।

পেশাগতভাবে শিক্ষকতার আগ পরের সবটুকু সময়ই প্রায় দায়িত্ব পালনে ব্যয় হতে লাগলো। জীবনের কর্ম কাণ্ডকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছিলাম, সে এলাকার পরিবেশের সাথে। এমনি এক প্রেক্ষাপটে সম্মানিত মকবুল আহমাদ সন্ধান দিলেন জীবন সঙ্গীনীর, সূদুর কুমিল্লার লাকসামে। তাঁরই পরামর্শে এবং দিক নির্দেশনায় ছুটে গেলাম সেখানে। পেয়ে গেলাম মুসাফেরী জীবনের ঘুর্ণাবর্তের সহযাত্রীকে। আন্দোলনের জীবনেও এলো আরেকটি টার্নিং পিরিয়ড। সনটি ছিল ১৯৭৯ সাল। একদিকে দাম্পত্য জীবনে পদার্পন, অপরদিকে কেন্দ্রীয় সদস্য (রুকন) সম্মেলন। সম্মেলনের এক পর্যায়ে কুমিল্লার সদস্য ভাইদের এলাকাভিত্তিক আরেকটি অধিবেশনে জনাব মকবুল আহমাদের পরামর্শক্রমেই যুক্ত হই। তাদের আহ্বান এবং অনুরোধক্রমে জনাব মকবুল আহমাদের পরামর্শে আবার স্বীয়-জেলায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেই। মাঝখানে গতিপথের অন্ধকারাচ্ছন্ন কিছু সময় অতিবাহিত করে ১৯৮২ সালে এসে কুমিল্লা জেলার সেক্রেটারীর দায়িত্ব গ্রহণ করি। হঠাৎ করে তদানিন্তন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অন্যতম এই রাহবার সরাসরি চিঠি লিখে আমাকে জানিয়ে দিলেন জেলা সেক্রেটারীর দায়িত্বের পাশাপাশি কুমিল্লা শহর সংগঠনের দায়িত্বও আমাকে পালন করতে হবে। কিন্তু কেন? সে ব্যাখ্যার স্থান এটা নয়। টানতে

শুরু করলাম জীবন ঘানি। এভাবেই জনাব মকবুল আহমাদ যেন আমার জীবন চক্রের চাকায় ছায়ার মত লেগে আছেন। আমার জীবন, আন্দোলন-সংগঠনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকেই যেন তাঁকে দেখতে পেয়েছি, প্রেরণা পেয়েছি পরামর্শ নিয়েছি।

আন্দোলন ও সংগঠনের চলার পথ যখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে জমীন কর্দমাক্ত তখনও এর হাল ধরে দূর্গম পথ পাড়ি দিয়েছেন সমকালীন সাথীদেরকে নিয়ে। ২০১০ সাল থেকে আমি অন্তত: তাঁর একনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছি। অফিসের একই ফ্লোরে পাশাপাশি কক্ষে অবস্থান করে হাতে কলমে দায়িত্ব পালন শুরু হয়। এক পর্যায়ে যখন ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব তাঁর উপর আসে তখনও কক্ষ বদল হলেও মন বদল হয়নি। প্রায় প্রতিনিয়তই একত্রে সালাতুল এশা আদায় করে অফিস ছাড়ার ঘটনা নিত্যদিনের ছিল। অনেক সামাজিক কাজে তাঁর সাথী হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর নিজ বাসাতেও মাঝে মাঝে দাওয়াতে শরীক হতে হয়েছে।

দায়িত্ব পালন ব্যাপদেশে বেশ কিছু সংস্থায় তাঁর পরিচালিত কমিটির সদস্য পরবর্তীতে তাঁর ছেড়ে যাওয়া খালী আসনে দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। অসুস্থতা চরম পর্যায়ে পৌছার পরও তিনি দায়িত্বানুভূতির সাথেই স্বকর্ম সম্পাদন করেছেন। ২০১৯ সালেও নিজের শারীরিক সামর্থে চলতে না পেরে খাদিমের সহযোগিতায় দায়িত্ব পালনার্থে দূরবর্তী এলাকায় সফরে গিয়েছেন। সচেতনতাবোধ ও নির্মোহ দায়িত্ব পালনে এতবেশী আন্তরিক ছিলেন যার তুলনা বিরল।

তাঁর জীবনের সমাপনী অনুষ্ঠান :

১৩ এপ্রিল ২০২১; ৩০ শাবান ১৪৪২; ৩০ চৈত্র ১৪২৭ দুপুর ১টা। হাসপাতালের বিছানায় দুনিয়ার বর্ণাঢ্য জীবনের ইতি টেনে মহান মালিকের ডাকে স্বীয় মাবুদের সান্নিধ্য লাভের আশায় আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন চরম দুর্দিনের সে রাহবার। না ফেরার দেশে তাঁর পাড়ি জমাবার খবর পেয়েই দ্রুত ছুটে গেলেন ঘটনাস্থলে তাঁরই একান্ত অনুজ বর্তমানে সে দায়িত্বভার যার উপর এসেছে আমীরে জামায়াত ডাক্তার শফিকুর রহমান। তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিতে কাল বিলম্ব না করে ডান-বামে যারা ছিলেন তাদের সাথে মত বিনিময় করে বিদায়ী রাহবারের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করার আয়োজনের ফায়সালা দিয়ে দিলেন।

শুরু হলো আরেক অনুপম দৃশ্যের। রাজধানী থেকে প্রায় দু'শ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মরহুমের বাড়ীর পাশেই মাঠে আয়োজন হলো জানাযা। রাত দশটার সেই বিদায়ী সমাবেশে অগণিত মানুষের উপস্থিতিতে ইমামতি করলেন আমীরে জামায়াত। জানাজাপূর্ব সমাবেশে বেদনা-বিধুর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে

নিজে কাঁদলেন এবং জনতাকে কাঁদালেন প্রিয় আমীরে জামায়াত ডাক্তার শফিকুর রহমান। এলো কফিন কবরে নামাবার পালা; সবার আগে নামলেন আমীরে জামায়াত; মাবুদের কাছে সোপর্দ করলেন বিদায়ী রাহবারকে সযতনে কবর নামক নতুন গৃহে। অত:পর সকলকে নিয়ে শেষবারের মত দোয়া করে কবরস্থান ত্যাগ করলেন।

যেহেতু পরবর্তী ভোর থেকেই করোনার কারণে দেশব্যাপী সর্বাত্মক লকডাউন এবং মাহে রামাদান শুরু। রাতের মধ্যেই সকলকে রাজধানীতে ফিরতে হবে তাই এসব কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত নেতৃবৃন্দের তালিকায় প্রথমে আমাকে না রাখলেও আমার মন যে ছুটেছে অনেকের আগে সে বিবেচনায় আমাকে রেখে যেতে পারেননি আমীরে জামায়াত। আলহামদুলিল্লাহ জানাযা, কফিন কবরে নামানো, সমাপনী দোয়া অনুষ্ঠানসহ সকল কাজেই এসব কর্মকান্ডের প্রধান সংগঠকের কাছাকাছি থেকে আমার সাংগঠনিক জীবনের 'মায়াবী ছায়া' কে বিদায় জানিয়ে বর্তমান বৃক্ষছায়ায় আশ্রয় পাওয়ার ভাগ্য খুলেছে।

মহান মালিক যেন আমাদের বিদায়ী রাহবার মরহুম মকবুল আহমাদকে নিজ অনুগ্রহে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করেন। আল্লাহর সে ঘোষণা অনুযায়ী-

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي.وَادْخُلِي جَنَّتِي.

"হে প্রশান্ত আত্মা! তোমার পালনকর্তার দিকে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে আস, আমার বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ কর এবং আমার জান্নাতের মধ্যেও।"

আমার দৃঢ় আস্থা মায়াবী পৃথিবীর ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ এ অঞ্চলে চরম নির্যাতনের শিকার ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ পাঁচ নেতার ফাঁসির মঞ্চে ঝুলে আল্লাহর পথে জীবন দানের স্বাক্ষী হয়েই মহান মালিকের দরবারে পৌঁছে গেছেন আমাদের এ নেতা। আল্লাহ যেন তাঁকেও "আস-সাবেকুনা-স-সাবেকুন উলায়েকাল মুকার্‌রাবুন" এর অন্তর্ভূক্ত করেন। আমীন॥

লেখক- কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী ও চট্টগ্রাম অঞ্চল পরিচালক, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

মকবুল আহমাদ : এক দা'য়ী ইলাল্লাহ

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম

তিনি যেমন নিজেকে, নিজের পরিবার-পরিজনকে আদর্শরূপে গঠনের চেষ্টা করতেন, তেমনি অন্যদের ক্ষেত্রেও তাদের নিজেদের এবং নিজেদের পরিবারকে আদর্শরূপে গঠনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতেন। শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন, আবার কেউ অলসতা-অবহেলা করলে তিনি কড়াভাবে তার আলোচনা করতেন এবং করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিতেন।

তিনি ক্ষেত্রভেদে যেমন ছিলেন কোমল, তেমনি আবার ছিলেন কঠোর।

এ পৃথিবীতে যারা যে কাজই করুক না কেন, তার একটি ভিত্তি থাকে। যে কোনো সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, সংস্থা, সমিতি অথবা কোনো অট্টালিকা, ঘরবাড়ি প্রত্যেকটি বস্তু বা প্রতিষ্ঠান যার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে- সেটাই হলো ভিত্তি বা Foundation| অনেকগুলো স্তম্ভের বা Pillar-এর ওপর দাঁড়িয়ে থাকে সেই প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নামে যে সংগঠনটি আল্লাহর দ্বীন আল্লাহর জমিনে বাস্তবায়নের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে, গণতান্ত্রিক উপায়ে মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের পথে আহ্বান জানাচ্ছে, মানবতার সেবায় অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে- এই সংগঠনের অন্যতম একটি Pillar ছিলেন শ্রদ্ধেয় মকবুল আহমাদ।

নির্লোভ, নিরহংকার, অমায়িক, নম্র, ভদ্র, ধীরস্থির, সৌম্য ও শান্ত স্বভাবের একজন আপাদমস্তক নিরেট ভদ্রলোক ছিলেন জনাব মকবুল আহমাদ। তাকে প্রায় সাড়ে চার দশক একেবারে কাছে থেকে দেখে এসেছি। এত অসংখ্য গুনের সমাহার খুব কম ব্যক্তির মধ্যেই দেখা যায়।

একজন আদর্শ শিক্ষক, একজন আদর্শ সংগঠক, একজন আদর্শ নেতা ছিলেন মকবুল আহমাদ। তৃণমূল থেকে উঠে এসে এত বড় একটি সংগঠনের তিনি আমীর হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রাইমারি স্কুল, হাইস্কুল, কলেজ

জীবন শেষ করে তিনি সরকারি চাকরি নেন। বছরখানেক সরকারি চাকরি করার পর চাকরি ছেড়ে শিক্ষকতা পেশা বেছে নেন। কয়েক বছর শিক্ষকতা করার পর সেটাও ছেড়ে দিয়ে সার্বক্ষণিক আল্লাহর দ্বীনের পথে কাজ শুরু করেন। যার অন্তরে আল্লাহ এবং রাসূলের (সা.) মহব্বত চির জাগ্রত থাকে, আল কুরআন এবং হাদীসের শিক্ষা যিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেন– তার অন্তরের পেরেশানীই তাকে দ্বীনের দাওয়াতী কাজে টেনে আনে।

শহর আমীর, মহকুমা আমীর, জেলা আমীর, বিভাগীয় আমীর, অতঃপর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি, নায়েবে আমীর এবং সব শেষে আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হয়েছেন জনাব মকবুল আহমাদ। আর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য তো ছিলেন বছরের পর বছর। কত স্তর অতিক্রম করে তিনি গণতান্ত্রিক উপায়ে সদস্যদের ভোটে সংগঠনের সর্বোচ্চ পদে আমীরে জামায়াত হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তা সকলের জন্যই শিক্ষার বিষয়। তার সাংগঠনিক জ্ঞানের ভাণ্ডার কত বিশাল, তা সহজেই অনুমেয়। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত দক্ষ সংগঠক। আর তাই তো তাকে চট্টগ্রাম থেকে এনে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়।

আমার সৌভাগ্য যে, একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসেবে এত বড় বিশাল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন নেতার সঙ্গে সুদীর্ঘদিন আমি কাজ করতে পেরেছি। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে তিনি এবং আমি একত্রে বসে হাতে গঠনতন্ত্র লিখেছি এবং কপি করেছি। তখন তো আর এত টাইপরাইটার, কম্পিউটার, সাইক্লোস্টাইল মেশিন ছিল না। একটি মাত্র টাইপরাইটার ছিল। কোনো কিছু লিখে সংরক্ষণ করা, কপি করে বিলি করার একমাত্র মাধ্যম ছিল– শুধু হাত এবং তার নিচে কার্বন দিয়ে কপি করা। তাই তো শ্রদ্ধেয় নেতার সাথে একত্রে বসে এত বড় একটি সংগঠনের গঠনতন্ত্র হাতে লিখেছিলাম।

উল্লেখ্য, তিনি ঢাকা আসার আগে থেকেই আমি ঢাকায় ছিলাম। তাই তিনি ঢাকায় আসার পর তার পারিবারিক, সাংগঠনিক, দাপ্তরিক প্রায় সকল কাজেই তার সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। তিনি মাঝেমধ্যে নানা বিষয় নিয়ে আমার সাথে কথা বলতেন, গল্প করতেন, মতবিনিময় করতেন।

উল্লেখ্য, একদিন তিনি একটি মসজিদে মুসল্লিদের মাঝে কুরআনুল কারিম থেকে আলোচনা পেশ করছিলেন। আলোচনা শেষ হলে মসজিদের ইমাম সাহেব উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বাবা আপনি এত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাসহ কেমন করে কুরআন থেকে আলোচনা পেশ করলেন? আমি তো এর আগে কখনো এত সুন্দর অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ কুরআনের আলোচনা শুনিনি। আমি যেন নতুন আলোর সন্ধান পেলাম।'

একজন ইংরেজি শিক্ষিত লোক যিনি কখনো কোনো মাদরাসায় পড়েননি,

তিনি কি করে কুরআনুল কারিম থেকে এত সুন্দর আলোচনা পেশ করতে পারেন, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। কুরআন-হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য নিয়মিত অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ অধ্যয়ন তাকে কত পারদর্শী করে তুলেছিল, তা আমাদের জন্য অনুসরণীয়-অনুকরণীয়।

তিনি যেমন নিজেকে, নিজের পরিবার-পরিজনকে আদর্শরূপে গঠনের চেষ্টা করতেন, তেমনি অন্যদের ক্ষেত্রেও তাদের নিজেদের এবং নিজেদের পরিবারকে আদর্শরূপে গঠনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতেন। শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন, আবার কেউ অলসতা-অবহেলা করলে তিনি কড়াভাবে তার আলোচনা করতেন এবং করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিতেন। তিনি ক্ষেত্রভেদে যেমন ছিলেন কোমল, তেমনি আবার ছিলেন কঠোর।

তিনি ছিলেন একজন আদর্শ সংগঠক। তিনি যখন যেখানেই যেতেন, সেখানে অবস্থানরত সকলের খোঁজখবর নিতেন। এমনকি অসুস্থ হয়ে যখন যে হাসপাতালেই ভর্তি থাকতেন, চিকিৎসা নিতেন, সেখানে চিকিৎসক, নার্স, ওয়ার্ডবয় থেকে শুরু করে সকলের গ্রামের বাড়ি, পরিবার-পরিজনসহ তাদের সকলের খোঁজখবর নিতেন। দ্বীনের দাওয়াত দিতেন, তাদের ইসলামী বই উপহার দিতেন। জীবনে যার সঙ্গেই তার দেখা হতো, দ্বীনের দাওয়াত দিতেন; এমনকি বিয়ের মজলিস থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন এবং ইসলামী বই উপহার দিতেন। সবসময় তার সাথে ইসলামী বই-পুস্তক থাকত।

তিনি স্টাফের এবং তাদের পরিবার-পরিজনের খোঁজখবর নিতেন। হাসপাতালে যখন থাকতেন সবসময় দীর্ঘদিনের অফিসের এক নিবেদিতপ্রাণ কর্মী কাজী সিকান্দর তার সাথে থাকতেন। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি তার কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চেনা-জানা সকলেরই খোঁজখবর নিতেন। সর্বত্র তিনি ছিলেন আল্লাহর পথে একজন একনিষ্ঠ আহ্বানকারী। একজন আদর্শ দা'য়ী ইলাল্লাহ।

একসময় বিভিন্ন জেলায় সফর করেছি। দু-এক জেলায় তাঁর সাথেও সফরে গিয়েছি। একবার চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার সফরে গেলাম। সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের চাপের মধ্যেও এক ফাঁকে তিনি বললেন, চলেন 'সাগর সৈকত' বেড়িয়ে আসি এবং আমাকে নিয়ে সাগর সৈকতে গেলেন। সমুদ্রের তরঙ্গমালার সাথে যেমন আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টির অপার সৌন্দর্য উপভোগ করলেন, তেমনি ভাবলেন আল্লাহর সৃষ্টির রহস্যলীলা।

তিনি ছিলেন উদার ও সংস্কৃতিমনা, সৌন্দর্য উপভোগী, ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শনেচ্ছু একজন সংবেদনশীল মানুষ। অবশ্য বাইরে থেকে তা তেমন দৃশ্যমান হতো না। কারণ তিনি মন মগজে সবসময় আল্লাহর দ্বীনের

পথে মানুষকে আহ্বান এবং এর প্রসার ঘটানোর চিন্তা-চেতনায় থাকতেন বিভোর। দেশে-বিদেশে তিনি যেখানেই যখন সফর করেছেন তিনি আল্লাহর পথে সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন।

জাপান সফরে গিয়ে তিনি প্রচণ্ড কাজের চাপের মধ্যেও টৌকিওর সার্কেল ট্রেনে পরিভ্রমণ, ল্যান্ডমার্ক টাওয়ার, উয়েনো পার্ক, জাপানের রাজার বাড়ি, জাতীয় ধর্মীয় কেন্দ্র বৌদ্ধ মন্দির বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিদর্শন করেছেন এবং ইসলামিক এরাবিক ইনস্টিটিউট ও Fuji T.V. Building সহ অনেক সুন্দর সুন্দর স্থাপনাও স্ব-চক্ষে উপভোগ করেছেন।

এছাড়া হোটেল ওতাইবাতে এরাবিক লার্নিং ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে সৌদি রাষ্ট্রদূতের এক সংবর্ধনা সভায় যোগদান করেন। সেখানে বিভিন্ন মুসলিম দেশের রাষ্ট্রদূত ও মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাথে দেখা ও মত বিনিময় করেন। এসব কিছুই তিনি অতি সুন্দরভাবে সাহিত্যিক ভাষায় তার ছোট 'জাপান সফর' পুস্তিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এসব কিছু তার সংস্কৃতিমনা ও ইসলামী মননশীলতার পরিচয় বহন করে। দুনিয়ার শতমুখী দ্বীনি কাজে ব্যস্ততার মাঝেও তিনি তার মনের খোরাকও জুগিয়েছেন। যারা নেতৃত্বে থাকেন, তারা যে বহুমুখী গুনাবলির অধিকারী হয়ে থাকেন– এটা তারই প্রমাণ বহন করে।

উল্লেখ্য, হজ করে আসার পর বাসায় না গিয়ে সর্বপ্রথম তিনি তদানীন্তন আমীরে জামায়াতের সাথে দেখা করে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং অঝোরে কাঁদতে থাকেন। আমি তার পাশে থেকে আবেগাপ্লুত হয়েছি। হজ্জ করার পর তার পুতঃপবিত্র মনের যে ভাবাবেগ তা স্বচক্ষে অবলোকন করেছি।

উল্লেখ্য, তিনি দেশের কোনো জেলায় কিংবা বিদেশে কোনো সফরে গেলে সেই সকল স্থানের দ্বীনি ভাইদের ঢাকায় বা দেশে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ-খবর নিতেন এবং ঢাকায় ফিরে এসে তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। সময় পেলে দেখা করতেন এবং ইসলামী বই-পুস্তক পাঠাতেন। প্রতিটি মুহূর্ত তিনি আল্লাহর দ্বীনের পথে মানুষকে আহ্বান করেছেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত দ্বীনের দাওয়াতী কাজে ব্যয় করেছেন।

> আল্লাহ বলেন, "সময়ের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়"। সূরা আসর।

আমরা একনজরে যদি জনাব মকবুল আহমাদকে দেখতে চাই, তা হলো এই যে–

- তিনি ছিলেন সহজ-সরল, সাদামাটা, নির্লোভ, নিরহঙ্কার, অমায়িক, নম্র, ভদ্র, সৌম্য ও শান্ত স্বভাবের আপাদমস্তক একজন নিরেট ভদ্রলোক।
- তার কথা ও কাজে ছিল অপূর্ব মিল। কোনো সময় কখনোই তার কাজে-কর্মে ও মন-মানসিকতার মধ্যে বৈপরীত্য ছিল না। যা ভাবতেন, যা বলতেন তাই তিনি করতেন।
- তিনি যে কোনো বৈঠকাদিতে কখনো এক মিনিটও বিলম্ব করতেন না। বৈঠক শুরুর আগেই যথাসময়ে নিয়মিত হাজির হতেন। তিনি যা ভালো মনে করতেন এবং বুঝতেন, তা অন্যদের কাছে অপ্রিয় হলেও বৈঠকাদিতে অকপটে, নিঃসংকোচে তা তুলে ধরতেন। ঘরে-বাইরে, সফরে প্রতিটি মুহূর্ত তিনি কাজে লাগাতেন। অযথা গল্প-গুজবে কোনো সময় নষ্ট করতেন না। সময়ের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন।
- তিনি খুবই অল্প সাধারণ মানের খাবার খেতেন। সবসময়ই ১টা বা দেড়টা রুটি খেতেন।
- কঠোরভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতেন। কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে তিনি যেমন কঠোরভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতেন, পোষাক-আশাক, খানা-দানা, চাল-চলনের ক্ষেত্রেও তিনি নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম করতেন না। তিনি ডায়াবেটিক রোগী হওয়ার কারণেই একটানা ৪০-৫০ বছর রুটি খেয়েই চলতেন। কখনো কখনো সামান্য ভাত-সবজি খেতেন।
- আমি বহু বছর তার সাথে একত্রে রমজানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করেছি। আমি তাঁকে অতি কাছ থেকে দেখেছি– সারাদিন রোজা থাকার পরও ইফতার, রাতের খাওয়া বা সাহরীর সময় নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম করেননি। ধীরস্থিরভাবে এক-দুটি ছোট রুটি খেয়েই যেন অসাধারণ তৃপ্তিবোধ করতেন।
- সারাটি জীবন তার ছিল সুনির্দিষ্ট নিয়মের ছকে বাঁধা।
- যারা সংগঠন থেকে দূরে সরে যেতেন– তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতেন। ২০-৩০ বছরের পুরনো ভাই-বন্ধুদেরও তিনি খুঁজে খুঁজে বের করতেন এবং তাদের খোঁজখবর নিতেন।
- কোনো কারণে সংগঠন থেকে কেউ বের হয়ে গেলে তিনি বলতেন, আমাদের চেয়ে ভালো কিছু করুন অথবা আমাদের সাথেই থাকুন, নিজের ঘরেই চলে আসুন।
- একবার কারো সাথে পরিচয় হলে তার নাম-ঠিকানা-টেলিফোন নম্বর রেখে দিতেন, ১০-২০ বছর পর হলেও তিনি তাদের খোঁজখবর নিতেন।
- কারও অসুখ হলে তিনি তাকে দেখতে যেতেন। এসব কাজে প্রায় সময়ই তিনি আমাকে সাথে নিতেন।
- কোনো বিয়েতে বা কোনো বড় অনুষ্ঠানে তাকে দাওয়াত দিলে সবসময় তিনি স্টাফের ছোটখাটো কর্মীকেও সাথে নিতেন। তিনি আমাকে বলতেন, আমরা সবসময়ই দাওয়াত খাই। কিন্তু এরা তো সুযোগ পায়

না। তাই একজন-দুজনকে সবসময় সাথে নিতেন এবং এক টেবিলে বসেই খেতেন।

- কোনো সফরে গেলে সাথের কর্মীরা খেয়েছে কিনা, ড্রাইভার খেয়েছে কিনা, তাদের শোবার জায়গা হয়েছে কিনা, তিনি নিজে তাদের খোঁজখবর নিতেন।
- কেউ তার কাছে সাহায্য চেয়ে খালি হাতে ফিরে গেছে– এমন আমি কখনো দেখিনি। তার মৃত্যুর মাসখানেক আগে আমাদের একজন সাবেক কর্মী ভীষণ অসুস্থ ছিল। আমি তার কাছে একজনের মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছিলাম– তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এবং অন্যান্য উপায়েও তাকে সাহায্য করেছেন। এরকম বহু নজির আমার কাছে আছে।
- তিনি ছিলেন দরদি, সমাজসেবী একজন মানুষ। কত শত ব্যক্তি কত সমস্যা নিয়ে তার কাছে আসতেন। তিনি অত্যন্ত ধীরস্থির ও শান্তভাবে সমাধান করে দিতেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাকে দায়িত্ব দিতেন এবং আমাকে তার সঙ্গে রাখতেন।
- তিনি যখন কোনো গিফট বা উপহার পেতেন, তার সবগুলোই প্রায় অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। এমনকি যারা অফিসের সাধারণ কর্মী ছিলেন, তাদেরও দিয়ে দিতেন।
- পবিত্র রমজান মাসে তালিকা করে তিনি স্টাফের দু'একজন এবং পরিচিতদের মধ্য থেকে দু'একজন করে বাসায় নিয়ে ইফতার করাতেন।
- পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বাস্তবে তা যথার্থভাবে পালন করতেন। অপরের আপদে-বিপদে তিনি নিজে তার পাশে এগিয়ে যেতেন। এসব অনেক কাজেই আমি তার সাথে ছিলাম।
- কী আপন, কী পর যে কোনো অসুস্থ ব্যক্তির খবর পেলেই তিনি হাসপাতালে দেখতে যেতেন। আমাকে প্রায়ই সঙ্গে নিতেন। পরিচিত রোগীকে দেখার পর আরেক পাশে অপরিচিত রোগীকেও দেখতেন, তাদের মাথায়-গায়ে হাত বোলাতেন এবং দোয়া করতেন।
- ঘনিষ্ঠভাবে তিনি সকলের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতেন। নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অপরের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতেন। আপদে-বিপদে অপর ভাইয়ের পাশে দাঁড়াতেন।
- পরিচিত দ্বীনি কোনো ভাইয়ের সাক্ষাৎ পেলেই বলতেন, আপনার কি শপথ হয়েছে? না হয়ে থাকলে কবে শপথ হবে? এ প্রশ্নে কেউ কেউ বিব্রতবোধ করতেন। আসলে তার মনে-প্রাণে, চিন্তা-চেতনায় ভাবনায় সবসময়ই থাকতো সংগঠন, দাওয়াত এবং টার্গেটভিত্তিক কাজ করার লক্ষ্য। আর এ কারণেই তিনি কারো দেখা পেলেই কুশলাদি বিনিময়ের পর এ কথাটিই সর্বপ্রথম বলতেন।
- ছোট্ট শিশু-কিশোরের সাথে দেখা হলেই বলতেন, "চাচা কেমন আছো? কী খবর ইত্যাদি।"

- যখন পথ চলতেন, পরিচিত-অপরিচিত সকলকেই সালাম দিতেন। পারিবারিক, সাংগঠনিক, সামাজিক জীবনের কঠিন কঠিন মুহূর্তেও তিনি থাকতেন ধীরস্থির এবং শান্ত। কখনো কোনো অবস্থায় তাকে বিচলিত বা অস্থির হতে দেখিনি।
- তিনি অবসর পেলেই কুরআন, হাদিস, ইসলামী বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পড়তেন। কোথাও কোনো বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা লেখা তার চোখে পড়লেই তা তিনি ফটোকপি করে বিলি করতেন। অন্যদেরকেও তা বিলি করতে দিতেন। বই এবং পেপার এর এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কাটিং, ফটোকপি করে আমাকেও বিলি করতে দিতেন।
- অফিসের কোনো যানবাহন ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কাজে ব্যবহার করলে তিনি স্বয়ং নিজে হিসাব-নিকাশ করে তার খরচ পরিশোধ করে দিতেন। অফিসের বিল দেওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকতেন না।
- ধর্ম-দল-মত নির্বিশেষে প্রায় সকলের কাছেই তিনি একজন সৎ, নম্র, ভদ্র এবং ভালো মনের মানুষ বলে পরিচিত ছিলেন। তার মৃত্যুর পর সকল শ্রেণির মানুষের শোক প্রকাশের মধ্য দিয়ে এটা আরো প্রকাশিত হয়ে উঠেছে।
- পারিবারিক কি ব্যক্তিগত কঠিন অসুখ-বিসুখ কিংবা কোনো সংকট মুহূর্তে তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সকল পরিস্থিতি সামলাতেন। সবসময় তিনি একটি কথা বলতেন, 'সবর করেন' আল্লাহ সহায়।
- আমি দীর্ঘ ৫-৭ বছর থেকে অসুস্থ। তিনি প্রতিনিয়ত আমার খোঁজখবর নিতেন। যাকে কাছে পেতেন তাকেই আমার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করতেন। আইসিইউতে স্থানান্তরিত হওয়ার আগেও তিনি আমার খোঁজ নিয়েছেন। উল্লেখ্য, আমিও প্রতিদিন তার খোঁজখবর নিতাম।
- আমি সাপ্তাহিক সোনার বাংলাসহ পত্র-পত্রিকায় একটু-আধটু লেখালেখি করতাম। তিনি নিয়মিত তা পাঠ করতেন এবং যারা কাছে থাকতেন, তাদের এ সম্পর্কে বলতেন।

সর্বোপরি তার জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সাংগঠনিক সমস্ত কার্যাবলীই ছিল এক 'নিয়মের ছকে বাঁধা'। সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়েই তিনি তার সামগ্রিক জীবনটা অতিবাহিত করেছেন। কঠিন মুহূর্তে ভারপ্রাপ্ত আমীর, পরবর্তীতে নির্বাচিত আমীর হিসেবে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে শান্ত, ধীরস্থিরভাবে সাবলীল গতিতে দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

"বাসের ভেতরে সিট না পেয়েও যিনি বাসের ছাদে বসে সাংগঠনিক সফরে গিয়েছেন, সাংগঠনিক কাজ ও ব্যক্তিগত কাজ– এ দুটি যিনি চুলচেরা হিসাব-নিকাশ করে প্রতিটি পা ফেলতেন, সৎকর্ম সম্পাদন করাই ছিল যার জীবনের মূল লক্ষ্য, মুখে যা বলতেন, বাস্তবেও তাই করার চেষ্টা করতেন, প্রতিটি কথা ও কাজে যার হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়, যার জীবনের লক্ষ্যই ছিল মানুষের

কাছে দ্বীন কায়েমের দাওয়াত পৌঁছানো, দিল ছিল যার স্বচ্ছ-সুন্দর, যার জীবন ছিল এক সুন্দর নিয়মের ছকে বাঁধা, যিনি প্রতিনিয়ত আল্লাহ্র তায়ালার এ বাণী–'লীমা তাকুলুনা মা লা-তাফ আ'লুন', "এমন কথা কেন বল, যা তোমরা কার্যত করো না।"(-সূরা সফ : ২) মনে জাগরূক রেখে এবং তার শিক্ষা অণুসরণ করে বাস্তব জীবনে সকল কাজ করার চেষ্টা করেছেন– তিনি হলেন সাবেক আমীরে জামায়াত শ্রদ্ধেয় মকবুল আহমাদ।

শ্রদ্ধেয় নেতা, ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম স্তম্ভ, বহুমুখী গুনে গুনান্বিত ব্যক্তিটি আমাদের কাঁদিয়ে গত ১৩ এপ্রিল, ২০২১ মহান সৃষ্টিকর্তা, বিশ্বজাহানের মালিক ও প্রভু আল্লাহ তায়া'লার সান্নিধ্যে চলে গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। হে আল্লাহ! আপনার এই মুমিন বান্দার জীবনের গুনাহগুলো মাফ করে দিন। যাবতীয় নেক আমলগুলো কবুল করুন। তার জীবনের সমস্ত সৎকর্ম ও সেবামূলক কাজগুলো সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করে নিন। তার কবরকে জান্নাতের নূর দিয়ে ভরে দিন। তাকে নাজাত দান করুন। ইয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ আসনে স্থান দান করুন। আমাকে এবং আমাদেরকে জান্নাতে তার সাথী বানিয়ে দেবেন– আমাদের প্রার্থনা কবুল ও মঞ্জুর করুন। আমিন।

আমিও আজ জীবন সায়াহ্নে। দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ। সকলের কাছে আবেদন– আমার এবং আমাদের সকলের জন্য দোয়া করবেন। দোয়া করবেন তাদের জন্য, যারা পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়িতে চড়ে, সাইকেলে চড়ে, গণপরিবহনে চড়ে, গাড়িতে সিট না পেয়ে গাড়ির ছাদে বসে রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে, দূরদূরান্তে দ্বীনি কাজে সফর করেছেন। আলু ভর্তা, ডালভাত খেয়ে দিন-রাত কাটিয়েছেন। খালি বিছানায় ঘুমিয়েছেন তবুও দ্বীনের দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রেখেছেন। আসুন, তাদের ত্যাগ ও কুরবানি বুকে ধারণ করে তাদের স্মরণীয়, বরণীয় ও অনুসরণীয় করে রাখি এবং আমাদের মনে, প্রাণে, ধ্যানে, দেহ ও শরীরের বুকে ধারণ করে দাওয়াতী কাজ করি। যে কোনো পরিস্থিতিতে শান্ত, ধীর, সুস্থির, সবরের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সুশৃঙ্খল ও গণতান্ত্রিকভাবে সামনে এগিয়ে যাই, প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশকে উন্নতি, শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই, মানুষের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দিই। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

লেখক- সাবেক কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

ইসলামী নেতৃত্বের মডেল মকবুল আহমাদ (রহ.)

অনাড়ম্বর জীবন যাপন, সহজ-সরল, ভদ্র-নম্র, অমায়িক স্বভাবের লোক ছিলেন, ধৈর্য্য-সহিষ্ণু, বিশাল হৃদয়ের, হাসি-খুশি মুখ, দরদী মন, সময়ের প্রতি যত্নশীল, স্বাস্থ্য সচেতন, মধুর ব্যবহার, শব্দ চয়নে কৌশলী, আল্লাহর হুকুম আহকাম পালনে ছিলেন আপোষহীন, অবিচল।

অধ্যাপক আহছান উল্লাহ

আল্লাহ ছোবহানাহু তা'য়ালার দরবারে কায়মনোবাক্যে মুনাজাত, হে আল্লাহ! মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) কে তোমার মকবুল বান্দাহ হিসেবে কবুল কর, তাঁকে শাহাদাতের মর্যাদা দান কর, তাঁর রুহকে ইল্লিয়্যিনে স্থান দাও, এই মহান ব্যক্তিত্বের আলোকিত জীবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে একামতের দ্বীনের কাজকে অধিকতর এগিয়ে নেওয়ার তৌফিক আমাদেরকে দান কর। তাঁকে জান্নাতের আ'লা দরজা দান কর।

ইসলামী আন্দোলনের এই নেতা ফেনী জেলার দাগনভূঁইয়া উপজেলার ওমরাবাদ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত দ্বীনি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকে ইসলামী চিন্তা চেতনায় তিনি গড়ে উঠেন। প্রাথমিক স্কুল শেষ করে তিনি কামাল আতাতুর্ক হাইস্কুলে, এরপর ফেনী পাইলট হাইস্কুল, সর্বশেষ জায়লস্কর হাইস্কুল থেকে ১৯৫৭ সালে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি পাশ করেন। ফেনী কলেজ থেকে ১৯৬২ সালে বি.এ ডিগ্রী লাভ করেন। প্রথমত শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সাল ফেনী সেন্ট্রাল হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। বেশ কিছুদিন তিনি সাংবাদিকতার কাজে দৈনিক সংগ্রামের ফেনী মহকুমার নিজস্ব সংবাদদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সুদীর্ঘ সাংগঠনিক জীবন :

সাবেক আমীরে জামায়াত মকবুল আহমাদ (রহ.) দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য একটি মডেল হিসেবে কাজ করবে।

ঘাত-প্রতিঘাত উপেক্ষা করে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সাথে ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে তিনি অনুকরণীয় অনুসরণীয় একটি আদর্শ।

১৯৬৬ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীর রুকনীয়াত অর্জন করেন। ১৯৬৭ সালে ফেনী শহর নাযেম দায়িত্ব পালন করেন, ১৯৬৮ সালে ফেনী মহকুমা নাযেম, ১৯৭০ সালে নোয়াখালী জেলা আমীর, ১৯৭৯ সালে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী ১৯৮৯ সালে কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল, ২০০৩ সালে কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর, ২০১০ সালে আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রহ.) গ্রেফতারের পর ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৬ সালের ১৭ই অক্টোবর তিনি জামায়াতে ইসলামীর ৩য় আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন। ২০১৯ সালের ১২ নভেম্বর পর্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। দ্বীনকে বিজয় করার এক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিলে তিলে বিলিয়ে দিলেন সারাটি জীবন।

রাব্বুল আ'লামিন বলেন, "তোমরা প্রতিযোগিতা করো দ্রুত এগিয়ে চল তোমার রবের মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও পৃথিবীর সমান।" (সুরা হাদীদ- ২১নং আয়াত)

মহান এই নেতার এই পথে চলার পরিসমাপ্তি ঘটলো ১৩ এপ্রিল ২০২১। আল্লাহ তোমার এই বান্দাকে তুমি সর্বোচ্চ নিয়ামত জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব কর।

রাজনৈতিক জীবন :

১৯৭০ সালে ফেনী আসনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন করেন জাস্টিস এ. কে.এম বাকের এবং প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে মকবুল আহমাদ (রহ.) জামায়াতের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সেই নির্বাচনে আমার নিজস্ব ভোট কেন্দ্র উত্তর আলীপুর প্রাইমারী স্কুল কেন্দ্রে আমি কাজ করি, সেই থেকে মকবুল আহমাদ সাহেবের সাথে আমার সংশ্লিষ্টতা শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে তিনি ফেনী- ২ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তখনও আমি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করি। সাংগঠনিক, রাজনৈতিক, নির্বাচনী, মানব কল্যাণ, সামাজিক, ব্যক্তিগত ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অনন্য। রাজনৈতিক মত পার্থক্য ছাড়া তিনি সকলের কাছে ছিলেন প্রশ্নাতিতভাবে ভাল মানুষ। তাঁর ব্যক্তি চরিত্র মানুষকে প্রভাবিত করতো। মৌলিক মানবীয় গুনে তিনি উন্নত মানের ব্যক্তি ছিলেন। ফেনী জেলা বিভিন্ন কারণে অনেক জেলা থেকে আলাদা। নির্বাচনী ময়দানেও তিনি ছিলেন ইসলামী আদর্শের প্রতীক, আপোষহীন, দৃঢ়চেতা, আল্লাহর উপর নির্ভরশীল, জনদরদী, পরোপকারি। বিরোধী দলগুলোর কাছে তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়। ইসলামের পক্ষে জনগণের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়। যিনি তাকে দেখতেন মুগ্ধ হতেন। তাঁর ব্যবহার তাঁকে অনেক সম্মানিত আসন দিয়েছে। আন্দোলনের কর্মীদের

কাছে তিনি সম্মান ও শ্রদ্ধার অতুলনীয় প্রেরণার উৎস। আল্লাহ তাঁর সকল নেক আমল কবুল করুন। তার উপর রহম করুন।

ব্যক্তিগত জীবনে মকবুল আহমাদ (রহ.) :

অনাড়ম্বর জীবন যাপন, সহজ-সরল, ভদ্র-নম্র, অমায়িক স্বভাবের লোক ছিলেন, ধৈর্য্য-সহিষ্ণু, বিশাল হৃদয়ের, হাসি-খুশি মুখ, দরদী মন, সময়ের প্রতি যত্নশীল, স্বাস্থ্য সচেতন, মধুর ব্যবহার, শব্দ চয়নে কৌশলী, আল্লাহর হুকুম আহকাম পালনে ছিলেন আপোষহীন, অবিচল। মানুষকে সম্মান দিতেন। হাঁসিমুখে গ্রহণ করা এবং সুন্দরভাবে বিদায় দেয়ার মধ্যে আন্তরিকতা প্রকাশ পেতো। সংগঠনের কোন অবস্থানে আছেন খবর নিতেন, কিছু উপদেশ দিতেন যা মনে রাখার মত। এ ব্যাপারে সিলেটের মুতলিব ভাইয়ের একটি পুস্তিকার কথা মনে পড়লো। তিনি তখন জেলা আমীর ছিলেন। পুস্তিকার নাম "একটু খানি মিষ্টি হাসি"। দায়িত্বশীলদের একটুখানি হাসি যে কত দামী তা বুঝাতে চেয়েছেন। আল্লাহ আমাদের মধ্যে এসব গুনাবলী ফয়দা করে দাও।

দাওয়াতী কাজের ব্যাপকতা :

আমীরে জামায়াত মকবুল আহমাদ দ্বীনের বিজয়কে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কথাবার্তায়, চালচলনে ইসলামের বাস্তব নমুনা ফুটে উঠত। বক্তব্যের মধ্যে ইসলামের পজেটিভ দাওয়াতই বেশী ছিল। বক্তব্যের মধ্যে ছিল দৃঢ়তা। হক ও বাতিলের প্রার্থক্য দ্বার্থ্যহীনভাবে তুলে ধরতেন। সাথে রেখে বই বিলি ও বিক্রি করতেন। তাঁর একটা ডাইরী ছিল, যেখানে অনেক নাম ঠিকানা লিখা ছিল। যেখানে সফরে যেতেন সেই এলাকার পুরাতন দায়িত্বশীল যারা মারা গেছেন অথবা অসুস্থ অবস্থায় আছেন তাদের খোঁজ খবর নিতেন, পারিবারিক অবস্থা কেমন জানতে চাইতেন সময় থাকলে বাড়ীতে যেতেন অথবা বলতেন আমিতো আরো একদিন থাকবো পারলে একটু খবর দিও, দেখা হলে আমি খুশি হবো। ছোট-খাটো ব্যাপারেও তিনি সমাধানের চেষ্টা করতেন। সুন্দর পরামর্শ দিতেন। কোন সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে গেলে এলাকার দায়িত্বশীলকে জানাতেন, আপনার এলাকার অমুক এই অসুবিধায় আছে পারলে একটু দেখবেন। অনেক বিষয়ে আমাকে বলতেন এ ব্যাপারটা একটু দেখিও। কোন কাজই তাঁর কাছে ছোট ছিল না। এমন দরদী মানুষ বিরল।

আল্লাহর রাসূল (স) বলেন- "মানুষের মধ্যে সেই উত্তম যে মানুষের কল্যাণ করে।"

ক) কাজের মধ্যে শিখিয়ে দিতেন। একদিন ফেনীতে সফরে আমি আরো একজনসহ আসবো, গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছি, গাড়ী আসছে না। তাই আমরা দুজনই ফেরেশানি অনুভব করছি কতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তিনি আমাদের অবস্থা দেখে মুচকি হেসে বললেন- 'গাড়ী যখন আসার

তখনই আসবে অপেক্ষা কর।' তিনি বুঝিয়ে দিলেন, সবই আল্লাহ তা'য়ালা নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাই তাওয়াক্কুল সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপরই করতে হবে।

খ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বিয়ের জন্য পাত্রী দেখছেন। অনেকদিন পাত্রী পছন্দ হচ্ছে না। তিনি এবং আমিও অনেক চেষ্টা করলাম। একদিন আমাকে ডেকে বললেন, আহছান একটা কাজ কর তাকে বল নিজের হাতে একটা বউ বানাতে তার পছন্দমত, তারপর আল্লাহর কাছে দোয়া করতে আল্লাহ তুমি এর মধ্যে জীবন দাও এবং তার সাথে আমার বিয়ে ব্যবস্থা কর। আমি হবু বরকে ডেকে কথাটা হুবহু বললাম, বেশী দেরি হয় নাই অল্প সময়ের মধ্যে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন।

গ) অসহায় মানুষের সাহায্যে সবসময় চেষ্টা করতেন। তিনি আমাকে এবং আমার আরেক ক্লাসমেট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক আবদুল জাব্বার ভাই এখন কানাডা আছেন "ফেনী ছাত্র কল্যাণ ফান্ড" নামে একটি ফান্ড গঠন করে কাজ করার পরামর্শ দিলেন। এইভাবে আমরা কাজ করে মেধাবী ছাত্রদের সহযোগীতা করেছিলাম। সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে ছাত্র জীবন শেষ হলে কর্ম জীবনে তারা আমাদের এই ফান্ডের সাথে যুক্ত হবেন, সহযোগীতা করবেন। ফলে আমরা আরো বেশী শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতে পারবো। এই কাজে আমরা বেশ সফলতা অর্জন করেছিলাম।

সমাজ সেবার অনেক কাজের সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অনেক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করে অবদান রেখেছেন। মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) আমাকে যেন পরিবারের সদস্য করে নিয়েছিলেন। তিনি আমার রুকনীয়াতের কেন্দ্রীয় সাক্ষাতকার নিয়েছেন। আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম উপস্থিত ছিলেন। আমার মেঝো ছেলের নাম রেখেছিলেন তিনি, আমার বাসার টিএন্ডটি নাম্বারে ফোন করে খবর নিতেন, আমার স্ত্রীকে বৌমা বলে সম্বোধন করতেন। ঢাকাতে আমার পারিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।

সাংগঠনিক জীবনে একটা বিষয় আমার স্মরণীয় হয়ে আছে। কুমিল্লা শহরের টমচম ব্রিজের নিকটে জেলা জামায়াতের অফিস ছিল। পাশে একটা মসজিদ এবং একটা পুকুরও ছিল। সাংগঠনিক বৈঠকে শ্রদ্ধেয় মকবুল আহমাদ (রহ.) প্রধান অতিথি ছিলেন। তখনো সকল জেলায় এমারত কায়েম হয়নি। যে সব জেলায় এমারত হয়নি সেইসব জেলার দায়িত্বশীলকে সভাপতি বলা হতো। আলোচনার একটি বিষয় ছিল যেসব জেলায় এমারত নেই সেব জেলায় সভাপতির পরিবর্তে অন্য শব্দ বলা যায় কিনা? আলোচনার এক পর্যায়ে আমি বললাম 'সভাপতির' পরিবর্তে 'সংগঠক' বলা যেতে পারে। জামায়াত সভাপতির বদলে 'সংগঠক' লিখার সিদ্ধান্ত নেয়। এ বিষয়টি

আমাকে এতখানি উৎসাহিত করেছে যা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ খায়ের দান করুন।

সাংগঠনিক জীবনে দুইজন সাবেক আমীরে জামায়াত আমাকে নাম ধরে ডাকতেন শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এবং মরহুম মকবুল আহমাদ। মায়াময়, স্নেহভরা আহছান বলে ডাকার আর কেউ রইলনা। আল্লাহ ছোবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তোমার এ বান্দাদেরকে তোমার জান্নাতের আ'লা দরজা দান কর।

আমীরে জামায়াত মকবুল আহমাদ (রহ.) এর জীবনের শেষ দিনগুলো কেটেছে ইবনেসিনা হাসপাতালে। ডিউটি ডাক্তার মহান নেতার ব্যাপারে নয়াদিগন্তে বক্তব্যে কিছু কথা বলেছিলেন- ডাঃ বলেছেন, 'হাসপাতালে আসার পূর্বে আমি তাঁকে ছিনতাম না। রোগী হিসেবে দেখভাল করার দায়িত্ব আমার উপর ছিল। উনাকে দেখেই শ্রদ্ধায় আমার অন্তর ভরে যায়।' কয়েকদিন ডিউটি ডাক্তার হিসেবে দায়িত্ব পালনে যখনই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি, 'আপনি কেমন আছেন, জবাব দিতেন আমি ভাল আছি।' 'কোন অসুবিধা আছে কিনা- জিজ্ঞেস করলে বলতেন আমি ভাল আছি। বেশীরভাগ সময় সোফায় হেলান দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে বসে আছেন। একবারও বলেননি আমার অসুবিধা হচ্ছে। তিনি ছিলেন স্বাভাবিক, নেই কোন অস্থিরতা, কষ্টের চিহ্ন।

আমার মনে হলো মকবুল আহমাদ (রহ.) আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাক আসবে আর লাব্বায়েক বলে হাজির হবেন। ১৩ এপ্রিল ২০২১, দুপুর ১টায় তিনি ইন্তেকাল করেন। "নিশ্চয় যারা এই মর্মে ঘোষণা করে যে, আল্লাহই আমার রব, অত:পর এই ঘোষণার উপর সুদৃঢ় অবস্থান করে, নিশ্চিতভাবে তাদের উপর নাজিল হয় ফেরেশতাগণ, তাদেরকে সান্তনার বাণী শুনিয়ে বলে- ভয় কর না, চিন্তা কর না, শুভসংবাদ গ্রহণ কর সেই জান্নাতের, যার ওয়াদা দেয়া হয়েছে তোমাদেরকে। আমরা তোমাদের সাথী, এই দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতেরও। সেইখানে তোমরা যা চাইবে তাই পাবে। আর যা কিছু তোমরা কামনা করবে সবই তোমাদের হয়ে যাবে। আর এ সবই তোমরা পাবে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে বিশেষ মেহমানদারীর সামগ্রী হিসেবে।" (সুরা আল ফুচ্ছিলাত ২৬-৩২)।

হে আল্লাহ আমাদের মৃত্যুর ফেরেশতা, মালাকুল মাউত যখন আমাদের শিয়রে উপস্থিত হবে তোমার ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তোমার জান্নাতের ঘোষণা শুনতে শুনতে যেন তোমার কাছে পৌছতে পারি এই তৌফিক আমাদের দান কর। আমীন।

লেখক: কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা ও কর্মপরিষদ সদস্য, সাবেক চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আমীর।

দুঃসময়ের কান্ডারী

আজীবনের এই দা'য়ী ইলাল্লাহ জামায়াতে ইসলামীর কঠিনতম সময়ের কান্ডারী আমাদের জন্য রেখে গেলেন অনেক শিক্ষা এবং উদাহরণ। রাব্বুল আলামীন তার এই গোলামের তামাম জিন্দেগীর সমস্ত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে নেকিতে পরিণত করে দিন। তার নেক আমলগুলো কবুল করুন, শহীদ হিসেবে কবুল করে তাকে সম্মানিত করুন।

এহসানুল মাহবুব জোবায়ের

১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর কাজ পুনরায় শুরু হলে জনাব মকবুল আহমাদ কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি সহকারী সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ইসলামী আন্দোলনের পতাকাবাহী জাতীয় পত্রিকা দৈনিক সংগ্রামের মালিকানা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান ছিলেন ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত।

২০০৪ সাল থেকে তিনি কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীরের দায়িত্ব পালন করেছেন। একইসাথে ২০০৪ সাল থেকে তিনি বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউটের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। (বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ইসলামী সাহিত্য প্রকাশের প্রতিষ্ঠান আধুনিক প্রকাশনী বি.আই. ট্রাস্টের একটি প্রতিষ্ঠান।)

২০১০ সালের জুনে জামায়াতের তৎকালীন আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে মকবুল আহমাদ ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৬ সালের ১৭ অক্টোবর থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর তৃতীয় আমীর হিসেবে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন শুরু করার ক্ষেত্রে যে কয়জন তাদের মেধা ও শ্রম সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করেছেন মকবুল আহমাদ তাদের অন্যতম।

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে মকবুল আহমাদের ভূমিকা উল্লেখ করার মত। সংগঠনকে তৃণমূল পর্যন্ত পৌঁছানো ও সুস্থ সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি অবিশ্রান্তভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

আল্লাহ তাআলা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন। তিনি অনাগত ভবিষ্যতের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। দেশের জনগণ তাকে আজীবন স্মরণ রাখবে। ইসলামী আন্দোলনের জন্য তিনি যে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন তার জন্য শতাব্দী থেকে শতাব্দী তার জন্য দোয়া করতে থাকবে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা।

সারাজীবন ইসলামী আন্দোলনের জন্য জীবন উৎসর্গ করার শপথ করেছেন, সবসময় শহীদি মৃত্যু কামনা করেছেন, সেই মৃত্যু আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করেছেন হাসপাতালের বিছানায়, মহামারী আক্রান্ত হয়ে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮২ বছর।

আজীবনের এই দা'য়ী ইলাল্লাহ জামায়াতে ইসলামীর কঠিনতম সময়ের কান্ডারী আমাদের জন্য রেখে গেলেন অনেক শিক্ষা এবং উদাহরণ। রাব্বুল আলামীন তার এই গোলামের তামাম জিন্দেগীর সমস্ত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে নেকিতে পরিণত করে দিন। তার নেক আমলগুলো কবুল করুন, শহীদ হিসেবে কবুল করে তাকে সম্মানিত করুন। মহান রবের কাছে আবেগ ও বুকভরা এ আকুতি"।'

মহান মা'বুদের দরবারে কায়মনোবাক্যে ফরিয়াদ জানাই আমরা যতটুকু আমাদের এই মুরুব্বীর কাছাকাছি ছিলাম সাহচর্য পেয়েছিলাম তার অসমাপ্ত কাজ আমরা এগিয়ে নিতে পারি। হে আরশের মালিক তোমার এই মোখলেস বান্দাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমাদের জান্নাতে একত্রিত হওয়ার তাওফিক দিন। আমীন।

লেখক- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

একজন নিরলস একনিষ্ঠ সার্বক্ষণিক দা'য়ীর কথা

জীবনের শেষ দিকটায় হঠাৎ করে মরহুমের শরীর বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমার যতদুর মনে পড়ে তাঁকে সব সময় সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী একজন মানুষ হিসেবেই দেখেছি। কিন্তু: দেশে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সরকারী দমন-পীড়নের কারণে শেষ কটি বছর এক ধরনের গৃহবন্দী জীবন যাপন করতে হয়েছে।

আ.জ.ম ওবায়দুল্লাহ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর জন নন্দিত নেতা ও ব্যক্তি জনাব মকবুল আহমদ (জন্ম ২ আগস্ট ১৯৩৯ মৃত্যু ১৩ এপ্রিল ২০২১) একটি উজ্জ্বল নাম ও একজন অহংকারহীন মাটির মানুষ।

তিনি ১৭ অক্টোবর ২০১৬ থেকে ছয় বছর দেশের বৃহত্তম ইসলামী দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচিত আমীর হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত থেকে ধৈর্য, সাহস, দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার সাথে একটি কঠিন সময়ে সংগঠনের নেতৃত্ব দেন।

কেন্দ্রীয় আমীর নির্বাচিত হওয়ার আগে তিনি ২০১৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। তারও আগে তিনি জামায়াতের নায়েবে আমীর, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল, সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। জনাব মকবুল আহমাদ একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে চট্টগ্রাম বিভাগ জামায়াতে ইসলামীর কাজকে সুসংহত করেন। তিনি দীর্ঘদিন ফেনী জেলা সংগঠনের দায়িত্বেও ছিলেন।

তিনি নিজ জেলা ফেনীতে একজন স্বনামধন্য শিক্ষক হিসেবে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি জামায়াতের ইসলামীর কর্মী হিসেবে তিনি ধীরে ধীরে বিকশিত হন। তাঁর নিজ এলাকা ৩নং পূর্বচন্দ্রপুর ইউনিয়নের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সবাই তাঁকে সজ্জন, সদালাপী হিসেবে সম্মান করতেন।

অন্য ধর্মাবলম্বীগণও এই মহৎপ্রাণ মানুষটিকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন। কারো কোন ক্ষতি তিনি করেছেন এমন কোন কলঙ্ক তাঁর জীবনে লাগেনি।

জনাব মকবুল আহমাদ ফেনীর স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান আঞ্জুমানে ফালাহিল মুসলেমিন ট্রাষ্ট কায়েম করেন। এ ট্রাষ্টের অধীনে গড়ে ওঠে বৃহত্তর নোয়াখালীর অন্যতম আলেম তৈরীর কারখানা "ফালাহিয়া মাদরাসা"। এছাড়া তিনি দীর্ঘ সময় ফেনীর অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "শাহীন একাডেমী" এর প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান ফেনী ইসলামিক সোসাইটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

ব্যক্তিগত পরিচিতি:

১৯৭৪ সাল। আমি তখন চট্টগ্রাম মুসলিম হাইস্কুলে ক্লাস এইটে পড়ি। হোস্টেলে থাকি। জুমাবার ও ছুটির দিন সাধারণত আমি বাসায় থাকতাম। এমনি এক ছুটির দিনে আমাদের বাসায় একজন মেহমান এলেন। সুদর্শন একহারা শরীরের বেশ উজ্জ্বল একজন মানুষ। আগে থেকে বলা ছিলনা উনি আসবেন। হঠাৎ এসে বাসায় বসে তিনি আমার পিতার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন। অবশেষে উপস্থিত ক্ষেত্রে যা ছিল তা দিয়েই তিনি খাবার খেলেন। এরপর তিনি আমাকে একটু নসিহত করে বিদায় হলেন।

পরে আব্বার কাছ থেকে উনার পরিচিতি জানলাম। খুব ভাল লাগছিলো এমন একজন অমায়িক ও মিশুক মানুষকে জানতে পেরে। পরে জেনেছিলাম উনার হাতেই আমার পিতার রুকনিয়াতের শপথ হয়। এতে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আরো বেড়ে যায়। এরপর বিভিন্ন সময়ে উনার সাথে দেখা সাক্ষাত হতে থাকে।

১৯৮৬ সালে আমি ঢাকা চলে গেলাম সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের কারণে। আমার বেশ ক'বছর দায়িত্ব ছিল শিশু সংগঠনের। আমাদের দায়িত্বশীলদের ছেলেদের নিয়ে একটা বিশেষ আসর গড়ে তোলা হয়, যেখানে জনাব মকবুল আহমাদ তার নোমানকেও জড়িয়ে দেন।

এরপরতো ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনকালে প্রায়শ: উনার সাথে কথা হতো। এ সময়ে সাক্ষাতে প্রায়ই তিনি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সাংগঠনিক খোঁজ-খবর নিতেন। যতবারই দেখা হতো- জিজ্ঞেস করতেন তোমার আব্বা মোজাম্মেল সাহেব "কেমন আছেন?"

এভাবে ১৯৭৪ থেকে ২০২১ পর্যন্ত তাঁর একান্ত স্নেহধন্য একজন নগণ্য কর্মী হিসেবে তাঁর ভালবাসা ও স্নেহের উত্তাপ অনুভব করেছি। বিশেষ করে ২০১৫ থেকে উনার এমারতের শেষদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কিছু দায়িত্বের সাথে যুক্ত থাকায় অনেকবার উনার সাথে সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারের সুযোগ হয়। তিনি কোন দায়িত্ব দিলে নিজ থেকেই তার খোঁজ-খবর নিতেন। মনিটরিং করতেন।

একজন নিরলস দায়ী :

প্রথমত তিনি একজন একনিষ্ঠ দায়ী, দ্বিতীয়ত: তিনি একজন সচেতন দায়ী, তৃতীয়ত: তিনি একজন নিরলস দায়ী, শেষ পর্যন্ত তিনি একজন সার্বক্ষণিক দায়ী। তার কথা মনে পড়লেই একজন দায়ীর হাস্যোজ্জ্বল চেহারাখানি ভেসে উঠে।

১৯৯০ এর দশকের কথা। একটি বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে উনার সহযোগিতা নিতে গেলাম। ফেনী দাগনভূঁইয়ার কৃতি পরিবারের একটি শিপিং লাইন্স ছিলো তাদের বিজ্ঞাপন পাওয়ার আশায়। উনি পাঠালেন ঐ শিপিং লাইনসের একজন বেশ বড় কর্তা ব্যক্তির কাছে। সাথে দু'টি বই দিলেন ভদ্র লোকের নাম লিখে। আমরা বিজ্ঞাপন পেলাম আর মকবুল আহমাদ সাহেব দায়ীর সাওয়াবও পেলেন।

যখনই উনি কোন এলাকায় সফরে যেতেন তখন ঐ এলাকায় উনার পরিচিত আত্মীয়-স্বজনের একটা তালিকা করে নিতেন। সফরের মধ্যেই একটা সময় বরাদ্ধ করে তাদের সাথে দেখা করে আসতেন। সম্ভব হলে সুধী সমাবেশ বা সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করাতেন, কমপক্ষে তাদের হাতে কিছু বই তুলে দিতেন। এর ব্যতিক্রম হতে অনন্ত: আমি দেখিনি কখনো।

তাঁর দাওয়াতী কাজের আরো একটি দিক ছিলো ডায়াবেটিস জনিত কারণে তিনি দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর একটানা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতেন, খুব পরিমিত খাবার গ্রহণ করতেন আর সকালবেলা রুটিন করে হাটতেন। উনার এসব হাটার সঙ্গীদের মাঝেও তিনি পরিকল্পিত দাওয়াতী কাজ করতেন।

সম্ভবত: ২০১৪ সালের কথা :

তিনি আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ডাকলেন। কথাবার্তা শেষে আমি উঠে আসবো এমন সময় তিনি বললেন, দেখোতো এই বইগুলো পড়েছো কিনা। ইনি বেশ সহজ সরল করে বই লিখেন। বলে আমাকে মাসুদা সুলতানা রুমি আপার লেখা চারটি বইয়ের দুই কপি করে দিলেন। বললেন- এটি তোমার জন্য হাদিয়া দাওয়াতী কাজে লাগবে আশা করি।

এভাবে যখন যেখানে সুযোগ পেতেন দাওয়াতী কাজ করার সুযোগ হাত ছাড়া করতেন না তিনি। পরিচিত অপরিচিত সকলের কাছে সত্য দ্বীনের দাওয়াত পৌছানো ছিল এই দা'য়ীর এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

চলে গেলেন তিনি :

জীবনের শেষ দিকটায় হঠাৎ করে মরহুমের শরীর বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমার যতদূর মনে পড়ে তাঁকে সব সময় সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী একজন মানুষ হিসেবেই দেখেছি। কিন্তু: দেশে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সরকারী দমন-পীড়নের কারণে শেষ কটি বছর এক ধরনের গৃহবন্দী জীবন যাপন

করতে হয়েছে। সকাল বা রাতে রুটিন করে হাটা বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় শরীর আগের মতো সুস্থ্য থাকে না।

তিনি ২০২১ এর শুরুর দিক থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তীব্র অসুস্থতাসহ তাঁকে ভর্তি করানো হয় ইবনে সিনা হসপিটাল ও মেডিকেল কলেজের আই. সি.ইউতে। সেখানে বেশ কিছুদিন অসুস্থতায় কাতর থেকে ১৩ এপ্রিল তিনি মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে যান। আমরা দ্রুত খবর পেয়ে গেলাম তাঁর ইন্তেকালের। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন।)

চট্টগ্রাম থেকে আমরা কয়েকজন রওয়ানা করলাম রাত ৯টায় অনুষ্ঠিতব্য জানাজায় শরিক হওয়ার জন্য উনার গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে। আমি, শাহজাহান চৌধুরী ভাইসহ যারা গেলাম তদের একটু বিলম্ব হলো পথে জ্যামের কারণে। উনার বাড়ির কাছে একটি ধান ক্ষেত তখন বিশাল মাঠের মতো দেখাচ্ছিলো । এখানেই বিশাল জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। কমপক্ষে দশ হাজার লোকের সমাবেশ। আমীরে জামায়াত ডা: শফিকুর রহমান জানাজার ইমামতি করেন এবং এক হৃদয়কাড়া বক্তব্য প্রদান করেন।

অত:পর নিজ বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর চেহারা দেখে অভিভূত হয়ে ছিলাম যেন হাস্যময় একজন মানুষ রাব্বে কারীমের দিদার লাভের জন্য ছুটছিল।

এমন এক মহান মানুষের জন্যই হয়তো কবি লিখেছেন-

"এমন জীবন হবে করিতে গঠন
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভূবন।"

ফোনে আমার পিতাকে খবরটি জানানোর সাথে সাথে তিনি শিশুর মতো চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। মহৎ মানুষরা এভাবেই মানুষের হৃদয় মাঝে বেঁচে থাকেন।

আল্লাহ তায়ালা মকবুল আহমাদ সাহেবকে মাফ করে দিন, জানাতুল ফেরদাউস নসিব করুন। আমীন।

লেখক : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম মহানগরীর নায়েবে আমীর ও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি।

মকবুল আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ আমাদের প্রেরণা

ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার, দা'য়ী ইলাল্লাহ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর মরহুম মকবুল আহমাদ গত ১৩ এপ্রিল ২০২১, মঙ্গলবার দুপুর ১.০০ টার দিকে ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন...। ইসলামী আন্দোলনের এক কঠিন সময়ে তিনি কান্ডারীর দায়িত্ব পালন করেন। বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী নিবেদিত প্রাণ এই দ্বীনের দা'য়ী শিক্ষকতার মাধ্যমে জীবন শুরু করেন। যোগ দেন সাংবাদিকতায়। তাঁর জীবন ছিল নিষ্কলুষ এবং পরিচ্ছন্ন। তাঁর গায়ে সাদা পাঞ্জাবির মতই ছিলো চারিত্রিক ভূষণ।

মরহুম মকবুল আহমাদ সাহেব একজন বর্ণাঢ্য কিংবদন্তী রাজনীতিবিদ। তার থেকে বড় পরিচয় একজন সজ্জন, পরোপকারী, বিনয়ী, সদালাপী, নিরঅহংকারী, সবরকারী, আত্মপ্রত্যয়ী, পরম আল্লাহ নির্ভরশীল মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন, সত্যের পথে অটল-অবিচল। কুরআনের ভাষায় "আশিদ্দায়ু আলাল কুফ্ফার রুহামাউ বাইনাহুম" এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি ছিলেন অসম্ভব সাহসী দূর্জয়ী। বৃদ্ধ বয়সে এই ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী জালিম সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে মিথ্যা সাজানো নাশকতার মামলায়। তিনি দীর্ঘদিন কারাবরণ করেছেন, নির্যাতিত হয়েছেন কিন্তু দ্বীনের এই রাহবার ছিলেন অটল ও মজবুত।

মরহুম মকবুল আহমাদ সাহেব একজন বর্ণাঢ্য কিংবদন্তী রাজনীতিবিদ। তার থেকে বড় পরিচয় একজন সজ্জন, পরোপকারী, বিনয়ী, সদালাপী, নিরঅহংকারী, সবরকারী, আত্মপ্রত্যয়ী, পরম আল্লাহ নির্ভরশীল মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন, সত্যের পথে অটল-অবিচল। কুরআনের ভাষায় "আশিদ্দায়ু আলাল কুফ্ফার রুহামাউ বাইনাহুম" এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি ছিলেন অসম্ভব সাহসী দুর্জয়ী।

এই নিবেদিত প্রাণ দা'য়ীর অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো তিনি সবার মাঝে দাওয়াতী বই বিতরণ করতেন। রিমান্ড শেষে উনাকে যখন আদালতে আনা হলো, জানতে চাওয়া হলো স্যার আপনাকে রিমান্ডে কি জিজ্ঞাবাদ করেছে? তিনি হেসে বললেন তারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে আমিও তাদের জিজ্ঞাসা করেছি। আমি পুলিশ অফিসারদের বলেছি আপনারাতো মুসলমান। আপনারা নামাজ পড়েন? কুরআন শরীফ পড়তে জানেন? আপনার বিবি পর্দা করেন? সন্তানেরা কুরআন পড়তে জানে? তারা অবাক হয়ে বলেছে, স্যার আমাদের আর কেউ এভাবে কোনদিন বলেনি! আমি বলেছি আপনারা কুরআন-হাদিস পড়ার চেষ্টা করবেন। আবাক করার বিষয় এ কঠিন সময়েও তিনি দাওয়াত দিতে ভুলে যাননি।

মরহুম মকবুল আহমাদ ছিলেন সকলের কাছে একজন অবিভাবক। তিনি সবার খবর রাখতেন। আমার মেয়ে মারিয়ামের অসুস্থতার খবরে তিনি অনেক বেশী দো'য়া করতেন। সাক্ষাতে অথবা ফোনে কথা হলে তিনি তার নাম ধরে বলতেন। আমাদের উপদেশ দিয়ে বলতেন মারিয়াম নাম কুরআনে বর্ণিত নাম, সবর করো। তিনি নতুন পরিচয় হওয়া ব্যক্তিদের ফোন নাম্বার কলেকশন করে ডায়েরীতে লিখে রাখতেন এবং বিভিন্ন সময় তাদের খোঁজ-খবর নিতেন।

আলহামদুলিল্লাহ,পরিবারকে তিনি ইসলামী আন্দোলনের পথে গড়ে তুলেছেন। সন্তানদের আন্দোলনে অগ্রসর করানোর ব্যাপারে পেরেশান ছিলেন। আমাদের সাথে সাক্ষাত হলেই উনার ছেলেদের এগিয়ে নিতে আমাদের বলতেন। তিনি ছিলেন অসম্ভব জ্ঞানপিপাসু। কোন নতুন বই প্রকাশ হলেই তিনি তা সংগ্রহ করতেন। উনার লেখা প্রকাশিত একটি বইতে সামান্য কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এখনো একটি পান্ডুলিপি আছে। ইনশাআল্লাহ তাও সময়মত প্রকাশিত হবে।

২০১০ সালের জুনে জামায়াতের তৎকালীন আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে মকবুল আহমাদ ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৬ সালের ১৭ অক্টোবর থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর তৃতীয় আমীর হিসেবে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন শুরু করার ক্ষেত্রে যে কয়জন তাদের মেধা ও শ্রম সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করেছেন মকবুল আহমাদ তাদের অন্যতম। জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে মকবুল আহমাদের ভূমিকা উল্লেখ করার মত। সংগঠনকে তৃণমূল পর্যন্ত পৌঁছানো ও সুস্থ সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি অবিশ্রান্তভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকান্ড ঃ ছাত্র জীবন থেকেই তিনি সমাজ সেবামূলক কাজের সাথেও জড়িত রয়েছেন। নিজ গ্রামের যুবকদের নিয়ে ১৯৬২ সালে "ওমরাবাদ পল্লী মঙ্গল সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন এবং দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত এ সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এলাকার রাস্তাঘাট, পুল ও সাঁকো সংস্কার নির্মাণে এবং দরিদ্র লোকদের সাহায্য-সহযোগিতাকল্পে এ সমিতির সভাপতি হিসেবে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন।

তিনি ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত "গজারিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার" ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৬ ও ৭৯ সালে তিনি "রাবেতা আলম আল ইসলামীর" মেহমান হিসাবে দু'বার পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন এবং জাপান ইসলামী সেন্টারের দাওয়াতে জাপান সফর করেন।

১৯৮৪ সালে তিনি ঢাকায় অবস্থিত জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান "ফালাহ-ই-আম ট্রাস্টের" চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। অদ্যবধি এ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তিনি ১৯৮৪ সাল থেকে স্থানীয় " আঞ্জুমানে ফালাহিল মুসলিমীন ট্রাস্ট" ও "ফেনী ইসলামিক সোসাইটির" সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

সিরাজুম মুনিরা ট্রাস্টের উদ্যোগেই সিলোনিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদ ও "উম্মুল মোমেনীন আয়েশা মহিলা মাদ্রাসা" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফেনী ইসলামিক সোসাইটির উদ্যোগে বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফেনী শাহীন একাডেমী (স্কুল এন্ড কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি ফেনী আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া ট্রাস্টের সদস্য এবং দাগনভূঞা সিরাজুম মুনিরা ট্রাস্টেরও সভাপতি। এর উদ্যোগে একটি এতিমখানা ও হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফালাহিয়া ট্রাস্টের উদ্যোগেই ফালাহিয়া কামিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফেনী জিলার মধ্যে প্রথম মানের মাদরাসা হিসাবে এ মাদরাসা বেশ সুনাম অর্জন করেছে।

সাহিত্যকর্ম ও দেশভ্রমণ: রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামীর মেহমান হিসাবে তিনি ২ বার হজ্জ পালন করেন। তিনি জাপান ও কুয়েত (সাংগঠনিক প্রয়োজনে) সফর করেন। সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় "জাপান সফর- দেখার অনেক, শিখার অনেক" এ বিষয় তার সফর অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি এবং আল্লাহর সাহায্যে ও উপযুক্ততা অর্জন, মোট ২টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

এই প্রিয় নেতার ইন্তিকালে আমাদের রাজনৈতিক সহযোদ্ধারাও বিবৃতি দেয়ার সাহসটুকু দেখাতে পারেনি। যেমনি পারেনি সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম (রহ:) মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রাহ:) ক্ষেত্রেও। আমাদের রাজনৈতিক অসৌজন্যতা কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে তা সহজে অনুমেয়।

অথচ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও ফেনীর সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল হাজারী গত ১৫ এপ্রিল তিনি তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ থেকে লাইভে এসে বলেন- "বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর মরহুম মকবুল আহমাদ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কোনো ক্ষতিকর ভূমিকায় ছিলেন না। তিনি মকবুল আহমাদের প্রশংসা ও তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। যা পরে হাজারিকা প্রতিদিন নিউজ বুলেটিন-ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হয়।

জয়নাল হাজারী বলেন, 'মকবুল আহমাদ আমাদের ফেনী অঞ্চলের ভদ্রলোক, ফেনীর কৃতি সন্তান ছিলেন। তিনি এক সময় জামায়াতে ইসলামীর প্রধান (আমীর) ছিলেন। মকবুল সাহেব ইন্তিকাল করেছেন। তার জানাজায়ও তার জনপ্রিয়তা প্রমাণ হয়েছে।' তিনি বলেন, 'তিনি ভদ্রলোক ছিলেন। মনে হয় জীবনে কারো সাথে কোনো দুর্ব্যবহার করেননি। পরহেজগার মানুষ ছিলেন। সৎ মানুষ ছিলেন। তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

তিনি আরো বলেন, 'যারা যেভাবেই নেন না কেন, আমি এই মানুষটাকে সৎ হিসেবেই বিবেচনা করি। এমনকি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও তিনি কোনো ক্ষতিকর ভূমিকায় ছিলেন না। তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগও ছিল না।' 'তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও কোনো মুক্তিযোদ্ধার বিরোধিতা করেননি। রাজাকারদের নেতৃত্ব দেননি। এরকমটাই শোনা গেছে, 'যোগ করেন জয়নাল হাজারী। এ সময় তিনি মকবুল আহমাদের সাথে ১৯৯৬ সালে নির্বাচনের কিছু স্মৃতি স্মরণ করেন। ওই নির্বাচনে মকবুল আহমাদও জয়নাল হাজারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। জয়নাল হাজারী বলেন, 'যাই হোক। এ লোকটা (মকবুল আহমাদ) ভালো ছিলেন। আল্লাহ তাকে বেহেশত নসিব করুন। তাকে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।' (নয়া দিগন্ত)

জনাব মকবুল আহমাদ এমপি, মন্ত্রী ছিলেন না, কিন্তু মানুষের কল্যাণে কাজ করছেন তার থেকে অনেক বেশি। আল্লাহর দ্বীনের এই মর্দে মুজাহিদ ইন্তিকালের কিছু সময় আগেও মানবতার কল্যাণে কত পেরেশান ছিলেন! কর্তব্যরত চিকিৎসক লিখেছেন-"তিনি এখানে জীবন-মৃত্যুর মাঝে বসেও অন্যদের খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। কিভাবে তার পরিচিত কিছু লোকের আয়ের ব্যবস্থা করে তাদের পরিবারের দূর্দশা দূর করা যায় সেই আকাঙ্খা। নিজের জন্য বা নিজের পরিবারের জন্য কোন আক্ষেপ নেই।

দিনে বেশ কয়েকবার তাকে ডাক্তার হিসেবে খুব কাছে থেকে দেখেছি প্রতিবারই মাথা নাড়িয়ে লেছেন, কোনো কষ্ট নাই। যেন প্রিয় রবের সাক্ষাতের ঘ্রাণ তার সব কষ্ট দূর করে দিয়েছে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন সেই আজীবনের কাঙ্খিত মূহূর্তের জন্য।

দুপুর ১২ টায় দেখেছি তখন তার জাগতিক অবস্থা ভয়াবহ খারাপ। সবাই বুঝতে পারছিলাম, আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি, বাকিটা

মহান আল্লাহর বিশেষ রহমতের অপেক্ষা। তখনও তিনি মাথা নাড়িয়ে বলছিলেন,আর কোনো কষ্ট নাই। এর কিছুক্ষণ পরই আল্লাহ্ তাকে কবুল করলেন।

আল্লাহ তা'আলা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন। তিনি অনাগত ভবিষ্যতের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। দেশের জনগণ তাকে আজীবন স্মরণ রাখবে। ইসলামী আন্দোলনের জন্য তিনি যে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন শতাব্দী থেকে শতাব্দী তার জন্য দোয়া করতে থাকবে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা।

সারাজীবন ইসলামী আন্দোলনের জন্য জীবন উৎসর্গ করার শপথ করেছেন, সবসময় শহীদি মৃত্যু কামনা করেছেন, সেই মৃত্যু আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করেছেন হাসপাতালের বিছানায়, মহামারী আক্রান্ত হয়ে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮২ বছর।

জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডাঃ শফিকুর রহমান দুপুরে দেয়া তাঁর ভেরিফাইড ফেসবুক পোস্টে বলেন, 'চলে গেলেন ইসলামী আন্দোলনের এক বর্ণালী মুজাহিদ সাবেক আমীরে জামায়াত জনাব মকবুল আহমাদ। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন...।

আজীবনের এই দা'য়ী ইলাল্লাহ জামায়াতে ইসলামীর কঠিনতম সময়ের কান্ডারী আমাদের জন্য রেখে গেলেন অনেক শিক্ষা এবং উদাহরণ। রাব্বুল আলামীন তার এই গোলামের তামাম জিন্দেগীর সমস্ত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে নেকিতে পরিণত করে দিন। তার নেক আমলগুলো কবুল করুন, শহীদ হিসেবে কবুল করে তাকে সম্মানিত করুন। মহান রবের কাছে আবেগ ও বুকভরা এ আকুতি"।'

মহান মা'বুদের দরবারে কায়মনোবাক্যে ফরিয়াদ জানাই আমরা যতটুকু আমাদের এই মুরুব্বীর কাছাকাছি ছিলাম সাহচর্য পেয়েছিলাম তার অসমাপ্ত কাজ আমরা এগিয়ে নিতে পারি। হে আরশের মালিক আপনার এই মোখলেস বান্দাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমাদের জান্নাতে একত্রিত হওয়ার তাওফিক দিন। আমীন।

লেখক: সহকারী সম্পাদক, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা ও সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ঢাকা মহানগরী উত্তর।

আপনার মৃত্যুকে করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'য়ালা আজ জীবনের চেয়ে দিপ্তমান। নিজেকে সবচেয়ে বেশী লুকিয়ে রাখতেন, প্রদর্শনেচ্ছার প্রতিযোগীতা থেকে ছিলেন অনেক দুরে। সেই আপনাকে মহান আল্লাহ প্রশংসা আর শ্রদ্ধার পিরামিডে আরোহন করিয়েছেন।

অধ্যাপক মফিজুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর জনাব মকবুল আহমাদ এর ইন্তেকালের খবরে হৃদয়ে এক তীব্র ব্যথা অনুভব করেছি। এক প্রিয়জন হারানোর বেদনায় আমি ভারাক্রান্ত, অশ্রুসিক্ত হয়েছি বারংবার। আর মনের অজান্তেই মনে পড়ছে বারবার একটি আয়াত-

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. وَادْخُلِي جَنَّتِي

হে প্রশান্ত আত্মা! চলো তোমার রবের দিকে, এমন অবস্থায় যে তুমি (নিজের শুভ পরিণতিতে) সন্তুষ্ট শামিল হয়ে যাও আমার (নেক) বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে। (সূরা ফজর- ২৭-৩০)

এই মহান মানুষটির সাথে আমার পরিচয় ১৯৮১ সালে। যখন আমি ইসলামী আন্দোলনে খুব ঘনিষ্ট হই। পরবর্তীতে অতীব ঘনিষ্টভাবে তাকে দেখার ও জানার সুযোগ আমার হয়েছে। দীর্ঘ ৪০ বৎসর সেই মহান ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক অটুট ছিল আমাদের মাঝে। এই ব্যক্তিটি ইসলামী আন্দোলনের থানা, মহকুমা থেকে জেলা এবং কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পর্যন্ত সকল দায়িত্ব পালনে ছিলেন সকল মানদন্ডে উত্তীর্ণ। সার্থক এক ব্যক্তি এবং ব্যক্তিত্ব।

ফেনী শহরের একজন হাইস্কুলের শিক্ষক! কোন সে যোগ্যতা! যার কারণে জামায়াতে ইসলামীর মত বিশ্বব্যাপী পরিচিত একটি ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় আমীর পর্যন্ত হয়েছেন। এটি মাঝে মাঝে আমাকে বিস্ময়ে বিমূঢ়

করে। একথা মির্মম সত্য যে তার আগেও যারা তার দায়িত্বশীল ছিলেন, জামায়াতে ইসলামীর আমীর ছিলেন সবাই ছিলেন খুব উঁচু মাপের। কিন্তু অতি সাধারণ চালচলন নিরহংকার, নির্লোভ, কঠিন আমানদারিতা, অমায়িক ব্যবহার, নিষ্কলুষ চরিত্র, ধৈর্য ও প্রজ্ঞা সর্বোপরি সাহস ও ত্যাগ জনাব মকবুল আহমাদকে সাধারণ হয়েও অসাধারণ করে তুলেছে।

সালাম হে বিপ্লবের রাহবার!

সারাজীবন তুমি শিক্ষক হয়ে ছিলে "মরণে তোমাকে দেখেছি তুমিই পাঠশালা, তুমিই আমাদের চেতনার বাতিঘর"। দ্বীনের এ কঠিন পিচ্ছিল পথে যেখানে নবীগণের রক্তে এই জমিন সিক্ত। ইমাম বোখারী (রহ.) বর্ণনা করেন একদিনে ৪৬ জন পর্যন্ত নবীকে শহীদ করা হয়েছে। সকালে ২৩ জন, বিকালে ২৩ জন।

ইসলামী আন্দোলনের পথ কি ভয়াল! কি কঠিন! একজন পয়গাম্বরের রক্তের সাথে সমস্ত মানবের রক্তের দরিয়ার তুলনা হতে পারে না। বিগত এক যুগ ধরে বাংলাদেশে যা চলছে তা বর্ণনা করলে বিশ্বকোষের বালাম রচিত হবে। সন্তান মায়ের জানাযায় যেতে পারেনি। শত শত শহীদ পরিবারের বৃদ্ধা মায়েদের আর বিধবা স্ত্রীর অশ্রু আর নির্যাতিতদের আর্তনাদ পবিত্র কোরআনের সেই কথাই জানান দিচ্ছে-

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ
وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

"হে আমার রব! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোন বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরী করে দাও।" (সূরা নিসা- ৭৫)

সেই গহীন অন্ধকারে আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব পালন যে কত কঠিন ব্যাপার। ২০১৬ সালে যখন তিনি জামায়াতের কেন্দ্রীয় আমীর হন তার পূর্বে আবদুল কাদের মোল্লা, কামারুজ্জামান, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মীর কাসেম আলী (রহ.) দের শাহাদাতের ঘটনা ঘটেছে।

কি কঠিন সে দুর্দিন! ছিড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত! হ্যাঁ সদা হাস্য, পবিত্র চেহারার অধিকারী, ৪০ বৎসরের ডায়াবেটিস রোগী বীর কান্ডারী মকবুল আহমাদ সাহেব শূণ্য এই নদীতে জামায়াতে ইসলামীর কিস্তি টেনে টেনে নিয়েছেন।

আজ আমাকে স্মরণ করতে হচ্ছে, সেই বেদনার দিনগুলো! কর্মীদের মধ্যে

চলমান হতাশা, বেদনার বোবা কান্না, সমস্যার আছাড় খাওয়া তরঙ্গের মধ্যে তিনি এবং তার সাথীরা বর্তমানে আমীরে জামায়াত ডাক্তার শফিকুর রহমানসহ তাদের টীম টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া রাতের আধারে ক্লান্তিহীনভাবে সফর করেছেন। হতাশা-নিরাশায় লাখো লাখো মামলায় বিধ্বস্ত কর্মীদের সংগ্রামের চেতনা, ইসলামী জযবা ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে।

যুদ্ধাপরাধের কথিত মামলায় প্রায় সকল নেতৃবৃন্দকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। খুবই আশ্চার্য বিষয় যে, সমগ্র বাংলাদেশের একমাত্র ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের কথিত মামলা করেও সরকার প্রত্যাহার করেছিল। কোন সে কারণ, সেটা আমাকে অনেক সময় বিস্ময়ে বিমুঢ় করে। কিন্তু কাউকে কোনদিন জিজ্ঞাসা করিনি। একবার এক ফেসবুক লাইভে দেখেছিলাম, ফেনীর এক সময়ের ত্রাস জয়নাল হাজারী বলেছিলেন যুদ্ধাপরাধের কোন কালিমা জনাব মকবুল আহমাদের গায়ে লাগে নাই।

বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্টজনদের মাঝে একজন আমার বন্ধুর বড় ভাই মাস্টার কামাল সাহেব। যিনি একসময় মকবুল সাহেবের কলিগ ছিলেন। আমি মনোয়ার ভাইয়ের বাসায় কামাল সাহেবের সাথে একসাথে পিঠা খাচ্ছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, আপনাদের সংগঠনের মাঝে জনাব মকবুল সাহেব একজন ব্যতিক্রম ও ভালো মানুষ। উনার মত মানুষ হয়না। অথচ তিনি আওয়ামী লীগের জাদরেল নেতা। সকলের কাছে তিনি কিভাবে মকবুল হলেন সে প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেলাম তার জানাযায়। লাখো মানুষের স্রোতে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান বলেছিলেন, আমাকে মকবুল সাহেবের বিষয়ে তদন্ত রিপোর্ট দিতে বলা হয় আমাকে বলতে হয়েছিল এই মকবুল সাহেবের বিরুদ্ধে অত্র এলাকার কোন একজন নারী পুরুষ, জাতী ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কোন মানুষই তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দিতে পারেনি। এটা বিস্ময়ে অভিভূত হওয়ার মত বিষয়।

আল্লাহ পাকের শোকর গুজার করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি অসাধারণ চরিত্রের অধিকারী বিদায়ী জামায়াতের আমীর মকবুল সাহেবকে। আপনার মৃত্যুকে করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'য়ালা আজ জীবনের চেয়ে দিপ্তমান। নিজেকে সবচেয়ে বেশী লুকিয়ে রাখতেন, প্রদর্শনেচ্ছার প্রতিযোগীতা থেকে ছিলেন অনেক দুরে। সেই আপনাকে মহান আল্লাহ প্রশংসা আর শ্রদ্ধার পিরামিডে আরোহন করিয়েছেন।

আপনার জীবন দেওয়ার পর যেন আপনি আগের চেয়েও বলিষ্ঠ। সর্বজন শ্রদ্ধেয় আপনি শহীদ। রাসূল (স) বলেছিলেন "আল মাতয়ুনু শহীদুন" মহামারিতে মৃত ব্যক্তি শহীদ। আল্লাহ সে মর্যাদাও আপনাকে বখশিশ করেছেন। যে শাহাদাতের মৃত্যু জীবন থেকেও অনেক উচ্চ।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ
خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। তারা আসলে জীবিত। নিজেদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা লাভ করছে। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তাতেই তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত এবং যেসব ঈমানদার লোক তাদের পরে এ দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং এখনো সেখানে পৌছেনি, তাদের জন্যও কোন ভয় ও দু:খের কারণ নেই, একথা জেনে তারা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। (সূরা আলে ইমরান- ১৬৯, ১৭০)

শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন তিনি। যে পথে মকবুল আহমাদ সাহেব জীবন দিয়েছেন, সে পথই বিপ্লবীদের পথ। আল্লাহ যেন তার রেখে যাওয়া সাথীদের, তার স্ত্রী, পরিজন সবাইকে সবরে জামীল দান করেন। পরিশেষে প্রার্থনা করি মহান আল্লাহ যেন তাকে শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা দান করেন। আমীন॥

লেখক- বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সাবেক আমীর, বিশিষ্ট গবেষক, লেখক, ইসলামী বক্তা। বর্তমানে তিনি আওয়ামী জুলুমবাজ সরকারের হামলা মামলায় অতীষ্ট হয়ে লন্ডন প্রবাসী ইউটিউবে আল্লাহর দ্বীনের দা'য়ী।

অতুলনীয় মকবুল আহমাদ

এম আবদুল্লাহ

জামায়াতের ওপর যখন ভয়ানক নির্যাতন, নিপীড়ন ও জুলুম নেমে এসেছে তখন তিনি ভারপ্রাপ্ত ও পূর্ণ আমিরের দায়িত্ব পালন করেছেন। অনেকে তাঁর মত নরম-কোমল স্বভাবের মানুষের পক্ষে জামায়াতের মত এত বড় দলের গুরু দায়িত্ব পালন সম্ভব হবে কিনা সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রমাণ করেছেন- স্বভাবে সাদাসিদে বা কোমল হৃদয়ের হলেও দায়িত্ব পালন ও রাহবার হিসেবে ছিলেন দৃঢ়চেতা। সরকারের দু:শাসনের বিপরীতে সংগঠন ও দেশের জনগণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন তিনি।

সময়টা উনিশশ' সাতানব্বই থেকে আটানব্বইয়ের মধ্যে হবে। আমি তখন দৈনিক ইনকিলাবের সিনিয়র রিপোর্টার। একই সঙ্গে ঢাকায় কর্মরত ফেনীবাসী সাংবাদিকদের সংগঠন 'ফেনী সাংবাদিক ফোরাম- ঢাকা'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ফেনীর রাজনীতিক ও বিশিষ্টজনদের নিয়ে একটি প্রীতি সম্মেলন করবো। তাতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য যোগাযোগ করি জামায়াতের তৎকালীন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মকবুল আহমাদের সঙ্গে। মগবাজারস্থ জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হয়। যথাসময়ে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন অতি আপনজনের মতো। কুশল বিনিময়ের মধ্যেই আমার পারিবারিক ও পেশাগত সব পরিচয় ও তথ্য জেনে নেন। আব্বার নাম শুনে বলে উঠলেন- তুমিতো আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরপুত্র। এমনভাবে আপন করে নিলেন, যেন হঠাৎ সন্ধান মেলা তাঁর একান্ত আপনজন ও পরিবারের সদস্য। যে উদ্দেশে গিয়েছিলাম তা নিয়ে কথা হয়েছে কয়েক মিনিট। বাকি সময় তিনি তাঁর মত করে সাংগঠনিক দাওয়াত, সাংবাদিকতা পেশায় থেকে দ্বীনের জন্য কিভাবে ভূমিকা রাখা যায় তা নিয়ে হৃদয় নিংড়ানো দরদ ও ভালোবাসা দিয়ে পরামর্শ দিলেন। আপ্যায়ন করলেন। যোগাযোগ রাখতে বললেন এবং তিনিও রাখবেন বলে জানালেন।

ফেনী সাংবাদিক ফোরামের ওই প্রীতি সম্মেলনে মকবুল আহমাদ যোগ

দেননি বা দিতে পারেননি। কিন্তু অনুষ্ঠানের আগে ফোন করে বিনীত কণ্ঠে অপারগতার কথা জানিয়েছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন। ফেনীর জন্য ফোরামের কি কি করণীয় সে সম্পর্কেও কথা বলেছেন। সেই যে যোগসূত্র সৃষ্টি হয়েছিল তা তিনি রক্ষাই শুধু করেননি, দিনে দিনে সম্পর্ক সুদৃঢ় করেছেন সযতনে। আমাদের বাসার ঠিকানা নিয়েছিলেন প্রথম সাক্ষাতেই। তারপর টঙ্গীতে তাঁর এক ভাতিজার বাসায় যতবার বেড়াতে এসেছেন, প্রায় ততবার আমাদের বাসায়ও এসেছেন। ঢাকা থেকে রওয়ানা করার আগেই ফোন করতেন, আব্বা বাসায় থাকবেন কিনা। হ্যাঁ সূচক উত্তর পেলে চলে আসতেন। আব্বার সঙ্গে কিছু সময় কথা বলে চলে যেতেন। অহেতুক সময়ের অপচয় পছন্দ করতে না। এমনকি আপ্যায়নের সুযোগও তেমন একটা দিতেন না। আর আমার সঙ্গে ফোনে কিংবা সাক্ষাতে কথা হলেই বলতেন- জাগতিক দিক থেকেতো অনেক অগ্রসর হয়েছ, দ্বীনের কাজে কতটুকু? আমি বেশিরভাগ সময় নিরুত্তর থেকে অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইতাম। কিন্তু তিনি ঘুরে ফিরে আন্দোলনে সামিল হওয়ার দাওয়াত দিতেন, নছীহত করতেন। আমার ভাইয়েরা কে কোথায় আছে, কি করছে, আম্মা-আব্বার শারিরীক অবস্থা কেমন- এসব খবর নিতেন প্রায় এক নিঃশ্বাসে।

মরহুম মকবুল আহমাদের ধ্যান-জ্ঞান ছিল দ্বীন প্রতিষ্ঠায়। আপাদমস্তক দা'য়ী ছিলেন তিনি। তাঁর দাওয়াতের পরিভাষাও ছিল প্রায় অভিন্ন। নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব ছিল কথা-বার্তায়। বিভিন্ন সময়ে তিনি যে দাওয়াত দিতেন, নসীহত করতেন তার সারমর্ম ছিল এমন- সকল ক্ষেত্রে মানুষকে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে হবে, তাঁর হুকুমের বিপরীতে অন্য কারো হুকুমকে গুরুত্ব দেওয়া যাবে না, এটাই হচ্ছে ইকামতে দ্বীন বা দ্বীন কায়েম। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমন ঘটেছিল মূলত: এই ইকামতে দ্বীনের জন্য। ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সকল মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। ইসলামী শরিয়তের সকল বিধানই যে ইকামতে দ্বীনের আওতাভূক্ত তা ব্যাখ্যা করে তিনি বলতেন, দ্বীন কায়েম হলে সকল বিধানই কায়েম হবে, আর দ্বীন কায়েম না থাকলে দ্বীনের অধিকাংশ বিধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবেনা। সংক্ষেপে বলা যায়- ইকামতে দ্বীন মানে সমাজ জীবনে শরিয়তের সকল হুকুমের বাস্তব প্রতিফলন। আর শরিয়তের সকল হুকুম বাস্তবায়নই ইকামাতে দ্বীন। নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাতসহ সব ফরয বিধানের ক্ষেত্রে একাধিক শর্ত রয়েছে। যেমন মুসলিম হওয়া, বালেগ হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু ইকামতে দ্বীনের কাজ ফরয হওয়ার জন্য শর্ত মাত্র একটা, আর তা হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। ঈমান আনার পর প্রতিটি মানুষকে নিজের শক্তি, সম্পদ, চিন্তা-ফিকির, পরামর্শ কিংবা মৌন সমর্থন যেভাবেই হোক দ্বীন কায়েমের কাজ করতে হবে। এ কাজ যে যেখানে যেভাবে পারে, সে সেখানে সেভাবেই করবে।

জনহিতৈষী গণমানুষের নেতা মরহুম মকবুল আহমাদ ছিলেন একজন সত্যিকারের মুত্তাকী। সৎ, সাহসী ও প্রতিভাবান ও দূরদর্শী ছিলেন তিনি। কখনো কারও সঙ্গে বিরক্তি বা রূঢ় ভাষা ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয় না। একজন পরম ধৈর্যশীল, শান্ত-শিষ্ট, বিনয়ী-ভদ্র, উদার, পরোপকারী, নিরহংকার

ও নির্মোহ ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও মায়াবী অত্যুজ্জ্বল চেহারা দেখে যে কেউ তাকে শ্রদ্ধা করতে হতো। তাঁর সাংগঠনিক কর্মকান্ড আমাদের পক্ষে কাছে থেকে দেখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সাধারণের সঙ্গে তাঁর যে ব্যবহার, উষ্ণ আন্তরিক ভাব বিনিময় তা দেখে যে কেউ আকৃষ্ট হতেন। নিজ এলাকা দাগনভূইয়ায় তিনি কতটা জনপ্রিয় ছিলেন তা অনেকেই জানেন না। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত অনানুষ্ঠানিক সমঝোতা হয়েছিল কিছু আসনে। তার মধ্যে ফেনী- ২ আসনও ছিল। কিন্তু বিএনপি শেষ পর্যন্ত পর্দার আড়ালের অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারেনি। তা হলে একানব্বইয়ের পঞ্চম সংসদে তিনি এমপি থাকতেন। ওই নির্বাচনে তিনি ২২ হাজার ৬৭০ ভোট পেয়েছিলেন। বিএনপি প্রার্থীও জিততে পারেননি ভোট ভাগাভাগি হওয়ায়। এমপি হয়েছিলেন জয়নাল হাজারী। ওই নির্বাচন কাছে থেকে যারা দেখেছেন তারা মকবুল আহমাদের গণমুখী চরিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন।

জামায়াতের তৃতীয় আমীরের দায়িত্ব পালন করেন সাদা মনের সরলপ্রাণ ব্যক্তিত্ব মকবুল আহমাদ। পেশাগত কারণে জামায়াতের তিন জন আমীরের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ ছিল এবং ঘনিষ্ট হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। অধ্যাপক গোলাম আযম ও মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সঙ্গে সংবাদ সংগ্রহের কাজে দেশের কয়েকটি অঞ্চলে সফরের সুযোগও হয়েছিল। এই দু'জনের দীর্ঘ সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছি একাধিকবার। তিনজনের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত তুলনা করার যোগ্যতা আমি রাখি না। প্রত্যেকেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ছিলেন অতুলনীয়। কিন্তু মকবুল আহমদের মধ্যে অবশ্যই কিছুটা ব্যতিক্রমী কিছু গুন ছিল। তিনি আমীরের দায়িত্ব পান দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর সবচেয়ে কঠিনতম দিনগুলোতে। যে দিন তিনি আমীরের দায়িত্ব নেন, সেদিন জাতীয় প্রেস ক্লাবে অগ্রজ এক সাংবাদিক নেতা ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলেন- বিএনপি ও জামায়াতের দুই প্রধানইতো আপনার এলাকা ফেনীর, আপনারতো আর সমস্যা নেই। বেগম খালেদা জিয়া ও মকবুল আহমাদের কথা বলেছিলেন তিনি। আমি প্রথমবার যখন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব পদে নির্বাচন করার ঘোষণা দেই, তখন জামায়াত ঘরানার সাংবাদিক বন্ধুদের ভোট ও সমর্থন আদায়ের জন্য অনেকে আমাকে পরামর্শ দেন, যেন মকবুল আহমাদের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সমর্থন চাই। জবাবে তাদের বলেছিলাম, তিনি এমন নীতির মানুষ যে আমাকে সাফ বলে দেবেন, এসব বিষয় দেখার দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত আছে তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না।

জামায়াতের ওপর যখন ভয়ানক নির্যাতন, নিপীড়ন ও জুলুম নেমে এসেছে তখন তিনি ভারপ্রাপ্ত ও পূর্ণ আমিরের দায়িত্ব পালন করেছেন। অনেকে তাঁর মত নরম-কোমল স্বভাবের মানুষের পক্ষে জামায়াতের মত এত বড় দলের গুরু দায়িত্ব পালন সম্ভব হবে কিনা সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রমাণ করেছেন- স্বভাবে সাদাসিদে বা কোমল হৃদয়ের হলেও দায়িত্ব পালন ও রাহবার হিসেবে ছিলেন দৃঢ়চেতা। সরকারের দু:শাসনের বিপরীতে সংগঠন ও দেশের

জনগণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন তিনি। সংগঠনের কঠিন সময়েও অসুস্থ্য শরীরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সারাদেশে কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন। প্রতিটি ইস্যুতে ছিলেন সরব। দীর্ঘ এক যুগ ধরে সংগঠনের অনেক নেতা-কর্মী নিজ বাসায় ঘুমাতে পারেননি, হাজারো নেতা-কর্মী জেলে বন্দী ছিলেন, অসংখ্য মিথ্যা মামলা কাঁধে নিয়ে আত্মগোপনে থেকেছে, বেশুমার গুম, খুন, নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চলেছে- এসব পরিস্থিতি সামলেছেন দক্ষতার সঙ্গে। তিনি নিজেও গ্রেফতার হয়েছেন, রিমান্ডে ছিলেন এবং দীর্ঘ সময় কারাবরণ করেছেন। কিন্তু ছিলেন নিরাপস। কঠিন ও প্রতিকূল পরিবেশে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। অস্থিরতা ও বিষন্নতার উর্ধে থেকে ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন বলে জেনেছি দলের নেতাদের কাছ থেকে।

মরহুম মকবুল আহমাদের অদম্য বাসনা ছিল জনকল্যাণের। ঢাকা ও নিজ এলাকায় অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে জনগণের সেবা করেছেন। দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকার সময় যেখানে যেতেন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হলে কুশলাদি বিনিময়ের পর তাদেরকে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত দিতেন। কারো সাথে পরিচয় হলে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু মহলের নাম ঠিকানা ফোন নম্বর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। সরাসরি সাক্ষাত ও ফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে কুশলাদি বিনিময়, ইসলামী সাহিত্য বিতরণ তার নিয়মিত কাজের অংশ ছিল। একবার কারও সঙ্গে পরিচয় হলে সেই ব্যক্তি ভুলে গেলেও নিয়মিত বিরতিতে তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার এক বিরল গুন ছিল তাঁর।

মরহুম মকবুল আহমদ ২০ দলীয় জোটের স্বৈরাচার বিরোধী ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনের সভা-সমাবেশ বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। জোটের শরীক দলের নেতাদের কাছে একজন নির্মোহ, নিরহংকার ও সজ্জন মানুষ হিসাবে তিনি সমাদৃত ছিলেন। দলের গন্ডির বাইরেও তার ছিল গ্রহণযোগ্যতা। তার ইন্তেকালের খবর শুনে লকডাউনের মধ্যেও গভীর রাতে জানাযায় অসংখ্য মানুষের উপস্থিতি মরহুমের সার্বজনীন জনপ্রিয়তা প্রমাণ দেয়।

২০১৬ সালের অক্টোবরে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচিত আমির হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন মকবুল আহমাদ। তখন সংবাদমাধ্যমে তাঁকে শান্ত শিষ্ট ও মুখলেস মানুষ হিসেবে বর্ণনা করে। জনপ্রিয় অনলাইন সংবাদমাধ্যম বাংলা ট্রিবিউনের মতো বৈরী মিডিয়ায়ও তার নেতৃত্বের প্রশংসা করে বলা হয়, জামায়াত সঠিকভাবে পরিচালিত হবে। আগের ৬ বছরে তার ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বকালেই তা পরিষ্কার হয়ে গেছে বলেও উল্লেখ করা হয় রিপোর্টে। বলা হয়, দলটির শীর্ষ নেতাদের ফাঁসি হওয়ার পরেও দল হিসেবে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে জামায়াত। এর পেছনে অবদান হিসেবে মকবুল আহমাদের নেতৃত্বের দৃঢ়তাকেই দেখছে তারা। যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বিবিসি জনাব মকবুল আহমাদ আমীরের দায়িত্ব নেওয়ার পর যে রিপোর্ট করেছে তাতে উল্লেখ করা হয় যে, গত ছয় বছরে জামায়তের প্রায় সব

গুরুত্বপূর্ণ নেতা যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হলেও মকবুল আহমেদের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে কোন অভিযোগ আসেনি। রিপোর্টে আরও বলা হয়, দলটি এমন একজন ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচিত করতে চাইছে যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় 'বিতর্কিত ভূমিকা' রাখেননি।

আমীরের পূর্ণ দায়িত্বে শপথ গ্রহণের পর দেওয়া বক্তব্যে মকবুল আহমাদ যা বলেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'আমি আশা করেছিলাম, আমার সহকর্মীরা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কোনও ভাইকে এ মহান কাজের জন্য বাছাই করে নেবেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় শেষ পর্যন্ত এ দায়িত্ব আমার ওপরেই এসেছে। আপনারা অবগত আছেন যে, বিগত ছয় বছরের অধিক সময় আমার ওপর ভারপ্রাপ্ত আমিরের দায়িত্ব ছিল। মহান আল্লাহর অসীম রহমত এবং আপনাদের দোয়া ও আন্তরিক সহযোগিতায় অনেক জুলুম নির্যাতনের মধ্যেও আমি এ দায়িত্ব পালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। জামায়াতে ইসলামীর আমিরের এ কঠিন দায়িত্ব থেকে আমি নিজেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সংগঠনের সদস্যদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে আমার ওপর আমিরের দায়িত্ব আসায় আমি আজ মহান আল্লাহর রহমত ও সাহায্যের ওপর নির্ভর করে আপনাদের সামনে আমির হিসেবে দায়িত্বের শপথ গ্রহণ করছি।'

এই বক্তব্যের মধ্যে তাঁর অপরিসীম বিনয় 'আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল' প্রকাশ পেয়েছে যা সে সময়ে গণমাধ্যমে প্রশংসিত হয়েছে। জনাব মকবুল আহমাদকে যারা কাছে থেকে দেখেছেন, জেনেছেন তারা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, সমাজ সংস্কারের অংশ হিসেবে তিনি নিজেকে ইসলামী আন্দোলনে সামিল করেছেন। ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের ওপর আসা যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি অত্যন্ত সাহসের সাথে মোকাবেলা করেছেন। তিনি ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের একজন অকুতোভয় সৈনিক।

দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁর শরীরে বাসা বাঁধার পর নিয়মিত চিকিৎসাধীন ছিলেন। ইন্তেকালের বছরখানেক আগে ইবনে সীনা হাসপাতালের কেবিনে দেখতে গিয়েছিলাম। সেটিই ছিল তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। আসরের নামাযের কিছু সময় আগে সেখানে গিয়ে কিছু সময় কুশল বিনিময় ও গল্প করার পর জামাতে নামায আদায় করি। বিদায় চাইলে কোন মতেই রাজি হলেন না। কারণ ততক্ষণে তিনি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করার জন্য এটেন্ডেন্টকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এক সঙ্গে নাস্তা করে বিদায় নেওয়ার সময় বার বার তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে নূরের ঝলক দেখতে পাচ্ছিলাম। তখনই সংশয় জেগেছিল, আর দেখা হয় কিনা। অবশেষে তিনি চলে গেলেন মহান প্রতিপালকের সান্নিধ্যে। রেখে গেলেন ইকামতে দ্বীনের একজন একনিষ্ঠ রাহবারের অনুপম দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন, জান্নাতের উচ্চ মাকামে সমাসীন করুন।

লেখক : এম আবদুল্লাহ, সিনিয়র সাংবাদিক, সভাপতি, বংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)।

ব্যতিক্রমধর্মী একজন দা'য়ী ও রাজনীতিবিদ

ড. মো. নূরুল আমিন

আমার যতদূর মনে পড়ে ষাটের দশকের শুরুর দিকে তিনি ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হন। তখন থেকেই তিনি একজন দা'য়ী হিসাবে এই আন্দোলনে অনবদ্য অবদান রেখে এসেছেন। তার দাওয়াতী কাজ ছিল ভিন্নধর্মী, সুশৃঙ্খল ও উন্নত মানের। শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ সবার জন্য তার দাওয়াতী কাজ আলাদা বৈশিষ্ট্য বহন করতো। দফাভিত্তিক দাওয়াত ও কর্মসূচি দিয়ে তিনি কাজ শুরু করলেও কাউকে ঐভাবে ছেড়ে দিতেন না।

মার্চ মাসের ২৫ তারিখে করোনার তীব্র সংক্রমণে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আমি আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলাম। তখন আমার জীবনের দু'টি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এর একটি হচ্ছে সাবেক আমীরে জামায়াত জনাব মকবুল আহমাদের মৃত্যু এবং তার কিছুদিন পর জনাব শাহ আবদুল হান্নানের পরলোকগমন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। এদের দু'জনই আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মুরুব্বী ছিলেন। তারা দ্বীনি যাত্রায় আমার পথিকৃৎও ছিলেন।

জনাব মকবুল আহমাদ বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অগ্নিঝরা এক সময়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার নেতৃত্বে এই দলটি অগ্রগতির দিশা পেয়েছিল।

জনাব মকবুল আহমাদের সাথে আমার অনেক স্মৃতি। উনি আমার থেকে ৮/৯ বছরের বড় ছিলেন। দাগনভূইয়া উপজেলার পূর্ব চন্দ্রপুর ইউনিয়নের ওমরাবাদ গ্রামে তার জন্ম। ওমরাবাদ গ্রামটির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এই গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবারই মুসলমান। এর উত্তরে সাপুয়া-রাজাপুর, দক্ষিণে কিশোরগঞ্জ কেরানিয়া, পূর্বে গজারিয়া এবং পশ্চিমে বৈঠারপাড়া। এই গ্রামগুলোর প্রত্যেকটিতে হিন্দু জনবসতি আছে কিন্তু ওমরাবাদে নেই। জনাব মকবুলের পিতার নাম আলহাজ্ব নাদেরেজ্জামান আমীন। আমীন তার উপাধি ছিল। সেটেলমেন্ট জরীপের আমীন ছিলেন তিনি। এজন্য এই উপাধিটি তার নামের সাথে জড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি অত্যন্ত সৎ, নিষ্ঠাবান এবং পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। আমীনরা একজনের জমি অন্যজনের নামে রেকর্ড করে প্রচুর অবৈধ উপার্জন করার নজির রয়েছে। কিন্তু জামান সাহেবের বিরুদ্ধে এ ধরনের কোন অভিযোগ ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে একজন সচ্ছল গৃহস্থ হওয়া ছাড়াও তিনি কয়েকটি তালুকের মালিকও ছিলেন। এলাকা এবং আশপাশের গ্রামের গরীব লোকজন কর্মসংস্থান ছাড়াও তার কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য সহযোগিতা পেতেন। এলাকার রাস্তাঘাট, পুল-কালভার্ট নির্মাণেও তিনি অকাতরে দান করতেন। গজারিয়া খালের উপর তাদের বাড়ির সামনে যে পুলটি রয়েছে সেটিও তাদের ইট এবং অর্থায়নে তৈরি। জামান পরিবারের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে অত্যন্ত ভদ্র, নম্র এবং সুশিক্ষিত। কৈশোর অথবা যৌবনে কখনো জনাব মকবুলকে সমবয়সী বন্ধুবান্ধব বা কোনও প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার বা ঝগড়াঝাটি করতে দেখা যায়নি। প্রতিবেশীরা তার নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতায় এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, কোথাও কোনও বিরোধ দেখা দিলে মীমাংসার জন্য তার কাছেই যেতেন। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই তাকে বিশ্বাস করতেন। তার নেতৃত্বে আমরা ওমরাবাদ পল্লী মঙ্গল সমিতি গঠন করেছিলাম। এই সমিতির সকল সদস্য ছিল স্কুল-কলেজের ছাত্র। গ্রামের রাস্তাঘাট তৈরি ও মেরামত, চরিত্র গঠন, গরীব দুঃখীদের সহায়তা প্রদান, অভাবী ব্যক্তিদের ধানকাটা ও মাড়াই করা, খড়ের গাদা (স্থানীয় ভাষায় চীন) তৈরি, খানা মেজবানির জন্য তৈজসপত্র বিশেষ করে প্লেট-বর্তন, হাড়ি পাতিল প্রভৃতি ক্রয় ও সরবরাহ প্রভৃতি ছিল এই সমিতির কাজ। মকবুল সাহেবের নেতৃত্বে অত্যন্ত সফলতার সাথে আমরা এই কাজগুলোর আঞ্জাম দিয়েছিলাম।

আমার যতদূর মনে পড়ে ষাটের দশকের শুরুর দিকে তিনি ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হন। তখন থেকেই তিনি একজন দা'য়ী হিসাবে এই আন্দোলনে অনবদ্য অবদান রেখে এসেছেন। তার দাওয়াতী কাজ ছিল ভিন্নধর্মী, সুশৃঙ্খল ও উন্নত মানের। শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ সবার জন্য তার দাওয়াতী কাজ আলাদা বৈশিষ্ট্য বহন করতো। দফাভিত্তিক দাওয়াত ও কর্মসূচি দিয়ে তিনি কাজ শুরু করলেও কাউকে ঐভাবে ছেড়ে দিতেন না। শ্রেণি বিভাজন তথা শিশুদের ফুলের মেলা, কিশোরদের ফুলকুঁড়ি, যুবকদের শিবির এবং বয়স্কদের মূল সংগঠন জামায়াতের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি দাওয়াতী টার্গেটের প্রত্যেকের জন্য

আলাদা আলাদা ডাইরী সংরক্ষণ করতেন। তিনি তাদেরকে নিয়মিত বইপুস্তক ও পাঠ্যসামগ্রী পাঠাতেন এবং অগ্রগতি পরিধারণ করতেন। এজন্য তার টার্গেট ব্যর্থ হতো খুবই কম। তার উদ্যোগ এতই সফল ছিল যে, এক সময় ওমরাবাদ গ্রামে ইসলামী দাওয়াতের বাইরে কোনও লোক ছিল না বললেই চলে। ইসলামের একজন দা'য়ী হতে হলে ইসলামী জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই উপলব্ধি থেকেই জ্ঞান চর্চার প্রতি তার অদম্য আগ্রহ ছিল। এজন্য দেখতাম সকাল-বিকাল-রাত, একান্ত খাবার ও জরুরি মুহূর্তগুলো ছাড়া তিনি কাচারি অথবা পুকুরের ঘাটলায় বই পড়ায় রত আছেন।

অত্যন্ত কাকতালীয়ভাবে আমি তার কাছ থেকে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পেয়েছি। বাল্যকাল থেকেই আমি অন্তর্মুখী স্বভাবের মানুষ ছিলাম এবং বই পড়ার প্রতি আমার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। ১৯৬২ সালে মেট্রিক পরীক্ষা দেয়ার পর আমি তুলনামূলক ধর্ম চর্চায় আগ্রহী হয়ে পড়ি এবং বাংলাদেশে তিনটি ধর্ম ইসলাম, হিন্দু এবং খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে এগুলোর উপর তুলনামূলক অধ্যয়নের সিদ্ধান্ত নেই। এই উদ্দেশ্যে বইপত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে আমি ঢাকার ইমাউস বাইবেল স্টাডিজ এবং রামকৃষ্ণ মিশন নামক দুটি খ্রিস্টান ও হিন্দু সংস্থার সদস্য হই। তারা প্রতি সপ্তাহে আমাকে ডাকযোগে বইপত্র পাঠাতো।

ইসলামী বই-পুস্তকের মধ্যে আমার কাছে ছিল মুকছেদুল মুমিনুন, বেহেশতী জেওরসহ কয়েকটি মাসলা মাসায়েলের পুস্তক এবং মাওলানা আকরাম খাঁ লিখিত রসূলের জীবনী এবং মুহাম্মদ আলী লিখিত দ্যা হলি কুরআন। কথা প্রসঙ্গে মকবুল সাহেবকে আমি আমার এই ইচ্ছার কথা জানাই। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে বিষয়টি গ্রহণ করেন এবং আমাকে জানান যে, ইসলাম সম্পর্কে তোমার সংগ্রহে যে বইপত্রগুলো আছে তার কোনটিতেই আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের পরিচয় নেই। তোমাকে আরও অনেক দূর অগ্রসর হতে হবে। এরপর দিনই তিনি ঈমানের হাকীকত, নামায রোযার হাকীকত, যাকাতের হাকীকত, হজ্জের হাকীকত, জিহাদের হাকীকত এবং ইসলাম পরিচিতি নামক কতগুলো বই আমাকে উপহার দেন। এই বইগুলোতে সাবলীলভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের পরিচয়, ঈমানের কষ্টি পাথর এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অপরিহার্য বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। বইগুলো পড়ে আমি এতই মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলাম যে, তখন আমার জীবনের মোড়ই ঘুরে গিয়েছিল। আমাকে দেয়া তার পরবর্তী বই ছিল ইসলামিক ল' এন্ড কন্সটিটিউশন এবং সুদ নামক বিশাল গ্রন্থ। সুদ বই-ই পরবর্তীকালে ভিন্ন অবয়বে ইসলামের অর্থনীতি নামেও প্রকাশিত হয়েছিল। আমার ধারণা এই বইগুলোর সাথে তাফহীমুল কুরআনের অধ্যয়ন যোগ করলে কোনো ব্যক্তি বা

ব্যক্তিসমষ্টি ইসলাম একটি জীবনব্যবস্থা হওয়ার ব্যাপরে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। অবশ্য ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের পর অথর্ববেদ, ঋকবেদ, শ্যামবেদ যজুর্বেদ এবং খ্রিস্টানদের ওল্ড ও নিউটেস্টামেন্ট অধ্যয়নের আগ্রহ আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার জীবনে মকবুল সাহেবের এই অবদান মুছে ফেলার মতো নয়। মেট্রিকুলেশন পাস করার পর আমি ঢাকা চলে আসি এবং কলেজে ভর্তি হই। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ শেষ করার পর আমি দৈনিক পূর্বদেশের সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেই এবং পাশাপাশি তৎকালীন কায়েদ আজম কলেজে (বর্তমানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ) অধ্যাপনা শুরু করি। এই দীর্ঘ সময়েও তিনি আমার সাংগঠনিক খবরাখবর নিতেন। ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে তিনি ফেনী থেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আওয়ামী লীগকে চ্যালেঞ্জ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার মতো ধৃষ্টতা দেখানোর কারণে দলটির নেতাকর্মীরা তাকে দুশমন ভাবা শুরু করে এবং '৭১ সালের স্বাধীনতার পর এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময়ে তার বিরুদ্ধে প্রাণনাশের হুমকি আসে এবং তাকে পলাতক অবস্থায় চলে যেতে হয়। তিনি এবং আব্দুল হাদী মতান্তরে ফজলুর রহমান নামক একজন ব্যবসায়ী তাদেরই বাড়ির দক্ষিণে আব্দুল হক মিয়ার ৫ ফুট ৬ ফুট আয়তনের রসুইঘরে (পাকঘর) আশ্রয় নিতে হয়। ঐ সময়ে তার নিরাপত্তার খোঁজ-খবর নেয়া, বাইরে প্রতিপক্ষের তৎপরতা সম্পর্কে তাকে অবহিত করা এবং সময়মতো খাবার-দাবার সরবরাহের তদারক আমাকেই করতে হয়েছিল। বেশ কয়েক মাস তাকে এ অবস্থায় আটক থাকতে হয়েছিল।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তার বিরুদ্ধে সরকার বা আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার বিরোধিতা অথবা কোনো প্রকার অপরাধমূলক কোনো কাজের প্রমাণ দিতে পারেনি বা থানাও কোনো জিডি করে নাই। জনদাবির পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি প্রকাশ্য রাজনীতিতে ফিরে আসেন এবং ফেনী ও চট্টগ্রাম বিভাগে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তার উদ্যোগে বহু জনহিতকর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফেনীর খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদরাসা, ইসলামীয়া এতিমখানা, শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, সিলোনিয়া আয়েশা (রা.) মহিলা মাদরাসা, দাগনভূঁইয়া আহমাদিয়া মাদরাসা ও এতিমখানা, দাগনভূঁইয়া একাডেমিসহ ফেনী, সোনাগাজী ও দাগনভূঁইয়ার বহু প্রতিষ্ঠান তার অমর কীর্তি। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তিনি এবং তার ভাইয়েরা মিলে একটি মহিলা মাদরাসা ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের বাড়ির পার্শ্ববর্তী মূল সড়ক সংলগ্ন ৯৩ শতক জমি ওয়াকফ করে গেছেন। দুর্ভাগ্যবশত প্রকল্পটির কাজ শেষ করতে পারেননি। তার কাজ শেষ করার দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পণ করে গেছেন।

পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা এবং সাংগঠনিক সম্পৃক্ততা তার সাথে আমার

সম্পর্ককে অনেক নিবিড় করেছিল। আমার পিএইচডি ডিগ্রি লাভ তারই উৎসাহ ও উদ্দীপনার ফসল। এমনকি এই ডিগ্রির কোর্স ফিও আমার জন্য তিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত হওয়ার আগে তিনি নায়েবে আমীর ছিলেন এবং আমীর মাওলানা নিজামী গ্রেফতার হওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে তাকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। ভারপ্রাপ্ত আমীর এবং আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ইতিহাসের মর্মান্তিক অবস্থায় তাকে পড়তে হয়। এইসময়ে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং ইসলামী আন্দোলনের অকুতোভয় ১০জন নেতাকে যুদ্ধাপরাধীর মিথ্যা মামলায় ফাঁসি ও যাবজ্জীবন কারাদন্ডের রায় দেয়া হয়। সারাদেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। বিক্ষুব্ধ জনতাকে দমানোর জন্য পুলিশ ও সরকারী দলের নেতা-কর্মীরা সশস্ত্রভাবে মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জামায়াত নেতা-কর্মীদের উপর অন্ধকারের অমানিশা নেমে আসে। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কোন প্রকার বিক্ষোভ সমাবেশে তাদের অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। ঘরোয়া বৈঠক এমনকি দোয়ার মাহফিল এবং জানাযা সমাবেশ থেকেও তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ইফতার মাহফিল এবং কোরআন ক্লাস থেকেও পর্দানসীন মহিলাদের গ্রেফতার করে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। যখনই নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে, তখনি পুলিশ গুলি করে পাখির মত মানুষ মেরেছে। সাঈদী সাহেবের ফাঁসির রায়ের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভে একদিনেই প্রায় ১০০ লোক গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী তিন লক্ষ জামায়াত নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে পুলিশ ১১লক্ষ মামলা দিয়েছিল। স্বয়ং জনাব মকবুল আহমাদের বিরুদ্ধে ছিল ২৭টি মামলা এবং বর্তমান আমীর ডা: শফিকুর রহমান এবং জনাব মকবুল আহমাদের সম্পত্তিও ক্রোক হয়েছিল। এই অবস্থায় ২০১১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর জনাব মকবুল আহমাদ আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হন। তিনি ৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে আত্মগোপনে ছিলেন এবং ১টি সাংগঠনিক সভা থেকে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন।

এই সময়ের মধ্যে অনেকগুলো কাজ করেছেন যা প্রণিধানযোগ্য, প্রথমত: তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের আস্থা নিয়ে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের শান্ত করতে সমর্থ হন। হিংসা বিদ্বেষ হানাহানি যাতে বন্ধ হয় তার জন্য তিনি নেতাকর্মী সমর্থকদের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয়ত: কাজটি হচ্ছে দেশে পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেলসমূহ যেখানে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে জর্জরিত, নির্যাতিত, জামায়াতকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর, জামায়াত নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য কোন প্লাটফর্মই পাচ্ছে না সেখানে দেশে-বিদেশে তারই উদ্যোগে

Bangladesh Jamate Islami Its Aims And Objectives

and the atrocities it faces now শীর্ষক একটি অবস্থানপত্র বাংলা, ইংরেজী ও আরবী ভাষায় দেশ-বিদেশে এবং বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাস সমূহে বিতরণ করে। তিনি নির্বাচিত কিছু মুসলিম দেশে সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের কাছেও বিশেষ দূত পাঠান। যাতে করে তারা নির্যাতন বন্ধে বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করেন।

আন্তর্জাতিক সংবাদ ও গণমাধ্যমসমূহে জামায়াত বিরোধী তৎপরতা বন্ধের জন্যও তিনি তার নির্দেশনা জামায়াতের অবস্থান ব্যাখ্যা করে পত্র পাঠান। অনেক সংবাদ মাধ্যম এ ব্যাপারে কোন প্রকার সাড়া না দিলেও রয়টার্সের নয়াদিল্লী ব্যুরো জামায়াতের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে আগ্রহ দেখান। ব্যুরোর প্রধান শ্রী পরিমলবাবু এ ব্যাপারে অবস্থান পরিষ্কার করার জন্য প্রায় ৩০টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি পত্র পাঠান। জনাব মকবুল আহমাদের নির্দেশনায় এই পত্রের উত্তরে তাকে ৬৭ পৃষ্ঠার ১টি প্রতিবেদন রয়টার্সের কাছে প্রেরণ করা হয়। রয়টার্স এই জবাবটির সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণ করে এবং বিশ্বব্যাপী তা প্রচার করে। দূভার্গবশত ইসলাম বিদ্বেষী সংবাদ মাধ্যমগুলো রয়টার্সের এই প্রতিবেদনটি প্রচার করেনি। সংকট মূহূর্তে তার গৃহিত এই পদক্ষেপগুলো তাকে অমর করে রাখবে বলে আমি মনে করি। তিনি রাজনৈতিক হানাহানিতে বিশ্বাস করতেন না। যৌক্তিক সমঝোতার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস করতেন। এটা ছিল তার প্রজ্ঞার পরিচায়ক। আল্লাহ তাকে জান্নাতের উচ্চমাকাম দান করুন। আমীন॥

লেখক- দৈনিক সংগ্রামের নির্বাহী সম্পাদক ও সাবেক সরকারী কর্মকর্তা।

মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) কে যেমন দেখেছি

অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূঁইয়া

> তিনি নামে যেমন মকবুল আহমাদ কাজেও তিনি একজন আল্লাহ তা'য়ালার মকবুল বান্দাহ।

১৯৬৭ সাল তখন আমি গুনবতী ফাযিল মাদরাসার ছাত্র। আমার বাড়ী ফেনী হওয়ায় ফেনী শহরে ব্যাপক যাওয়া আসা ছিল। তখন ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পেয়ে সংগঠনে যোগ দেই। আর সে সুবাধে তখন মরহুম মকবুল আহমাদ সাহেবের সাথে পরিচয় হয়। ১৯৬৮ সালে আমি যখন ফেনী আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হই তখন জামায়াতে ইসলামী ফেনী মহকুমার অফিস ছিল ফেনীর মিজান ময়দানে। সে কারণে মাদরাসা ক্যাম্পাসে তাঁর সাথে বেশী বেশী সাক্ষাতের সুযোগ হতো। তখন থেকে তাঁকে একজন সদা হাস্যোজ্জ্বল আলোকিত মানুষ হিসেবে দেখে আসছি। তিনি ফেনী সেন্ট্রাল হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। আমার সরাসরি শিক্ষক না হলেও তাঁকে আমি সব সময় স্যার বলে সম্বোধন করতাম। তিনিও আমাকে একজন ছাত্রের মত বেশ স্নেহ করতেন। আমি এ দীর্ঘ ৫০ বছরে তাঁর চরিত্র, স্বভাব, চাল-চলন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও ভালবাসা কোন ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে ছন্দ পতন হতে দেখিনি। তাঁর পুরো জীবনটাই ছিল একটি নিয়ন্ত্রিত জীবন।

১৯৭০ সালে উনি যখন ফেনী সদর থেকে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন তখন অধিকাংশ জনসভায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তিনি প্রত্যেকটি জনসভায় একজন মু'মিনের দুনিয়ায় ব্রত যে পুরো জীবনটা আল্লাহর দাসত্বের মধ্যে অতিবাহিত করা এবং একজন মু'মিনকে জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে চলা যে জরুরী তা তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরতেন। তিনি সূরা ফাতিহার (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) আয়াত তিলাওয়াত করে বলতেন, 'আমরা

সালাতের মধ্যে এ আয়াত তেলাওয়াত করে আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করি (আমি তোমারই ইবাদত করি, তোমারই নিকট সাহায্য চাই) তা কি আমরা জীবনের সবক্ষেত্রে মানি, আল্লাহর দাসত্ব করি?' এ প্রসঙ্গে তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'হে ঈমানদাররা ইসলামের মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রবেশ করো।' দ্বীনের কয়েকটি বিষয় পালন করলেই শুধু মুসলমান হওয়া যায় না।

ঠিক ১৯৮৬ ও ১৯৯১ সালের নির্বাচনে আমি তার সহযোগী হিসেবে প্রত্যেকটি গণসংযোগ ও জনসভায় থাকতাম। ঠিক এসব আলোচনা গুলোতেও তিনি এসব মৌলিক বক্তব্য তুলে ধরতেন। তিনি শুধু বক্তব্যই দেননি, তিনি সারাজীবন এ বক্তব্যের আলোকে চলার চেষ্টাও করেছেন।

অনুপম চরিত্রের অধিকারী এক অনন্য ব্যক্তিত্ব :

জনাব মকবুল আহমাদ (রহ.) ছিলেন এক বিরল চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি ফেনীতে অবস্থান করেছেন কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষরাও কোন অভিযোগ উত্থাপন করতে পারেনি। আমি একজন আওয়ামী পরিবারের সদস্য হিসেবে আমার বাবা-চাচাদের মুখে প্রায়ই শুনতাম যে, জামায়াত মকবুল সাহেবের মত একজন লোক উপহার দিতে পেরেছে। আমি আরো অনেক বাম ঘরানার আমার বন্ধুদেরকেও বলতে দেখেছি মকবুল সাহেব হচ্ছেন একজন ব্যতিক্রম চরিত্রের মানুষ। পরবর্তীকালে তাঁকে গ্রেফতার করে যুদ্ধাপরাধ মামলায় আটকানোর জন্য আইসিটি টীম যতবারই ফেনীতে এসেছে তাঁর বিরুদ্ধে ফেনীর কোন মানুষের পক্ষ থেকে স্বাক্ষী দিতে রাজী না হওয়াতে তারা হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে।

দায়ী ইলাল্লাহ হিসাবে ভূমিকা পালন :

তিনি ছিলেন একজন সফল দা'য়ী ইলাল্লাহ। যার সাথে সাক্ষাৎ হতো দ্বীনের পক্ষে কিছু না কিছু কথা বলতেনই। হাতে বই থাকলে একটি বই ধরিয়ে দিতেন। আমি যখন জেলা আমীরের দায়িত্বে ছিলাম তখন তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন বা তাঁর পরিচিত কাউকে খুঁজে দাওয়াত দেয়ার কথা আমাকে বলতেন। বলেই ক্ষান্ত থাকতেন না, যাদের ব্যাপারে আমাকে বলা হতো তিনি ডায়েরীতে নোট করেও রাখতেন। পরবর্তীতে যখনই আমার সাথে সাক্ষাৎ হতো বা ফোনে আলাপ হতো ঐ সমস্ত ভাই-বোনদের নাম ধরে ধরে খোঁজ নিতেন- কে কোন অবস্থায় আছে। আমি তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করি কিনা? এরপর কিছু পরামর্শ দিতেন। সংগঠনভুক্ত ভাইদের রুকন করার জন্য খুবই তাগিদ দিতেন।

আমানতদারী :

আমানতদারীতার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর একটা নিয়মিত অভ্যাস ছিলো যখনই কারো থেকে লেনদেন করতেন ছোট্ট করে ডায়েরী খাতার কোণায় লিখে রাখতেন। একবার তিনি কাকে দেয়ার জন্য আমাকে বললেন, 'আমাকে ২ টাকা দাও।' আমি মহা খুশী সহকারে দিলাম। তিনি খাতায় কোন ফাঁকে টুকে রেখেছেন কে জানে। কয়েকদিন পরে তিনি ফেনী আসার পর আমাকে ডেকে বললেন, 'তোমার এ ২ টাকা নিয়ে যাও।' আমি বললাম, 'স্যার আমিতো এ টাকা নেয়ার জন্য দেইনি।' তিনি বললেন, 'না, আমিতো তোমার থেকে চেয়ে নিয়েছি। তাই এ টাকা পরিশোধযোগ্য, তোমাকে এটা গ্রহণ করতেই হবে।' এ জাতীয় আরো বহু ঘটনার আমি স্বাক্ষী। একবার নাস্তা করছিলাম, উনার নাস্তা শেষে হাত মোছার জন্য টিস্যু দিলে তিনি টিস্যুর অর্ধেক ছিঁড়ে ব্যবহার করলেন এবং বললেন এটাতেও চলে। একটু তির্যক ভাষায় বললেন, তোমাদের অনেকের আবার তাতে চলেনা। প্রয়োজনের অতিরিক্তটা ব্যবহার কি অপচয় হবেনা?'

মিতব্যয়ী :

আমি তাঁর পুরো জীবনে কোন অপচয় দেখিনি। পোশাক পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে সবক্ষেত্রে তিনি মিতব্যয়ীতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর বড় মেয়ের বিয়ের সময় আক্‌দ অনুষ্ঠান হয় মগবাজার কাজী অফিস লেনে। সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম (রহ.) আক্‌দ পড়িয়েছিলেন। সেখানে সবাইকে মিষ্টি খাওয়ানো হয়েছিল। পরে কেন্দ্রীয় অফিসে এসে যখন সবাইকে মিষ্টির দাওয়াত দিলেন। তখন সম্মানিত শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ (রহ.) বললেন- 'মকবুল সাহেব আমাদের ঠকাবেন না। আপনার এসব আমরা খাবনা। ভাল করে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।' তখন স্বভাব সুলভ ভাবে বললেন, 'এটা যদি না খান তাহলে এটা থেকেও বঞ্চিত হবেন।' এত সুনাম সু-খ্যাতির মুখেও কোন অন্যায়ের সাথে তিনি আপোষ করেননি। আমার মেয়ের বিয়ের সময় আমি স্যারের সাথে পরামর্শ করলাম কিভাবে আয়োজন করব। তিনি বললেন একেবারে সংক্ষিপ্তভাবে করো। আমি একটু হেসে বললাম, 'স্যার আমরাতো খ্যাতির বিড়ম্বনায় ভুগছি।' তখন তিনি হেসে বললেন, 'ওসব ছাড়, ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়লে কেউ তোমার পাশে দাড়াবেনা।' আমাকে বললেন, 'তুমি জানো আল্লাহর রহমতে আমার কাছে কেউ কোন ঋণের টাকা পাবেনা।' উনার ২য় ছেলের সাথে আমার সহধর্মিনির ভাইয়ের মেয়ের সাথে বিয়ে হয়। আমার ঐ ভাই ইসলামী ছাত্র শিবিরের তদানিন্তন ফেনী মহকুমা সভাপতি ছিলেন, নাম মোফাচ্ছেরুল হক খোন্দকার। বিয়ের সময় উনি জীবিত ছিলেন না। সিদ্ধান্ত হয়েছিল উভয় পক্ষ মিলে ঢাকায় অনুষ্ঠান করার। স্যার তাঁর বড় ছেলে

মাসুদকে ডেকে বললেন যে, তোমরা একদম কম সংখ্যক লোক নিবে আর যা বলবে যদি একজনও বেশী হয় তার পয়সা তোমরাই দিয়ে দিবে। বিয়েতে কেন্দ্রীয় সংগঠনের কোন নেতৃবৃন্দকে পর্যন্ত তিনি দাওয়াত দিতে রাজি হননি। তিনি সারা জীবনই খরচের বাহুল্য থেকে একেবারে বেঁচে থাকতেন।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক :

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (তুমি তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে ভয় প্রদর্শন কর) এবং وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا(আর তুমি নিকট আত্মীয়, মিসকিনদের এবং মুসাফিরদেরকে তাদের হক দিয়ে দাও আর সামান্যও অপচয় করো না) এ দু'টো আয়াতের বাস্তব প্রতিচ্ছবি তিনি ছিলেন। তিনি খুঁজে খুঁজে শুধু তাঁর নিকটাত্মীয় নয় দূরবর্তী আত্মীয়দেরও হক আদায় করতেন এবং আত্মীয়-স্বজনকে ব্যাপকভাবে দাওয়াত দিতেন, পরকালীন আজাবের ব্যাপারে সতর্ক করতেন। আমার সাংগঠনিক জীবনে ফেনীতে উনার যত আত্মীয়-স্বজন আছে প্রায় অনেকের বাড়ীতে আমাকে সাথে নিয়ে গেছেন, পরিচয় করে দিয়েছেন। তাদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করার জন্য আমাকেও দায়িত্ব দিয়ে যেতেন।

আবেগ মুক্ত জীবন :

তিনি ছিলেন ভয়লেশহীন একজন মানুষ। চরম দুর্দিনেও তাকে কোন টেনশন করতে দেখিনি। আমি জেলা আমীর হওয়ার পর প্রথম দিকে জেলাতে ব্যাপক সমস্যার সময় তাঁকে বললাম স্যার একটু টেনশনে ভুগছি। তিনি স্বভাবজাত হাসিতে বললেন- 'এক কাজ কর টেনশন করলে যদি সমস্যার সমাধান হয় তাহলে আমিও তোমার সাথে বসে বসে টেনশন করি, দেখা যাক সমস্যার সমাধান হয় কিনা।' ধীরস্থিরভাবে বললেন, 'আল্লাহ তা'য়ালার উপর ভরসা রাখ, আর আবেগমুক্ত হয়ে কাজ কর। আল্লাহ তা'য়ালা সমস্যার সমাধান করে দিবেন।

তিনি আরো বলতেন, 'আবেগ তাড়িত হয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেবেনা, কারণ বাঙালী হুজুগপ্রিয় জাতি।' আমি বললাম, 'সেটা কেমন স্যার?' তিনি বললেন, 'ফেনী শহরের সবচাইতে জনসমাগম বিশিষ্ট রাস্তা হলো ফেনী ট্রাংক রোড। এ রোডে তোমার পায়জামার ২ পায়ের মধ্যে ১ পায়ের পাজামা অর্ধেক অর্থাৎ হাঁটু পর্যন্ত রেখে ঘোরাফিরা কর তাহলে দেখতে পাবে প্রথম দিন কাউকে না পেলেও পরের দিন একজন না একজনকে এভাবে পেয়ে যাবে। লাগাতার কয়েকদিন চললে বহু লোককে তোমার দলে পেয়ে যাবে। তারা মনে করবে সম্ভবত এটাও একটা স্টাইল। ঠিক দেখলাম তরুন যুবকরা প্যান্টকে একেবার টাইটফিট করে পরতে, আবার প্যান্টের নীচের অংশ

হাতীর কানের মত একেবারে ঢিলে ঢালা করে পরতে। আবার দেখলাম নতুন প্যান্টের হাটু বরাবর বিনা কারণে একটা বড় তালি দিয়ে পরতে।

সংবেদনশীল মানসিকতা সম্পন্ন :

তিনি কাউকে আক্রমণাত্মক ভাষায় কথা বলতেন না এবং কাউকে আক্রমণ করার কোন সিদ্ধান্তও দিতেননা। তিনি বলতেন, 'আপনি কেমন আছেন বা তুমি কেমন আছ?' আমি বললাম স্যার আপনি এভাবে কেন বলেন? আমরাতো বলি 'আপনি ভাল আছেন কিনা? বা তুমি ভাল আছ কিনা? তখন তিনি বললেন, 'ভাল আছেন কিনা বা ভাল আছ কিনা জিজ্ঞেস করলেতো তিনি প্রথমেই খারাপ আছে বলে বলতে পারবেন না। তাই কেমন আছেন বললে, তিনি ভাল/ খারাপ যাই হোক তাই বলবেন।' তিনি সবসময় আমাদের সামনে পরামর্শ আকারে সিদ্ধান্তগুলো পেশ করতেন। আদেশ নিষেধের ভাষায় খুব কমই বলতেন। তিনি এটা ভাল হতে পারে। এ বিষয়টাতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকতে পারে। আমি এতে কোন কল্যাণ দেখছিনা। ভাল হওয়ার সম্ভাবনা দেখছিনা। ভবিষ্যতটা ভাল মনে হচ্ছে ইত্যাদি জাতীয় বাক্য ব্যবহার করতেন। আমরা উনার এ জাতীয় পরামর্শগুলোকে সিদ্ধান্তই মনে করতাম।

নীতির প্রশ্নে আপোষহীন :

তিনি ইসলামের মৌলনীতি থেকে একটু বিচ্যুতি বরদাশত্ করতেন না। একটি উদাহরণ ১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যখন আমাদের প্রতিপক্ষরা ভোটকেন্দ্রগুলো দখল করে নির্বিচারে ব্যালট পেপারে সীল মেরে জনগণের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছিলো আমাদের কিছু অতি উৎসাহী ভাই একটি ভোট কেন্দ্রে এ অবস্থার সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলো। তিনি সাথে সাথে সেখানে গিয়ে সাফ সাফ বলে দিলেন জনগণের অধিকার হরণ করে আমি ভোটে জেতার কোন প্রয়োজন নেই। সে কঠিন মুহূর্তেও তিনি ছিলেন নির্ভীক ও আদর্শের ব্যাপারে আপোষহীন।

রক্ত চক্ষুকে পরওয়া না করা :

তিনি কোন শাসকের রক্ত চক্ষুকে পরওয়া করতেননা। তিনি তাঁর নির্বাচনকালীন সময়গুলোতে সাহসের সাথে বলতেন আমাদের কোন হুমকি, ধমকি, নির্যাতন করে দমন করা যাবে না। আমরা জীবনে বহু স্বৈরশাসকের মুখোমুখি হয়েছি। আমাদের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ জীবনের এক কঠিন সময়ে জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীরে জামায়াত, পরে আমীরে জামায়াত হিসেবে সে সাক্ষর রেখেছেন। কঠিন দু:সময়ে আমাদেরকে ডেকে বলতেন, ভয় পেয়োনা, হতাশ হয়োনা, সামনে চলো, অমাবশ্যা কেটে যাবে চাঁদ উদিত হবে ইনশা-আল্লাহ।

লোভ লালসা মুক্ত :

আন্দোলনের দীর্ঘ জীবনে তার ব্যক্তিগত কোন চাওয়া পাওয়া ছিলনা। ঢাকায় বসবাস করার পরও নিজে কোন বাড়ী-গাড়ী করার কোন চিন্তাই ছিলোনা।

লোকদের অবদানের কথা স্বরণ করতেন :

ইসলামী আন্দোলনের সাথে যারা অতীতে ভূমিকা রেখেছিলেন পরবর্তীতে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক সমস্যার কারণে নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়েছেন এমনসব ব্যক্তিদের তিনি খুঁজে খুঁজে বের করতেন। আমাকে তিনি বিভিন্ন সময়ে বলতেন লিয়াকত আমাদের এ সমস্ত পুরোনো ভাইদের অস্তিত্বের উপরেইতো এ আন্দোলন বর্তমান অবস্থানে এসে পৌছেছে। এজন্য তাদের কোন দোষ ক্রটি থাকলেও সেগুলোকে অগ্রাহ্য করে তাদেরকে পূণরায় সক্রিয় করার চেষ্টা কর। তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবায়ে কিরামের জীবন থেকেও উদাহরণ দিতেন।

ক্ষমা সুন্দর মনোভাব :

তিনি সবসময় লোকদের প্রতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। একবার আমি কিছু ভাইয়ের ব্যাপারে বললাম, 'স্যার উনারা এ অপকর্মগুলো করেছে তারপরেও কি তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেননা।' তিনি বললেন, 'লিয়াকত! যদি এভাবে শুরু কর তাহলে কম্বলে আর লোম থাকবেনা। দেখনি রাসূলুল্লাহ (স.) মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে নিয়েও চলেছেন। এমনকি তার জানাযা পড়ার জন্যওতো গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালার নিষেধ না থাকলেতো তিনি তার জানাযা আদায় করতেন।'

নিয়ন্ত্রিত জীবন :

সে ১৯৭১ সাল থেকে তিনি ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি এমন নিয়ন্ত্রিত চলাফেরা করতেন তাঁকে ডায়াবেটিস রোগী বলে মনে হতোনা। সকালে ৩টি রুটি, রাত্রে ২টি রুটি খাবেন এবং সামান্যও বেশী না। ঝড় তুফান, বৃষ্টি বাদল যাই হোক তিনি সকাল বেলায় হাটতেন। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে আমি তাঁর সাথেই থাকতাম। একদিন দুপুর থেকে রাত অবধি গণসংযোগে ব্যস্ত ছিলাম। আমরা দুজনেই খুবই ক্ষুধার্ত। কোথাও কোন কিছু খাওয়ার সুযোগ হয়নি। রাতে আমার বাসায়ই খাওয়ার আয়োজন। আমার সহধর্মীনি স্যারের জন্য ৪টি রুটি আর ছোট মুরগীর রান্না করা গোশত (স্যার এটা পছন্দ করতেন) একটু সজবি আর ছোট মাছ রান্না করেছিল। স্বাদও হয়েছিল। আমি ভাত খাচ্ছি, স্যার রুটি খাচ্ছেন। দুটো রুটি শেষ করে আর একটা রুটির অর্ধেক খেয়ে ফেলেছেন চিৎকার করে বলে উঠলেন ইন্নালিল্লাহ

আমিতো অর্ধেক রুটি বেশী খেয়ে ফেললাম। আমি বললাম স্যার আজ যে পরিশ্রম হয়েছে এটা আর কি হবে? আমিতো মনে করি আপনি যেভাবে ক্ষুধার্ত ৪টি রুটি খেলেও কোন ক্ষতি হবে না। তিনি আমাকে বললেন, তুমি যত চেষ্টা করো লাভ নেই। আমি আর খাবো না।

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা :

তিনি ছিলেন ধৈর্য্যের মূর্ত প্রতীক। নিজের কষ্টের কথা তিনি কখনো প্রকাশ করতেননা। আন্দোলন ও আত্মীয়তার সুবাদে আমার উনার বাসায় যাওয়া আসা হতো। একদিন বাসায় গিয়ে দেখি তিনি খুবই অসুস্থ। পায়ে প্রচন্ড ব্যাথা, তা নিয়েই তিনি আমার সাথে হাসিমুখে কথা বলছেন। আমার খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। আমার পরিবারের খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। নিজের কষ্টের কথা একবারও উচ্চারণ করছেন না। আমি যখন বললাম, 'স্যার আপনারতো খুব কষ্ট হচ্ছে।' তখন তিনি পাঁ-টা একটা ছোট্ট টেবিলের উপর রাখলেন। আর বললেন, 'না তেমন না।' অবস্থাটা মনে পড়লে আমার মনটা এখনো ব্যাথায় টনটন করে।

পরিশেষে বলতে চাই, জনাব মকবুল আহমাদ (রহ.) ছিলেন একজন কামেল ইনসান। এ ব্যাপারে নোয়াখালী, কুমিল্লা অঞ্চলের একজন প্রভাবশালী আলেম শায়খুল হাদীস মাওলানা হাশমত উল্লাহ সাহেব তার ব্যাপারে বলেছিলেন যে, 'তিনি নামে যেমন মকবুল আহমাদ কাজেও তিনি একজন আল্লাহ তা'য়ালার মকবুল বান্দাহ।' আমরা মহান আরশের মালিক আল্লাহ তা'য়ালার নিকট ফরিয়াদ করবো, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সারা জীবনের নেক আমলগুলো কবুল করে নিন এবং মানুষ হিসাবে কোন গুনাহ করে থাকলে ক্ষমা করে দিন। যেহেতু তিনি ইসলামী আন্দোলন করতে করতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন তাই তাঁকে শাহাদাতের মর্যাদা নসীব করুন। আর আমরা যারা আন্দোলনের সাথে শরীক আছি আমাদেরকে তাঁরই পদাংক অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দিন। আমীন॥

লেখক- সাবেক ফেনী জেলা আমীর, বর্তমানে কুমিল্লা অঞ্চলের টীম সদস্য।

আধ্যাত্মিক মানচিত্রের নকশা
জাকির আবু জাফর

তাঁর কথা ভাবলেই মনে হয় আধ্যাত্মিক ঔজ্জ্বল্যের মুখগুলো এমনই বুঝি!
এমনই উজ্জ্বল উদ্দীপক এবং হাসির রেখায় জ্বলজ্বলে সারাক্ষণ
মনে হয় অহিংস কোনো হৃদয়ের ছাপ
পরিতৃপ্তির আভায় ভীষণ ভীষণ দীপ্ত এবং মুগ্ধচিত্ত
তিনি বলতেন - আত্মবন্ধনের কথা, অহরহ ত্যাগের কথা
বলতেন - কীভাবে নিজেকে গুঁজে দিতে হয় তাকওয়ার সৌরভে
বলতেন - কোন পথে যেতে হয় মহান রবের সান্নিধ্যে
যখনই ভাবি দেখি - এই তো ছুটছেন তিনি
চির সাফল্যের কোনো বাগিচায় গোলাপ রুয়ে দিতে
অথবা চিরকালীন কোনো ফুলের রেকাবি সাজিয়ে
গড়ে নিতে কোনো অনশ্বর বাগান
একদা এ সৌরভ তাঁরই হবে তিনি জানতেন
জানতেন - অন্যায় দিয়ে কখনও অন্যায় মোছা যায় না
অধমও কখনও পৌঁছে না উত্তমের মসনদে
কিন্তু যে করেই হোক একজন বিশ্বাসীকে হতে হবে উত্তম
হতে হবে সিদ্দিক ও শহীদের উত্তরসূরী
হতে হবে সকল নিরিখে সত্য- পথিক
ন্যায়ের দণ্ড উর্ধে তুলতে হবে তাঁকেই
এমনই ভাবতেন তিনি
তাঁর কাছে সেসবই খোলাখুলি ছিলো যা মানুষ লুকোয়
যা মানুষ দূরে রাখেন তা ই কাছে রাখতেন তিনি
তিনি স্বীকার করতেন তার সবই যা কেবলি অস্বীকার করে মানুষ
সব জলাঞ্জলি দিয়ে স্বার্থকেই টানে সবাই
তিনি স্বার্থ ঝেড়ে হয়ে উঠতেন পরার্থের নকিব
তাঁর কথায় জড়িয়ে ছিলো কি এক অদ্ভুত মায়া
অন্য আনন্দের মুরালি
কথার সুষমা ছিলো গভীর একান্ত-নিষ্ঠ
শুনলেই মনে হতো স্বরের সঙ্গে বেরিয়ে আসে হৃদয়টি
অথবা হৃদয় থেকে বেড়ে ওঠা কথার অনিন্দ্য ধ্বনি
তিনি এক সহজ জীবনের চলমান উপমা
কলহ ও প্রতিযোগিতার উর্ধে এক অনন্য দ্যুতি
তাঁর মতো নিষ্কলুষ নিরহংকার মুখ কই তেমন
না প্রতিহিংসার মতো গণ্ডুস ছিলো না তাঁর
প্রতিশোধের আগুন জ্বালাননি কখনও
সোজাসাপটা হৃদয়টি খুলে জীবনের দিকে ডাকতেন
সব ঝেড়ে উঠে যেতেন মুস্তাকিমের পথে
যখনই ভাবি- দেখি তিনি জড়তাহীন কথার আড়ালে অন্তর উঁচিয়ে রাখতেন

আমাদের প্রেরণা : মকবুল আহমাদ

মুহাম্মদ আবদুল জব্বার

কিছু মানুষের চিরবিদায় অনেক কষ্টের, বেদনার। কিন্তু এটিই নির্মম বাস্তবতা। ঠিক তেমনি আমাদের ছেড়ে পরওয়ার দেগারের ডাকে সাড়া দিয়ে গত ১৩ এপ্রিল ২০২১ইং একজন প্রিয় মানুষ চলে গেলেন। তিনি মরহুম মকবুল আহমাদ। তিনি আমাদের রাহবার, অগ্রজ ও অভিভাবক। সংগঠনের জনশক্তির প্রতি তাঁর দরদ, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল, সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ও ফরহেজগারি, যা কখোনো ভোলার নয়। তিনি আমাদের হৃদয়ের গহিনে বেঁচে থাকবেন কাল থেকে কালান্তর। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সকল নেক আমল কবুল করুন। আমীন।

২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনের একজন নগণ্য কর্মী হিসেবে ওনার সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তিনি সেই কঠিন সময়ে সংগঠনের জিম্মাদারির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। "যুদ্ধাপরাধ ইস্যু" নিয়ে সারা দেশে সংগঠনের জনশক্তিকে রাতের আঁধারে ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা, অমানুষিক নির্যাতন, গ্রেপ্তার, ঘরবাড়িতে হামলা, ডজন ডজন মিথ্যা মামলা ছিল প্রতি ঘণ্টার খবর। এহেন কঠিন পরিস্থিতিতে একজন নেতার পক্ষে স্থির থাকা মামুলি ব্যাপার নয়। ওনার সাথে যখনই ছাত্রদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের বিষয়গুলো নিয়ে বলতাম, তিনি আমাদের সাহস দিতেন। বলতেন, 'ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহর চাইতে ওরা শক্তিশালী নয়। আল্লাহর পাকড়াও থেকে জালিমরা বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ একটা বিহিত করবেন, ইনশাআল্লাহ।'

মরহুম মকবুল আহমাদ আমীরে জামায়াত হিসেবে ওনার সাথে যখনই দেখা করতে যেতাম অথবা উনি আমাদের তাঁর সাক্ষাতের জন্য ডাকতেন, তিনি কিছু ফটোকপি পেপারস বা কিছু পেপার কাটিং দিতেন। বলতেন, এগুলো তোমরা পড়বা আর ফটোকপি করে তোমাদের বন্ধুদের দিবা এবং পরবর্তী সাক্ষাতে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, পূর্বের সাক্ষাতে দেয়া সেই পেপারসগুলো নিজেরা পড়েছি কিনা বা বন্ধুদের মাঝে বিতরণ করেছি কিনা। তিনি বলতেন, 'অপপ্রচারের মোকাবিলায় আমাদের টেলিভিশন নেই, কিন্তু প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেক জনশক্তিকে একেকটি টেলিভিশন বা মিডিয়া হিসেবে কাজ করতে হবে। তিনি আমাদের সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিদের দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারে তাগাদা দিতেন। বলতেন, সমাজের এসব লোককে পরিবর্তন করতে

পারলে সমাজের অনেক পরিবর্তন হবে।

২০১৫ সালের দিকে তিনি আমাকে একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি দিয়েছিলেন। বইয়ের শিরোনাম ছিল– 'স্বৈরশাসকদের পরিণতি'। তিনি বইটি দিয়ে বলেছিলেন, বইটি পড়ে কোনো তথ্যগত ভুল থাকলে আমাকে জানাবে। ওই পাণ্ডুলিপিতে দুনিয়ার ৫০ স্বৈরশাসকের জীবন, কর্ম ও শেষ পরিণতি নিয়ে লিখেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, এ বই লেখার উদ্দেশ্য হলো মানুষের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করা যে– কারো ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয় এবং যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি যত অমানবিক হবেন, দুনিয়ায়ও আল্লাহ তায়ালা তাকে তেমনিভাবে লাঞ্ছিত করবেন। আমি ২০১৭ সালে গ্রেপ্তার হওয়ার পর তিনি বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি ড. রেজাউল করিম ভাইকে দিয়েছিলেন। হয়তো কখনো বইটি প্রকাশিত হবে। বইটি পড়ে মনে হয়েছিল, এ বইটি পড়ে যেকোনো অবিবেচকের বিবেকের দুয়ার খুলতে পারে।

মকবুল আহমাদ সাহেব এক অনন্য চরিত্রের অধিকারী নেতা ছিলেন। আমি ছাত্রজীবন থেকে একটু-আধটু লেখালেখি করতাম; তিনি কোনোভাবে তা জানতেন। দৈনিক সংগ্রামে আমার একাধারে ১২ পর্বে ১টি বড় লেখা 'তথ্য সন্ত্রাসের শিকার ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন' শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে ছাপানো হয়েছিল। একদিন তিনি আমাকে ফোন করে আমার কাঁচা লেখার প্রশংসা করেছিলেন এবং লেখার ব্যাপারে উৎসাহিত করে বলেছিলেন, তোমার লেখাগুলো পাঠাও, একটি চটি বই বের করে ফেল! আমি আরো অবাক হলাম এবং ওনাকে বিনয়ের সাথে বলেছিলাম, আরো তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে পরে ছাপব, ইনশাআল্লাহ। এভাবে ছোট কোনো কাজকেও উৎসাহিত করার বিষয়টি মরহুম মাওলানা একেএম ইউসুফের কাছেও দেখেছি। জেলে যাওয়ার আগে বেশ কয়েকবার আমার লেখা কলাম পেয়ে তিনি আমাকে ফোন দিয়ে আরো লেখার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিলেন, যা আজো প্রেরণার।

মরহুম মকবুল আহমাদ আমাদের প্রায়ই সব প্রোগ্রামে বলতেন, মানুষ লোকভয়, রাজভয় ও মৃত্যুভয়ের কারণে হকের পথে চলতে পারে না। এ তিনটি ভয় জয় করতে পারলে মানুষের আল্লাহর পথে চলতে সহজ হয়। কিন্তু এ ভয় থেকে বেরিয়ে আসা সহজ ব্যাপার নয়।

আমাদের রাহবার মরহুম মকবুল আহমাদ সাহেবের ব্যাপারে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল যখন তদন্ত করেছিল, তখন কেন্দ্রীয় জামায়াতের পক্ষের আইনজীবীদের সাথে ওনার এলাকায় গিয়েছিলাম। ওনার বাড়ির পাশে বেশকিছু হিন্দুবাড়ি ছিল। আমরা তাদের কাছে যাই। তারা ওনার প্রশংসা করেন এবং ফেনীতে তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক হিসেবে তারা মতপ্রকাশ করেন। সরকারি ট্রাইব্যুনালের অভিযোগকে তারা বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মত দিয়েছিলেন। ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে মিথ্যা সাক্ষী-সাবুদ নেয়ার চেষ্টা

হচ্ছে বলে তারা জানিয়েছিলেন। তাই তারা প্রকাশ্যে সবার সামনে মতপ্রকাশ করতে চাইছিলেন না। ওনার বাড়িতে গিয়ে দেখেছি, ওনার বাড়ি জীর্ণশীর্ণ! নেই কোনো দালান-কোঠা। অথচ দুনিয়ার অন্য কোনো জাগতিক দলের নেতা হলে তাদের কি এমন জৌলুসহীন অবস্থা হতো?

তাঁর ইন্তেকালের দিন রাতে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওইদিন লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল। তাঁর গ্রামের বাড়ির মসজিদের পাশে খোলা মাঠে গভীর রাতে দলমত- নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। আগত মুসল্লিরা তাঁর কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। কেউ কেউ কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'ওনার মতো মানুষ হয় না।'

তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনি রেখে গেছেন লাখো মুজাহিদের দীপ্ত কাফেলা। তিনি সফল। কারণ তিনি ছিলেন আমাদের প্রেরণার বাতিঘর। তিনি রাজনৈতিক কারণে বাসা থেকে বের হতে না পারলেও রাসূলের সুন্নাহ মোতাবেক জীবনযাপনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি অল্পে তুষ্ট ছিলেন। ছাত্র হিসেবে আমাদেরও অল্পে তুষ্ট থাকতে নসিহত করতেন। তিনি গভীর রাতে তাহাজ্জুদ গুজারে অভ্যস্ত ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও নিয়মিত কমপক্ষে ৪০ মিনিট ব্যায়াম করতেন। খুব কম আহার করতেন। কম কথা বলতেন। ওনার জ্ঞানপিপাসা আমাকে ভাবাত। এ বয়সেও প্রচুর পড়তেন। তিনি প্রতি সাক্ষাতেই পড়ার কথা বলতেন। তিনি যখন সর্বশেষ ঢাকার উত্তরায় একটি বৈঠক থেকে গ্রেপ্তার হন, তখন তিনি ছিলেন একেবারে স্বাভাবিক। ওনাকে হাতকড়া পরিয়ে কোর্টে হাজির করা হয়েছিল– কী অপূর্ব জান্নাতি হাসি! লেশমাত্র ভাবনা নেই!

তিনি ডিবির হাজতে ছিলেন। সেখানেও দাওয়াতি কাজ করেছেন নির্বিঘ্নে। যেকোনো অবস্থায় তাঁর দাওয়াতি কাজের চরিত্র ছিল অনন্য। তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তায়ালা মরহুম মকবুল আহমাদের সকল নেক আমল কবুল করুন। আল্লাহ তায়ালা তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

লেখক : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি।

মরহুম মকবুল আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ
দায়িত্ব, ব্যস্ততা, অসুস্থতা, বার্ধক্য কিছুই জন্মভুমি থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি যাকে

ডা. মুহাম্মদ ফখরুদ্দিন মানিক

১৯৩৯ সালের ৮ ই আগষ্ট ফেনী জেলার দাগনভূঁইয়া উপজেলার অন্তর্গত ৩নং পুর্ব চন্দ্রপুর ইউনিয়নের ওমরবাদ গ্রামে মরহুম মকবুল আহমাদ স্যার জন্মগ্রহণ করেন। ২০২১ সালের ১৩ এপ্রিল দিবাগত রাত ১১.৩০টায় হায়াতের সফর শেষ করে মহান মা'বুদের ইচ্ছায় সেই নিজ গ্রামে সমাধিস্থ হন লক্ষ জনতার দো'য়া এবং ভালবাসায় সিক্ত হয়ে। যার জানাজার ইমামতি করেন তাঁরই হাতে তৈরি করা নেতৃত্ব বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সম্মানিত আমীর ডা. শফিকুর রহমান। খাটিয়া বহন করেন সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। সর্বশেষ যে তিনজনের হাতের উপর দিয়ে কবরে শায়িত হন তারা হচ্ছেন সম্মানিত আমীরে জামায়াত, স্যারের বড় ছেলে মোহাম্মদ মাসুদ পরিবারের অপর একজন সদস্য। পাশ থেকে আমরা চেষ্টা করেছি এই সৌভাগ্যবান কফিনের ভার বহন করার। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তা থেকে বঞ্চিত করেননি। কবরে নামানোর পর যখন কাফনের মুখ খুলে দেয়া হয়েছিল তার সেই নুরাণী চেহারার শুভ্রতা দেখার সুযোগ হয়েছে। তার চেহারার উজ্জ্বলতায় হেসে উঠেছে পুরো গোরস্থান।

প্রায় বিরাশি বছরের জিন্দেগীতে মহান মা'বুদ তাঁকে দিয়ে পরিবার, সমাজ দেশ এবং বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের খেদমত করিয়েছেন। কিন্তু দায়িত্বের চাপ, ব্যস্ততা, দূরত্ব, অসুস্থ্যতা, বার্ধক্য কোন কিছুই তাঁর সাথে জন্মভুমির দূরত্ব তৈরী করতে পারেনি। তিনি নিজ এলাকার প্রতি অকৃত্রিম দায় অনুভব করতেন। সুযোগ পেলে নয় বরং সুযোগ বের করে নিতেন এলাকার জন্য। যতদিন সুস্থ্য ছিলেন এবং প্রশাসনিক চাপ মুক্ত ছিলেন ততদিন এলাকায়

যেতেন। আত্মীয় প্রতিবেশীদের বাড়ি যেতেন, হাদীয়া তোহফা পাঠাতেন।

১৯৬২ সালে এলাকার উন্নয়নের জন্য তিনি একটি সামাজিক সংগঠন "ওমরাবাদ পল্লী মঙ্গল সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১০ বছর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত গজারিয়া হাফেজিয়া মাদরাসার সভাপতি ছিলেন।

তিনি ১৯৮৪ সাল থেকে নিজ উদ্যোগ, পরিকল্পনা ও সহযোগিতায় ফেনী ও দাগনভূঁইয়া এলাকায় অনেকগুলো সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। সেগুলোর কোনটির তিনি সভাপতি, কোনটির ট্রাস্টি মেম্বার আবার কোনটির আজীবন ফাউন্ডার মেম্বার ছিলেন। এই সব প্রতিষ্ঠানে তিনি আমানতদারিতার সাথে নিরলসভাবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেগুলোকে কোন ঝামেলা ছাড়াই উত্তরোত্তর এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

উনার যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা এবং আমানতদারীতার কারণে সাংগঠনিক অনেক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করেছেন। সাবেক শহীদ নেতৃবৃন্দ এসব প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত এবং সাংগঠনিক বিবাদ মিমাংসা নিরসনে মরহুম মকবুল আহমাদ স্যারকে দিতেন। এ সকল দায়িত্ব থেকে শুরু করে আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব পালন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে আমাদের শ্রদ্ধেয় দায়িত্বশীল জনাব আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুজ জাহেরের একটি মন্তব্য স্যারের জন্য যথোপযুক্ত। তিনি বলেন, "মরহুম মকবুল আহমাদ কখনো কোন চেয়ারের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা করেননি, কিন্তু যখন তাকে যে চেয়ারে যারা বসিয়েছেন তিনি তাদেরকে হতাশ করেননি, আলহামদুলিল্লাহ।"

এলাকার কাজের ব্যাপারে উনার এত পেরেশানি ছিল যারা এলাকা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসতেন কিন্তু আন্দোলনের কাজে সমানভাবে সক্রিয় হতেন না তাদেরকে সংগঠিত রাখার জন্য আমাদের ফেনীর আরেক মহানপুরুষ, ইসলামি অর্থনীতি এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম উদ্যোক্তা এবং প্রাণপুরুষ, ইসলামী ছাত্র সংঘের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল মরহুম ইউনুস ভাইসহ ঢাকায় অবস্থানরত দায়িত্বশীল ভাইদের সাথে নিয়ে ঢাকাস্থ ফেনীর ইসলামী আন্দোলনের ভাইদের জন্য গঠন করেন ফেনী ফোরাম, ঢাকা। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মকবুল স্যার এই ফোরামের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে তত্ত্বাবধান করেছেন। উনার এই প্রধান উপদেষ্টার পদ কখনো অলংকারিক পদ ছিল না। সব সময় তিনি ফোরামকে ঘনিষ্টভাবে দেখভাল করেছেন, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর পরামর্শের বাইরে কোন নির্বাহী সিদ্ধান্ত হয়নি। সর্বশেষ ২০১৮ সালে ফোরামের সিনিয়র কয়েকজন দায়িত্বশীলকে ডেকে নিয়ে নিজ স্বাক্ষরিত ফেনী ফোরামের কার্যনির্বাহি কমিটির অনুমোদন দেন ।

ফেনী ফোরামের প্রায় মিটিং এ এলাকার ব্যাপারে অনাগ্রহী ভাইদের ব্যাপারে তিনি এভাবে নসিহত করতেন, "এখন যারা এলাকায় যাননা, এলাকার খোঁজ-খবর রাখেন না, এলাকার সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করেননা, আপনি যখন মারা যাবেন তখন আপনার লাশ কি এলাকায় যাবেনা?"

২০০০ সাল থেকে আমি ফোরামের যত মিটিং এ উনাকে পেয়েছি সব সময় এই নসিহত শুনেছি।

যখন থেকে স্যারের এলাকায় যাওয়া সীমিত হয়ে গিয়েছে তখন সাংগঠনিক দায়িত্বশীল ও বিভিন্ন জনের মাধ্যমে তিনি এলাকার সামাজিক কাজগুলো করতেন। দল মতনির্বিশেষে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখাতেন। এক সময় সাংগঠনিক দায়িত্বশীলের বাহিরে নিজগ্রামে একান্ত কিছু কাজ নিয়মিত করাতেন উনার একজন নাতি মরহুম আবু বকর সিদ্দিক মনসুর ভাইকে দিয়ে। যিনি সোনাগাজী আল-হেলাল একাডেমীর প্রিন্সিপাল এবং সংগঠনের রুকন ছিলেন। মনসুর ভাই আমার নানা বাড়ির দিক থেকে মামাতো ভাই। মনসুর ভাই মারা যাওয়ার পর উনাদের গ্রামের শহীদ ভাই স্যারের পক্ষ থেকে এ কাজগুলো আঞ্জাম দিতেন। শহীদ ভাই সংগঠনের সদস্য এবং শ্রমিক নেতা।

২০১২ সাল থেকে তিনি নিয়মিত আমাকে কিছু কাজ দিতেন। এপ্রিল মাসে ফেনী জেলা সংগঠন এবং অঞ্চল তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে জানানো হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে ফেনী- ৩ আসন (দাগনভুইয়া-সোনাগাজী) থেকে নির্বাচনের জন্য আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে। অন্য সবার মত আমার ইচ্ছা ছিল সর্বশেষ বারের মত মরহুম মকবুল আহমাদ স্যার নির্বাচন করবেন, আমরা তাঁর জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করবো। তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল বর্তমান আমীরে জামায়াত মুহতারাম ডা. শফিকুর রহমান এবং তৎকালীন অবিভক্ত ঢাকা মহানগরীর আমীর ও বর্তমান কেন্দ্রীয় এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খাঁন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন করা যায়নি। স্যার নিজেই একদিন আমাকে কল করে ডেকে নিলেন। এখানেও আমরা একই আবেদন করলাম। সর্বশেষ বারের মত স্যার নির্বাচন করলে আসন নিশ্চিত এবং বিজয়ের ব্যাপারেও নিশ্চিত হওয়া যায়। স্যার তাঁর অসুস্থতাসহ সামগ্রিক বিষয় সামনে রেখে বুঝিয়ে বললেন। অন্য সকল বিষয়ের সাথে সাথে নির্বাচনী কাজের ব্যাপারে বেশ কিছু পরামর্শ দিলেন। উনার নির্বাচনী কাজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন। সংগঠনের দায়িত্বশীল নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সাথে আলাপ করে মাসে ৩/৪ বার এলাকায় সফর করা, এলাকায় বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও সামাজিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে জড়িত হয়ে কাজ করা। একই সাথে আমার স্ত্রীর নাম ধরে বলতেন, তাকেও এলাকার মহিলা সংগঠনের

মাধ্যমে একটু একটু করে যোগাযোগ করানোর চেষ্টা করা। এ বিষয়গুলো আমার সাথে নিয়মিত খোঁজ-খবরের অংশ ছিল। সরাসরি অথবা ফোন যখনই দেখা বা কথা হত এগুলো জানতে চাইতেন।

২০১২ সাল থেকে তিনি নিয়মিত যে কাজটি করতেন তাহলো রমজানের শেষ দিকে এসে আমাকে কল করে অথবা খবর দিয়ে নিয়ে যাকাত এবং ফিতরার একটি অংশ হাতে দিয়ে বলতেন, এটা তুমি এলাকায় খরচ করবা। ২০১২ সাল থেকে গত বছর পর্যন্ত রমজানের শেষ দশকে আমি নিশ্চিত একটি ফোনের অপেক্ষায় থাকতাম, সালাম দিয়ে বলতেন, মি. মানিক কেমন আছো? তোমার বিবি বাচ্চা কেমন আছে? দেশে কবে যাবা? কয়দিন থাকবা? কিছু প্রোগ্রামাদি ঠিক হইছে? সব জবাব শুনে বলতেন তোমার জন্য যাকাতের এ টাকা রেখেছি নোমানের সাথে কথা বলে নিয়ে নিও। এলাকায় যাকে যা দিতে হয় দিয়ে দিও। আর কুরবানীর ঈদেও একই কাজ করতেন। ঈদের ৩/৪ দিন আগে ফোন করে বলতেন তোমার জন্য একটা ফান্ড রাখা হয়েছে। নোমানের সাথে কথা বলে নিয়ে নিও। আমাকে যে ফান্ড উনি দিতেন তা কখনো সাংগঠনিক ফান্ডের অংশ ছিলনা বরং উনার ব্যক্তিগত বরাদ্দ অথবা সংগৃহীত অর্থ থেকে রেখে দিতেন। কোন সময় ঈদের আগে মিস হলে ঈদের পরে হলেও পাঠিয়ে দিতেন।

এলাকার ব্যাপারে উনার এ তাকিদ সব সময় ছিল, আমার এলাকায় সফরের ব্যাপারে অন্য কোন দায়িত্বশীল ভাইকে বলতেন কিনা সেভাবে জানতাম না, স্যারের মৃত্যুর পর একটি দো'য়ার অনুষ্ঠানে আমার মহানগরীর আমীর মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন ভাই উনার সম্পর্কে বলতে গিয়ে একথা উল্লেখ করেছেন, স্যার জানতে চাইতেন- "মানিক এলাকায় যায় কিনা?" আরো কয়েকজন আমাকে জানিয়েছেন স্যার আমার ব্যাপারে এ কথাগুলো জিজ্ঞেস করতেন। এলাকার কাজের পেরেশানী থেকে এ কথা উপলব্দি করা যায়, যে ময়দানে স্যার ১৯৭০, ১৯৮৬, ১৯৯১ তে কাজ করেছেন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, সে ময়দানে দ্বীন একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে দেখে যাওয়ার আকাংখা সব সময় ছিল। তা ফখরুদ্দিন মানিক হোক অথবা অন্য কোন দায়িত্বশীলের মাধ্যমে হোক। আমরা কাজ করছি, যাওয়া আসা হচ্ছে সেই কাজকে দায়িত্বশীলদের চিন্তা পরিকল্পনার আলোকে হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনার দাবী রাখে কাজের অগ্রগতির জন্য।

সর্বশেষ গত ২ বছর থেকে উনাদের বাড়ি কেন্দ্রীক একটি ফাউন্ডেশনের জন্য আমাকে কয়েকবার বলেছেন স্যার এবং উনার ভাইয়েরা সবাই মিলে উনাদের পৈত্রিক সম্পদ থেকে কিছু জায়গা ওয়াকফ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ৩/৪ মাস আগেও যখন কথা বলেছি তিনি এ বিষয়ে বলেছেন। উনার ভাই, উনার ছেলেরা এবং ফেনী জেলা আমীরসহ বসে এটা একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ

দেয়ার জন্য। জেলা আমীরকে আমিও বিষয়টা জানিয়েছিলাম। পরে আর সেভাবে খোঁজ নেয়া হয়নি। স্যার মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগে স্যারের ছোট ছেলে নোমানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্যারের অসুস্থতা আর বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে তা হয়ে ওঠেনি। নোমান সবার সাথে আলাপ করে জানাবে বলেছে। শুনেছি জেলা জামায়াত সেখানে একটি মাদরাসা করার উদ্যোগ নিয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ!!

আশা করছি এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে স্যারের এলাকা নিয়ে যে চিন্তা পরিকল্পনা ছিল তা বাস্তব রূপ লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। যে জমিনে আল্লাহ তার গোলামকে শায়িত রেখেছেন, আল্লাহ দ্বীনের জন্য সে জমিনের উর্বরতা বৃদ্ধি করে দিন, দাওয়াতি কাজ, সাংগঠনিক কাজ, সমাজকল্যাণ কাজ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আন্দোলনের প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব করার তাওফিক দান করুন। আমীন॥

লেখক : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী উত্তরের এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী।

যে জীবন প্রেরণা যোগায়

আমাদের নেতৃবৃন্দের কথা মনে আসলে চোখে পানি আসতেই থাকে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে মহান আল্লাহ সংগঠনকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। প্রবীন নেতৃবৃন্দ সংগঠনকে সে মজবুত কাঠামোর মধ্যে গড়ে গেছেন। আল্লাহর রহমতে এ দ্বীনি সংগঠন চলতেই থাকবে। চলতে চলতে একদিন সারা বিশ্বে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী শক্তিতে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ।

দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সংকট মুহূর্তে যিনি আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন, তিনি হলেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় নেতা জনাব মকবুল আহমাদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৯ সালে ঢাকার ইডেন হোটেল প্রাঙ্গনে জামায়াতের রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যে সম্মেলন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কাজ আরম্ভ হয়।

জনাব মকবুল আহমাদকে দেখেছি কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলনে, কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা ও কেন্দ্রীয় জিলা আমীর সম্মেলন এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রোগ্রামে ও মৌলভীবাজার জিলায় যখন সফরে আসতেন তখন। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে এবং পারিবারিকভাবে উনাকে দেখার সুযোগ হয়নি। উনার কথাবার্তা, চাল-চলন, আচার-আচরণ সবকিছু থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছি।

একটি বিল্ডিং তৈরী করার সময় তার ফাউন্ডেশন যত মজবুত হবে, বিল্ডিং ততই মজবুত হয়ে গড়ে উঠে। কিন্তু মাটির নিচে যে ইটগুলো থাকে, তা কেউ দেখতে পায় না। তেমনি জামায়াতে ইসলামী নামে যে মজবুত সংগঠন আমরা পেয়েছি, তার অন্যতম কারিগর ছিলেন জনাব মকবুল আহমাদ।

তিনি সংগঠনের আভ্যন্তরীন অনেক কাজ করেছেন, যে কাজগুলো প্রকাশ্যে দেখা যায় না। জামায়াতকে একটি মজবুত সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলার জন্য রাত দিন কাজ করেছেন। সংগঠনের কোথায় কোথায় কোন দুর্বলতা আছে, কোথায় সমস্যা আছে, সংগঠনের দায়িত্বশীলদের কি কি যোগ্যতার অভাব বা দুর্বলতা আছে, তা তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য রাখতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে ও সাংগঠনিকভাবে পরামর্শ দিয়ে তাঁ দূর করার চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। সংগঠনের কাজে কোথাও কোন সমস্যা দেখলে তা সমাধানের জন্য পরামর্শ দিয়েই শেষ করতেন না, পরবর্তী সময় দেখা হলে সে ব্যাপারে কতটুকু সমাধান হয়েছে, তারও খোঁজ খবর নিতেন।

প্রবীন নেতা মকবুল আহমাদ সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ যে একটি অভ্যাস ছিল, তাহলো কোন এলাকার কোন লোক দেখা করতে আসলে সে এলাকায় উনার পরিচিতদের খোঁজ খবর নিতেন এবং তাঁদের নিকট সালাম পাঠাতেন। কেন্দ্রে সাংগঠনিক বা ব্যক্তিগত কোন সমস্যা নিয়ে গেলে তিনি খুবই আন্তরিকতার সাথে শুনতেন এবং পরামর্শ দিতেন। উনার পরামর্শ শুনে সমস্যাগ্রস্থ দায়িত্বশীলগণ মনে শান্তনা পেতেন।

তিনি খুবই সাধারণভাবে চলাফেরা করতেন। মফস্বলে আসলে হাতে সাধারণ একটি চামড়ার ব্যাগ থাকতো এবং ব্যাগের মধ্যেই প্রয়োজনীয় কিছু ব্যবহারিক জিনিসপত্র থাকতো। বর্তমানের মতো আগে তত প্রাইভেট গাড়ীর চলাচল ছিল না। বাস ও ট্রেনই ছিল যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের পর সারাদেশেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কোথায় কে আছেন, অনেকের মধ্যেই যোগাযোগ ছিল না। তিনি একটি সাধারণ ব্যাগ হাতে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে লোকজনকে বের করেছেন। একবার মৌলভীবাজার এসে আমাকে নিয়ে হবিগঞ্জ শহরে গেলেন। হবিগঞ্জে কে কোথায় আছেন, সবই ছিল অজানা, সেখানে গিয়ে খুব খোঁজাখুঁজি করে এডভোকেট সাইয়েদ শাহ আলম সাহেবকে বের করেন। উনার বাসায় বসে আলাপ আলোচনা করে সবার খোঁজ খবর নেন। তখন আমি একবার চট্টগ্রাম ছিলাম, হঠাৎ শহরে দেখি জনাব মকবুল আহমাদ ও হাতে সেই ঐতিহাসিক ব্যাগ। সেখানে দেখলাম, দ্বীনি ভাইদের সন্ধান করছেন।

জনাব মকবুল আহমাদ যখন মৌলভীবাজার সফরে আসতেন, তখন সফরে অনেক কাজ করে যেতেন। ইহা আমাদের দায়িত্বশীলদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। তিনি সফরে যে কাজ গুলো করতেন তাহলো-

১। সাংগঠনিক নির্ধারিত প্রোগ্রাম করতেন।
২। দায়িত্বশীলদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অবস্থা জানার চেষ্টা করতেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেন।

৩। সংগঠনের মহিলা বিভাগের প্রোগ্রাম করতেন।

৪। ছাত্র সংগঠনের দায়িত্বশীলদের সাথে বসতেন।

৫। ছাত্রীদের কাজের খোঁজ-খবর নিতেন।

৬। যে বাসায় থাকতেন, বাসায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে আলাপ আলোচনা করতেন এবং পড়াশুনায় উৎসাহ দিতেন।

৭। উনার পরিচিত বা এলাকার কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকলে তাদের সাথে দেখা করার চেষ্টা করতেন এবং বই উপহার দিতেন।

একবার মৌলভীবাজার সফরে আমাকে নিয়ে একটি চা বাগানে যান এবং উনার এলাকার একজন অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং কিছু বই উপহার দিয়ে আসেন। তখন দেশে রাজনৈতিক এত সংকট ছিল না, ইচ্ছামত কাজ করা যেত।

আমাদের নেতৃবৃন্দের কথা মনে আসলে চোখে পানি আসতেই থাকে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে মহান আল্লাহ সংগঠনকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। প্রবীন নেতৃবৃন্দ সংগঠনকে সে মজবুত কাঠামোর মধ্যে গড়ে গেছেন। আল্লাহর রহমতে এ দ্বীনি সংগঠন চলতেই থাকবে। চলতে চলতে একদিন সারা বিশ্বে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী শক্তিতে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ।

নবী করিম (সা.) যে ভবিষ্যতবাণী করে গেছেন বালাকোটের শহীদ ইসমাইল শহীদ (রহ.) তাঁর মানসাবে ইমামত গ্রন্থে সে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তা হলো "তোমাদের দ্বীন আরম্ভ হবে নবুওয়াত ও রহমতের মাধ্যমে এবং তা তোমাদের মধ্যে থাকবে, যতক্ষণ আল্লাহ্ চান। অত:পর মহান আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন। অত:পর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত আরম্ভ হবে, যতদিন আল্লাহ্ চান। অত:পর তা উঠিয়ে নেবেন। অত:পর আরম্ভ হবে দুষ্টু রাজতন্ত্রের জামানা এবং যতদিন আল্লাহ চাইবেন, প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অত:পর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নেবেন। অত:পর জুলুমতন্ত্র ও শুরু হবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন, ততদিন থাকবে। অত:পর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নেবেন। অত:পর আবার নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। নবীর সুন্নত অনুযায়ী তা মানুষের মধ্যে কাজ করে যাবে এবং ইসলাম পৃথি বীতে তার কদম শক্তিশালী করবে। সে সরকারের উপর আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসী সবাই খুশী থাকবে। আকাশ মুক্ত হৃদয়ে তার বরকত বন্টন করবে এবং পৃথিবী তার সমস্ত গুপ্ত সম্পদ উদগীরণ করে দেবে।"

আমরা কাজ করতে করতে সেই সময়ে পৌঁছে যাবো ইনশাল্লাহ। জামায়াতে ইসলামীতে যারা কাজ করেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাজ করেন। যাঁরা কাজ করে করে আল্লাহর নিকট পৌঁছে গেছেন, মহান আল্লাহ্ সবাইকে কবুল করুন, তথা জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। (আমীন)। মুহতারাম মকবুল আহমদ সাহেবের ৫৭ পৃষ্টার একটি বই ২০১৩ সালে বাংলাদেশ জামায়াতে

ইসলামী প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম "ইসলামী আন্দোলনের পথে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত হওয়াই আমাদের কাজ।" বইটি ছোট হলেও আন্দোলনের জন্য মূল্যবান গাইড লাইন।

তিনি লিখেছেন, "যারা মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর উলুহিয়াত ও রবুবিয়াতকে এই জমিনে কায়েম করতে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালায় তাদের সাথে কায়েমী স্বার্থবাদীদের লড়াই অবধারিত। এ লড়াই যুগে যুগে নবী রাসূলদের সাথেও হয়েছে। জুলুম, নির্যাতন, অপপ্রচার, কারাবরণ, দেশান্তর এমনকি শাহাদাতের মত ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে তাদের জীবনে। এটাই ইতিহাসের বাস্তবতা। সুতরাং যারাই এ পথে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাদের উপর জুলুম নির্যাতন, অপপ্রচার, কারাবরণ তথা শাহাদাতের মত ঘটনাও ঘটেছিল। এই সব কিছুর মধ্যে বিরোধীদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে এই জমিন থেকে চিরতরে দ্বীনের মূলোৎপাটন করা। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী এই কাজে বাতিলরা কখনও সফল হয়নি, হবেও না ইনশাআল্লাহ।" (৭ পৃষ্টা)

লেখক : সিলেট অঞ্চলের টীম সদস্য ও সাবেক আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, মৌলভীবজার জিলা।

আমার প্রিয়
মকবুল আহমাদ ভাই

"সুলতানা আপা, আপনি এতো ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না। আপনাকে উপদেশ কিংবা সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা আমার জানা নেই। শুধু বলবো আপনাকে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না, আপনাকে লিখতে হবে, আরো অনেক লিখতে হবে, ভাইকে নিয়েই কিছু লিখেন ।"

মাসুদা সুলতানা রুমী

তার সাথে আমার প্রথম পরিচয় (দেখা নয়) ২০০৬ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে। আমার লেখা "চরমোনাই পীর সাহেব আমাকে জামায়াতে ইসলামীতে নিয়ে এলেন" এই বইটির জন্য তিনি আমাকে মোবাইল ফোনে মোবারকবাদ জানান।

সেইদিন থেকে তিনি প্রায় ফোনে আমার খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। তারপর তাঁর সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারীর ৪ তারিখে, ৩ তারিখ রাতে (আমি তখন সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আজম সাহেবের বাসায়) ফোন করে বললেন, "সুলতানা আপা আগামী কাল ৪ তারিখ একটা পাঠচক্র আছে, কেন্দ্রীয় জামায়াত অফিসে। এখানে আসলে প্রায় সব কেন্দ্রীয় নেত্রীর সাথে আপনার দেখা হয়ে যাবে, আসতে পারবেন কি?" আমি বললাম, "ইনশাআল্লাহ পারবো, ভাই। ভাই বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ!"

বিকেল ৪টার পূর্বেই আমি আমার দুই সফর সঙ্গিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় জামায়াত অফিসে হাজির হলাম। অফিসের সামনে এক ভদ্র লোককে জিজ্ঞেস করলাম "নায়েবে আমীর মকবুল আহমাদ ভাই আছেন? ভদ্র লোক আমাদের দাঁড়াতে বলে ভিতরে চলে গেলেন, একটু পরেই এসে বললেন, "তিনি আসছেন"।

তিনজন কাঁচা পাকা শ্মশ্রু মণ্ডিত বুজুর্গ এগিয়ে এলেন আমি কাউকে চিনি না, তাই সালাম দিয়ে বললাম, "নায়েবে আমীর মকবুল আহমাদ সাহেব কে?" "আমি" উত্তর দিলেন মকবুল আহমাদ ভাই।

আমি বললাম, "আমি মাসুদা সুলতানা রুমী"। ভাই আর একবার সালাম দিলেন আমাকে। তারপর বললেন, "আপনাদের প্রোগ্রাম গ্রীণ ভ্যালীর ৩য় তলায়, "আপনি কি গেছেন সেখানে কখনো?" বললাম, "জ্বী ওখানে আমি কয়েকবার গিয়েছি, আমি চিনতে পারবো"। তবু নায়েবে আমীর মকবুল আহমাদ ভাই আমাদের সাথে একজন লোক দিলেন। সেই দিনই ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম দেখা।

০৫.০২.২০০৭ তারিখে ভাই দাওয়াত দিলেন তার বাসায় দুপুরে খাওয়ার জন্য, ডাল ভাতের দাওয়াত দিয়ে গরুর গোস্ত, মুরগীর গোস্ত, বড় মাছ, ছোট মাছ, আরো কত প্রকারের শাক সবজি সেই সাথে ডালও আছে।

এরপর থেকে যখনই আমি মগবাজার যেতে চেয়েছি, তখনই আমার জন্য গাড়ী পাঠাতেন। একদিন একটা নাম্বার দিয়ে বললেন, "আপনার যখনই ঢাকার মধ্যে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হবে এই নাম্বারে ফোন দিবেন" বলে একজন ড্রাইভারের নাম্বার দিলেন। কবে কোথায় কখন প্রোগ্রাম তাও জানাবেন।

আব্দুস শহিদ নাসিম ভাইয়ের পরিচালিত 'কোরআন শিক্ষা সোসাইটির' সব প্রোগ্রামে মকবুল আহমাদ ভাইয়ের উৎসাহে আমি গিয়েছি। এই ভাবে মকবুল আহমাদ ভাই যেন ধীরে ধীরে আমার আপন ভাই হয়ে উঠলেন। তখন আমরা পারিবারিক ভাবে সবাই মোহাম্মাদ পুরে বাস করছিলাম। ভাই আমার বাসায় অনেকবার এসেছেন। আমার পরিবার নিয়ে পারিবারিক বৈঠক করেছেন। এরপর বাসা বদল করে শ্যামলী আসি, ভাই এ বাসায়ও অনেকবার এসেছেন। জনাব মকবুল আহমাদ ভাইয়ের মত আন্তরিক মানুষ আমি কমই দেখেছি। আমাকে লেখার জন্য খুবই উৎসাহ দিতেন। একদিন বললেন, "জানেন সুলতানা আপা, আমার প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে আমি পাঁচ মিনিট সময় রাখি আপনার বইয়ের কথা বলার জন্য"। এর মধ্যে ২০১০ সালে আমার হাজবেন্ড ইঞ্জিনিয়ার নূর মোহাম্মাদ সাহেব স্টোক করলেন। কিছুদিন ঢাকায় চিকিৎসা করার পর একটু সুস্থ্য হতেই তিনি আর কিছুতেই ঢাকা থাকতে চাচ্ছিলেন না, তাই তাকে নিয়ে চলে আসি নওগাঁ বদলগাছীর বাড়িতে। এখানে চলে আসার পর ভাইয়ের সাথে আর দেখা হয়নি, তিনি প্রায় ফোনে খোঁজ খবর নিতেন।

একদিন বললেন "সুলতানা আপা কেমন আছেন?" তিনি আমাকে সুলতানা আপা বলে সম্বোধন করতেন। আমি বললাম "ভাই আমাকে একটা আনকমন নামে ডাকেন।" ভাই বললেন "আপনি আমার আনকমন বোন, তাই আনকমন নামে ডাকি"।

আলহামদুলিল্লাহ! ভাই ভাল তো আছি, কিন্তু মনটা খুব খারাপ!

"কেন, মন খারাপ কেন? ভাইয়ের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর।

"আপনার ভাইয়ের অসুস্থতার জন্য সবসময় বাসায় থাকতে হয়, বাইরে যেতে পারি না, তাই সাংগঠনিক কোন কাজও করতে পারি না"।

ভাই বললেন, "সুলতানা আপা আপনি বোধ হয় স্বামীর খেদমতটা কম করেছেন, তাই আপনাকে দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তাআ'লা স্বামীর খেদমতটা করিয়ে নিচ্ছেন। স্বামীর খেদমতটা করেন, এতেও অনেক সওয়াব আছে, আমরা তো সব সওয়াবের আশায় করি, তাই না?"

আস্তে আস্তে বললাম, "জ্বী ভাই তাই"।

মকবুল আহমাদ ভাইয়ের কথা শুনে কলিজা ঠান্ডা হয়ে গেল।

সত্যি মনের মধ্যে একটা অশান্তি কাজ করছিল সাংগঠনিক কাজ করতে পারছি না তাই। ভাইয়ের এই উপদেশের পর মনের পেরেশানিটা দূর হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে ভাই বললেন, "সুলতানা আপা !" বললাম, "জ্বী ভাই"

"আপনি লিখছেন তো?"

"জ্বী ভাই লিখছি"

"আপনি লেখেন, লেখাটাই আপনার সাংগঠনিক কাজ"

ভাই আমাকে যখন এই কথা বলেছিলেন, "তখন তিনি আমীরে জামায়াত"।

আমি আমার নেতার কাছ থেকে সাংগঠনিক কাজের দিক নির্দেশনা পেয়ে গেলাম। মনের সন্তুষ্টির সাথে আমি আমার "নূর" এর সেবা যত্ন আর লেখা লেখি করতে লাগলাম।

এরপর ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারীর ১২ তারিখে 'নূর' চলে গেলেন আলমে বারযাখে। মহান রবের আহবানে। আমি যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম।

মকবুল আহমাদ ভাই পরের দিন আমাকে ফোন দিলেন, আমি যেন তার সাথে কোন কথাই বলতে পারছিলাম না। আমার বড় ছেলের হাতে ফোন দিয়ে দিলাম, ও কিছুক্ষণ পরে এসে বললো "মা, আপনাকে কোন কথা বলতে হবে না, শুধু ফোনটা কানে ধরে রাখেন"। আমি ফোনটা কানে ধরতেই ভাই সালাম দিলেন। আমি উত্তর দিলাম।

ভাই বললেন, "সুলতানা আপা, আপনি এতো ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না। আপনাকে উপদেশ কিংবা সান্তনা দেয়ার ভাষা আমার জানা নেই। শুধু বলবো আপনাকে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না, আপনাকে লিখতে হবে, আরো অনেক লিখতে হবে, ভাইকে নিয়েই কিছু লিখেন।"

এরপর একদিন নওগাঁ জেলা আমীর এসে বললেন, "আমীরে জামায়াত ১০ হাজার টাকা দিয়েছেন আপনাকে"। এর কয়েকদিন পরে ফোন দিলেন তিনি। বললেন "কিছু কি লেখা শুরু করেছেন?"

বললাম "না ভাই কিছু লিখতে পারছি না।"

"পারবেন, আপনি ভাইকে নিয়েই লেখা শুরু করেন। সামান্য কিছু হাদিয়া পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছেন আশা করি"।

বললাম " নওগাঁ জেলা আমীর ১০ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন। পেয়েছি ভাই। কেন দিয়েছেন ভাই?"

"এমনি দিয়েছি, আমাদের গ্রাম্য সমাজে ভগ্নীপতি মারা গেলে বোনকে সাধ্যানুযায়ী হাদিয়া দিতে হয়। তাই সামান্য কিছু....."

এরপর মে মাসে আমি লেখা শুরু করি। নূর চলে যাওয়ার পরে নূরকে নিয়েই প্রথম বইটা লিখি 'নূরের নিবাস এখন আলমে বারযাখে'।

এরপর আরো কিছু বই লিখেছি, কিন্তু ভাইয়ের সাথে আর কথা বলতে পারিনি। ভাই তো কোন ফোন ব্যবহার করতেন না, এক এক সময় এক এক ফোন ব্যবহার করতেন, তাই আমি তাকে কখনো ফোন দিতে পারতাম না। ২০১৮ সাল থেকে আমি নিজেই অসুস্থ্য হয়ে পড়ি, যার জন্য ঢাকাও যেতে পারিনি।

ভাইয়ের সাথে আর দেখা হয়ে উঠেনি আর ভাইও সাংগঠনিক কাজে এ সময়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ভাইয়ের তো ছিল সংগঠন অন্তঃপ্রাণ। আমি ঢাকার মোবারক হোসেন ভাইয়ের কাছে থেকে মাঝে মাঝে তাঁর খোঁজ খবর নিতাম, কিন্তু তার সাথে আর কথা বলতে পারিনি।

কিছু দিন আগে 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় দেখলাম তিনি খুব অসুস্থ্য, আইসিইউ তে আছেন, হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে কান্না আর দোয়া আসলো, তার কয়েকদিন পরেই শুনি তিনি আর নেই। চলে গেছেন তার মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে।

"ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়া'লা আমার মকবুল আহমাদ ভাইকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন, সেই সাথে আমি যেন জান্নাতবাসি হতে পারি। আল্লাহ আমাকে সেই তৌফিক দান করুন।

আমীন! সুম্মা আমীন!

একজন মকবুল সাহেব

"তোমাদের মাঝে আল্লাহর কাছে সেই বেশী সম্মানিত, যে বেশী পরহেজগার।"

এ.বি.এম শামসুদ্দিন

মরহুম মকবুল আহমাদ আল্লাহর একজন মাকবুল বান্দাহ। ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা সর্বোপরি দৃঢ় ঈমানের বলে বলিয়ান একজন সিংহ পুরুষ। ভয়ভীতি শঙ্কা জীবনে তাঁকে কখনও স্পর্শ করেনি। লোভ লালসা মুক্ত একজন স্বচ্ছ মনের অধিকারী পুরুষ। মনুষ্য নামের সকল গুনে গুনান্বিত একজন পাকা ঈমানদার তিনি। মহান স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল তাঁর জীবনের মূল চাবিকাঠি। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বিশ্বনবী মোহাম্মদ (স.) এর নীতি পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমে জীবন কাটান তিনি। ফলে 'মান লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল' অর্থাৎ- 'আল্লাহ যার জগৎ তার' মকবুল সাহেবের জীবনের পরতে পরতে তা প্রতিফলিত হয়।

মকবুল সাহেবের সুন্দর ব্যবহার ও সদাহাস্যমুখ আগন্তুকদেরকে মন্ত্রমুগ্ধের মত আকৃষ্ট করত। তাঁর সাথে সাক্ষাতের পর শত ব্যথা বেদনা, দুঃখ ভারাক্রান্ত মনের জ্বালা যন্ত্রণা বহুলাংশে প্রশমিত হয়ে যেত। আল্লাহ প্রদত্ত এমন অসাধারণ গুনের অধিকারী ছিলেন তিনি।

ফেনী শহরের সেন্ট্রাল হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন তিনি। শিক্ষকতার সুবাদে তাকে চিনতাম। সাদা পায়জামা, সাদা পাঞ্জাবী ও টুপি পরিহিত জনাব মকবুল সাহেবকে আরও কয়েকবার দেখেছি। মনে হত প্রথম দিনের সেই পায়জামা, পাঞ্জাবী আজও পরছেন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগেও একবার দেখা হয়েছে পায়জামা-পাঞ্জাবী কিন্তু বদলাননি। কথিত আছে সপ্তাহের মাঝে একদিন রাতে কাপড় চোপড় নিজে ধুয়ে দিতেন, সকালে সেগুলো পরে কাজে যেতেন। এমন সাদাসিদে সরল জীবন যাপন করে সংগঠনের সর্বোচ্চ পদে আসিন হন তিনি। বলুন দেখি মকবুল সাহেবকে কি বলা যাবে? ওলি আল্লাহ, দরবেশ নয় কি? ভন্ড পীর মুরিদি করে বহু লোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত। মকবুল সাহেব ছিলেন বুজুর্গ ও সত্যিকারের পীর। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সত্যিকারের সংগঠনের অগণিত মানুষের প্রাণ পুরুষ, ভক্তি শ্রদ্ধা আর ভালবাসার পাত্র। মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন।

পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী পিতার ভাইকে চাচা বা জেঠা বলে সম্বোধন করা

হয়। আর মামা বলে ডাকা হয় মায়ের ভাইকে। কিন্তু মকবুল সাহেবের ছোট ভাইয়ের সন্তানেরা মকবুল সাহেবকে মামা বলে। অন্যান্য ভাইদেরকে ডাকতেন যথারীতি চাচা, জেঠা বলে। কারণ জানতে চাইলে বলা হয় মকবুল মামার কাছে তারা আজীবন মামার আচরণই পেয়েছে। ইহা যেন এক অভাবনীয় স্বর্গীয় সম্পর্ক। দিন-মাস-সাল মনে নেই। একদিন বেলা প্রায় ২টায় প্রাক্তন এমপি জনাব অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে নিয়ে মকবুল সাহেব আমার লালমাটিয়া বাসায় হাজির। বললেন, খাবেন যা রেডি আছে তা দিয়েই খাবেন। ডাল-ভাত, শাক সবজি আর কই মাছ দিয়ে খেলেন। লক্ষ্য করলাম তৃপ্তি সহকারে খেয়েছেন। কোথাও কোন প্রোগ্রামে এসেছিলেন। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। বিনা দ্বিধায় স্বত:স্ফূর্তভাবে চেয়ে খেলেন। চিন্তা করলাম কত সরল ও সহজ হলে একজন ব্যক্তির পক্ষে এমনটি হতে পারে। কথা প্রসঙ্গে বললেন, তাঁর বড় দুই ছেলেকে মাদরাসায় লেখা-পড়া করিয়েছেন। নামাজ পড়তে মসজিদের কাছাকাছি এলে পকেট থেকে টুপি বের করে মাথায় পরে। আবার নামাজ শেষে টুপি টুপির জায়গায় পকেটে চলে যায়। কত সরল মনের অধিকারী ছিলেন মকবুল সাহেব। বাইরে বেশ-ভূষায় যেমন ছিলেন সাদাসিদে অন্তরটাও ছিল অত্যন্ত সরল। বাঁকা-তেড়া ভাব তাঁর জীবনে কখনও পরিলক্ষিত হয়নি।

এ সরল সোজা মানুষটি ছিলেন দৃঢ়চেতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যে ছিলেন অত্যন্ত কঠিন। সময়ের প্রতিটি মূহূর্ত ছিল লাখ কোটি টাকার সমতুল্য। একটি ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে ইতি টানছি। তাফসির মাহফিলের দাওয়াত দেয়ার জন্য আল্লামা সাঈদী সাহেবের বাসায় গেলাম। সামনে একটি ক্যাডেট কোচিং সেন্টার। এ প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গ আলাপের মাঝখানে হঠাৎ তিনি বিদ্যুতায়িতের মত লাফ দিয়ে উঠলেন। বললেন, কি জওয়াব দেবো? কি জওয়াব দেবো? আজকে আমার পাঠচক্র ছিল। মকবুল সাহেব এ পাঠচক্রের পরিচালক। আমি তাজ্জব হলাম। কোরআনের বিশ্ব বিখ্যাত তাফসিরকারক মকবুল সাহেবের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় এত আপ্লুত? অথচ মকবুল সাহেব তখন কোন বড় দায়িত্বে ছিলেন না। আমার মনে বার বার বাজতে লাগল, "তোমাদের মাঝে আল্লাহর কাছে সেই বেশী সম্মানিত, যে বেশী পরহেজগার।" সম্মানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন তিনি। জীবনের শেষ প্রান্তে একবার তিনি পুলিশের হাতে আটক হন। এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা অঙ্গীকার করেছিল নিষ্পাপ এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে বানোয়াট কোন সাক্ষ্য দেবেন না, দেনও নাই। প্রায় এক বছর কয়েক মাস হাজত খেটে বের হবার পর জীবন্ত যৌবন সমৃদ্ধ একজন মানুষ ফিরে এলেন লাঠিতে ভর করা একজন অত্যন্ত অসুস্থ দুর্বল ব্যক্তি হিসেবে। পরবর্তীতে এ ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মহান রব তাঁকে শহীদি দরজা দান করুন। আমীন।

লেখক: কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি। প্রবীণ রাজনিতিক, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী। ১৯৯১ সালে ফেনী-৩ (সোনাগাজী-ফেনী সদর) আসন থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িপাল্লা মার্কায় নির্বাচন করেন।

মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.)
একটি প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্র

এই কঠিন সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত সংগঠনের নেতৃত্বদানের যে মহা পরীক্ষা, যা ইসলামের ইতিহাস বা ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে বিরল। বিষয়টি বিশ্লেষণ করে উপলব্ধি করতে পারলে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন মরহুমের কুরবানীর মান কোন স্তরে ছিলো ।

এ.জি.এম বদরুদ্দোজা

মরহুম মকবুল আহমাদের মত একজন গুনী মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ জীবন পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা আমার মত ক্ষুদ্র ও নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়। তাছাড়া এই ক্ষুদ্র পরিসরে তা অবাস্তবও বটে। তারপরও মনের গভির আবেগ ও ভালোবাসার কারণে, সংগঠনের পরামর্শে ও জাতীয় কল্যাণার্থে মকবুল সাহেবের বাস্তব জীবনের ২/৪ টি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার চেষ্টা করবো। আমি আগে ভাগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এ জন্য যে, মুহতারামের রাজনৈতিক জীবন ও সাংগঠনিক জীবন আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া এ বিষয়গুলো আমাদের মুহতারাম দায়িত্বশীলগণ আলোকপাত করবেন। আমি শুধু উনার ব্যক্তি ও বাস্তব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে বিষয়গুলো উপস্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ।

উনার সাথে আমার প্রাথমিক পরিচয় হয় উনার ছোট ভাই ডাঃ শহীদ আহমদসহ আমরা যখন সোনাগাজী মাদ্রাসায় পড়ালিখা করি। সম্ভবত: ১৯৬৭ সালের শেষ ভাগে। তখন আমরা ৭ম শ্রেণির ছাত্র ছিলাম। তখন তিনি মাসে ১বার সোনাগাজী সফরে গিয়ে বাজারের ভিতর ইদ্রিছ মিয়ার হোটেলে বসতেন। আমি ও শহীদ বড় ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যেতাম। তিনি ছোট ভাই হিসেবে স্নেহসুলভ ভাবে আমাদেরকে "জাহানে নও" পড়তে এবং ছড়া ও কবিতা লিখতে পরামর্শ দিতেন। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭৭ সালে ছাত্রশিবিরের সাথী হওয়ার পর নিজ এলাকায় সিলোনীয়াতে সাথী শাখায় মাঝে মধ্যে সাক্ষাৎ হত। অবশেষে কুমিল্লা শহরের ইবনে তাইমিয়া স্কুলের

শিক্ষকতার সময় ১৯৭৯ সালে আমি রুকনপ্রার্থী হলে সাংগঠনিকভাবে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৮২ সালে আমি যখন ফেনী মহকুমা নাজিম তখন তিনি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে একনিষ্ঠভাবে এবং সাংগঠনিক পদ্ধতি মোতাবেক ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের মজবুত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সাংগঠনিক জীবন শুরু করে উনার মৃত্যু পর্যন্ত আমি উনাকে বাস্তবে যতটুকু পেয়েছি ও দেখেছি তার কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচনার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়- অনেক সময় মৃত ব্যক্তির স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা বা আবেগ তাড়িত হয়ে সম-সাময়িক কিছু ঘটনা অথবা ভালোবাসার টানে চমক লাগানো কিছু তথ্য উপাত্ত দিয়ে স্মরণ করা হয়ে থাকে। আমি সে পথ বর্জন করে মরহুমের জীবনী অনুসরণের নিয়তে একটু ব্যতিক্রম করেছি। যে বিষয়গুলো আলোচনা করবো সেগুলো হচ্ছে-

১. আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হিসেবে
২. আমলে সালেহ সম্পন্নকারী হিসেবে
৩. আনুগত্যের বাস্তব নমুনা হিসেবে
৪. পরামর্শভিত্তিক কর্ম পরিচালনাকারী হিসেবে
৫. ত্যাগ ও কুরবানীর সোনালী মডেল হিসেবে
৬. ইসলামী নৈতিকতা ও মানবীয় চরিত্রের ফুটন্ত গোলাপ হিসেবে

১। <u>আল্লাহর দিকে আহ্বান কারী হিসেবে :</u>

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

অর্থ: "সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎ কাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি মুসলমান।" (সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ- ৩৩)

اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

অর্থ: "হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তোমার রবই বেশী ভালো জানেন কে তাঁর পথচ্যুত হয়ে আছে এবং কে আছে সঠিক পথে।" (সূরা নাহল- ১২৫)

আল কুরআনে বর্ণিত উক্ত দুটো আয়াতের অর্থ-তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তখন আমরা সকলেই প্রায় আসামীর পর্যায়ে পড়ে যাবো। অনেক ট্রেনিং ও প্রশিক্ষণ (টিসি, টিএস, শববেদারী) এর মাধ্যমে জামায়াত তার দায়িত্বশীল ও কর্মী বাহিনীকে উক্ত আয়াতদ্বয়ের আমল বা বাস্তবায়নের কঠিন চেষ্টা করে থাকে। তারপরও আমাদের জড়তা ও হীনমন্যতা কাটিয়ে

স্বত:স্ফূর্তভাবে প্রাণ খুলে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার অভ্যাসও যোগ্যতা গড়ে উঠেনা। মুহতারাম মকবুল আহমাদ সাহেব ১৯৬২ সাল থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত দাওয়াতী কাজে শতভাগ আন্তরিকতা ও ঈমানের মজবুতির সাথে কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং সফলও হয়েছেন।

"৮০ ও ৯০ এর দশকের প্রায় সকল স্তরের দায়িত্বশীলদের মধ্যে আল কুরআনের উক্ত নির্দেশিকা পালনে সক্রিয় ছিলেন। সে অভ্যাস বর্তমান সময়ের দায়িত্বশীলদের মাঝে খুব কমই দেখা যায়। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাহেব (নায়েবে আমীর) যখন সংসদ সদস্য ছিলেন তখন মকবুল আহমাদ এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি দাওয়াতী টীম দীর্ঘ কয়েক বৎসর যাবত দাওয়াতী কাজের আঞ্জাম দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তাদের সে দাওয়াতের ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বাংলার ঘরে ঘরে লক্ষ কোটি দায়ী তৈরী হয়েছে এবং দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

<u>মরহুমের দাওয়াতে দ্বীনের বাস্তব নমুনা :</u>

মরহুম মকবুল আহমাদ সাহেবের বেশ কয়েকটা পুরোনো ডায়েরী ছিলো। এর মধ্যে দুটো ডায়েরী সম্পর্কে আমি জানি, যা তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন। ১টি দাওয়াতী কাজের আর অপরটি অন্যান্য তথ্য উপাত্ত, গোপনীয় রেকর্ড, আমানত লেনদেনসহ সকল প্রকার তথ্য সংরক্ষণের জন্য। দাওয়াতী ডায়েরীতে দেশের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, (সরকারী, বেসরকারী) ব্যক্তিগণের নাম, ঠিকানা, অফিস, পদবী, ফোন নাম্বার লিপিবদ্ধ ছিলো। এর একটি অংশে ফেনী জেলার বিশেষ (VIP) লোকদের লিষ্টও ছিলো। আমি জেলা আমীর থাকা অবস্থায় জেলার বিভিন্ন কাজে যেমন সামাজিক, সাংগঠনিক, জাতীয় নির্বাচন নিয়ে উনার সাথে মাসে ২/১ বার সময় নির্ধারণ করে নিতাম। তখন তিনি দাওয়াতী ডায়েরীর লিষ্ট মোতাবেক ফোন করে আমাকেসহ সাক্ষাতে যেতেন। যেখানে তিনি যেতে সময় পাননি, সেখানে ফোন করে আমাকে পাঠাতেন। প্রায় ১০/১২ বৎসর তিনি আমাকে ফেনী জেলার আনুমানিক ৮০/৯০ জন বিশেষ ব্যক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তেমনিভাবে চট্টগ্রাম শহরেরও বেশ কিছু লোকের সাথে পরিচয় করে দেন। এভাবে তিনি পরিকল্পিত দাওয়াতী কাজে অভ্যস্থ ছিলেন এবং একাজে আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে অভ্যস্থ করেছিলেন যা অন্য কারো কাছ থেকে আমি পাইনি।

২। <u>আমলে সালেহ সম্পন্নকারী</u> :

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

অর্থ: "সময়ের কসম। মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করতে থেকেছে এবং একজন

অন্যজনকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিতে থেকেছে।" (সূরা আসর ১-৩)

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থ: "রসূল যা কিছু তোমাদের দেন তা গ্রহণ করো এবং যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদের বিরত রাখেন তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (সূরা হাশর- ০৭)

কোরআনের নির্দেশ "আমলে সালেহ" করার। আমাদের সমাজে আমলে সালেহ সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা প্রচলিত রয়েছে। সঠিক স্প্রীট জানা না থাকলে কোন ব্যক্তির কাজ আমলে সালেহের মধ্যে পড়ে তা নির্ণয় করা মুশকিল হয়ে যাবে। সুরায়ে আল আসরে ধ্বংস হতে বাঁচতে হলে যে ৪টি কাজ উল্লেখ করা হয়েছে ঈমানের পরই আমলে সালেহ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুরায়ে হাশরের ৭নং আয়াতে বলা হয়েছে রাসূল (স) তোমাদেরকে যা যা করতে বলেছেন তা অনুসরণ কর এবং যা যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো। বিষয়টি মানুষের জীবন দর্শনের সাথে (দুনিয়ার জীবন/ পরকালীন জীবন) জড়িত। আজীবন আমলে সালেহের উপর টিকে থাকা অত্যন্ত কষ্টকর ও আল্লাহর মঞ্জুরীর উপর নির্ভর করে। মরহুম মকবুল আহমাদ সাহেবকে ছাত্রজীবন থেকে কর্মজীবন পর্যন্ত যারা দেখেছে বা যারা সাথী ছিলো, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন তিনি একজন আমলে সালেহ সম্পাদনকারী ছিলেন। '৮০ এর দশক থেকে শুরু করে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমরা মরহুমকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমলে সালেহ সম্পাদনকারী হিসেবে পেয়েছি।

প্রকৃতপক্ষে সৎকাজ পুরোপুরিভাবে সম্পাদনকারী ব্যক্তি সংগঠনের ভিতরে ও বাহিরে বেশী সংখ্যক পাওয়া যায়না। যেমন তার জীবনের বাস্তব একটি উদাহরণ তুলে ধরছি। মরহুম বাংলাদেশ আমলে দু'বার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন ফেনী-২ নং আসন থেকে। আমি নির্বাচনী এলাকার পরিচালক ছিলাম মর্মে আমাকে আশ পাশের জেলাগুলোর কোন কোন দায়িত্বশীল যুক্তি দেখিয়েছিলেন নির্বাচন মানে এক প্রকার যুদ্ধ। যুদ্ধে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে বিজয় লাভ করা সম্ভব। সে হিসেবে জাল ভোটও আমরা দিতে পারি। জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল, মান সম্মান, ব্যক্তিত্ব সবকিছু উপেক্ষা করে মরহুম বলেছিলেন আমলে সালেহ বা সৎ কর্ম বিসর্জন দিয়ে, পরকাল নষ্ট করে দুনিয়ার কোন বিজয় বা ব্যক্তিত্ব রক্ষা করতে আমি পারবোনা। বাস্তবে প্রমাণিত হল আমরা যারা কৌশল চিন্তা করেছিলাম তারা পরাজিত। মরহুম বিজয় লাভ করেছেন, পরকালীন সফলতার এক ধাপ এগিয়ে ছিলেন আমলে সালেহ বা সৎ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে। মহান রাব্বুল

আলামীন মানব জাতীকে তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। আল কুরআন দায়িত্ব পালনের "গাইডবুক"। যিনি এ দায়িত্ব পালন করবেন তিনিই আল কুরআনের অনুসারী, তিনিই আমলে সালেহ সম্পাদনকারী। মুহতারাম মরহুম আমলে সালেহ সম্পাদনকারীর বাস্তব চিত্র। মরহুমের এই মহান গুণটি আমাদের জীবন পরিবর্তনের এক আলোকবর্তিকা ও তাঁর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের প্রশস্ত রাজপথ।

৩। আনুগত্যের বাস্তব নমুনা হিসেবেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ.

অর্থঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের আমল ধ্বংস করো না। (সূরা মুহাম্মদ- ৩৩)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي. رواه البخاري : ٢٩٥٧

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত- রাসূল (সা.) বলেছেন- "যে আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। যে আমার অবাধ্য হল, সে আল্লাহরই অবাধ্য হল। যে আমীরের আনুগত্য করলো সে আমার আনুগত্য করলো, আর যে আমীরের আদেশ অমান্য করলো সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আদেশ অমান্য করলো।" (বোখারী- ২৯৫৭)

আল কোরআন ও হাদীসে রাসূল (স) এর নির্দেশ অনুসারে জামায়াতী জীবন, সংগঠন, নেতৃত্ব ও আনুগত্য সম্পর্কে বিস্তারিত নীতিমালা দেয়া হয়েছে। ইসলামী সাহিত্য, টিসি, টি.এস, বক্তৃতা ও প্রশিক্ষণগুলোতে গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। তারপরও বাস্তবে আমরা এর ব্যতিক্রম ও বাস্তব জীবনে শতভাগ অনুসরণকারীর অভাব দেখি। মুহতারাম মরহুমকে সাংগঠনিক জীবনের সকল স্তরে আনুগত্যের বাস্তব নমুনা, বাস্তব প্রতীক বা বাস্তব উদাহরণ হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি। জামায়াতের কেন্দ্রিয় প্রোগ্রামগুলো যেমন- আরকান সম্মেলন, শূরার অধিবেশন, জেলা আমীর সম্মেলন, কেন্দ্রিয়ভাবে প্রশিক্ষণ শিবির ইত্যাদি প্রোগ্রামগুলোতে, দায়িত্বশীলদের মধ্যে আনুগত্যের বাস্তব চিত্র লক্ষণীয়। সকল পর্যায়ে আমি দেখেছি মুহতারাম মরহুমকে শতভাগ আনুগত্যের বাস্তব নমুনা হিসেবে।

আমি উনাকে পেয়েছি কেন্দ্রিয় কর্মপরিষদ সদস্য, সাংগঠনিক সেক্রেটারী, সহ-সেক্রেটারী, নায়েবে আমীর, ভারপ্রাপ্ত আমীর এবং সর্বশেষ আমীরে জামায়াত হিসেবে। মরহুমের জীবনের বাস্তব ঘটনা আমার দেখা ২/৩টি উদাহরণ দিচ্ছি।

(১) বিভিন্ন জেলাতে যখন সাংগঠনিক কঠিন সমস্যা দেখা দেয়, তখন মুহতারাম আমীরে জামায়াত উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য মরহুমকে প্রধান করে টীম গঠন করে দিতেন। কারণ সমস্যা সমাধানে বিচক্ষণতা ও আনুগত্যের বিষয়ে উনার প্রতি আমীরে জামায়াতের মজবুত আস্থা ছিলো।

(২) কেন্দ্রিয় দায়িত্বশীলদের সফরসূচী কাজ শেষে চূড়ান্ত হয়ে পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহে ছাপা হয়ে জেলাগুলোতে পাঠিয়ে দেয়া হতো। তারপরও জরুরী ভিত্তিতে আমীরে জামায়াত যখন ২/১টি অতিরিক্ত সফর যোগ করতেন মরহুম সেটাও ব্যবস্থা করে নিতেন। শুধু ১দিন দেখেছি, জরুরী একটা কাজ আমীরে জামায়াত তারিখ উল্লেখ করে মরহুমকে করতে বলেন- তখন মরহুম আমীরে জামায়াত কে উক্ত তারিখে জেলাতে প্রোগ্রাম দেয়া আছে বললেন। তখন আমীরে জামায়াত উপস্থিত পরামর্শ করে ভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করে দেন।

(৩) যিনি নিজে আনুগত্যের মান শতভাগ বজায় রাখেন, তাঁর অধঃস্তন সংগঠনও তার প্রতি আনুগত্যের মান ও ভক্তি শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রাখেন। মুহতারাম মকবুল আহমাদ তেমনি ১ম কাতারের একজন দায়িত্বশীল।

(৪) কেন্দ্রিয় প্রোগ্রামগুলোতে যখন আলোচনার (বক্তৃতা) কর্মসূচী চলে, তখন কোন কোন দায়িত্বশীল দায়িত্বের কারণে একটু ডান বাম বা নড়াছড়া করতে দেখা যায়। কিন্তু মুহতারাম মকবুল আহমাদকে দেখেছি একজন মনোযোগী ছাত্রের ন্যায় পুরো বক্তৃতা শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করছেন।

(৫) আমীর, নায়েবে আমীর, সেক্রেটারী জেনারেলসহ কেন্দ্রিয় দায়িত্বশীলদের কেন্দ্রিয় রুকন ইউনিট নামে একটা শাখা রয়েছে। কেন্দ্রিয় দায়িত্বশীলদের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ও আনুগত্যের মান বজায় রাখার কারণে মুহতারাম উক্ত শাখার সভাপতি হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যারা উক্ত শাখার সদস্য হিসেবে ছিলেন তাদের অনেকের মুখেই মরহুমের আনুগত্যের বিষয়টি আমি শুনেছি।

মরহুমের বাস্তব জীবন থেকে আমরা ব্যক্তিগতভাবেও সাংগঠনিকভাবে আনুগত্যের মান বজায় রাখতে পারি মহান রব আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন। আমীন॥

৪। <u>পরামর্শভিত্তিক কর্ম পরিচালনা :</u>

মহান আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.

অর্থ: "যারা তাদের রবের নির্দেশ মেনে চলে, নামায কায়েম করে এবং

নিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে চালায়, আমি তাদের যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। (সূরা শূরা- ৩৮)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত- রাসূল (স) বলেছেন- যখন তোমাদের নেতারা হবেন ভালো মানুষ, ধনীরা হবেন দানশীল এবং তোমাদের সকল কাজকর্ম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন মাটির উপরিভাগ নিচের ভাগ হতে উত্তম হবে।" (তিরমিযি আংশিক)।

আল কুরআন ও হাদীসে রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক পরামর্শ ভিত্তিক কাজ সম্পাদন করা প্রত্যেক দায়িত্বশীলের জন্য বাধ্যতামূলক। তারপরও অনেক দায়িত্বশীল তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে পরামর্শের গুরুত্ব না দিয়ে শুধু নির্দেশমূলক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, যেখানে নিজের মতকে প্রাধান্য দিয়ে থকেন। মুহতারাম মরহুমকে আমরা দেখেছি ঘরে বাইরে, সংগঠন পরিচালনায়, সামাজিক কাজ কর্মে, রাজনৈতিক বিষয়গুলোতে অর্থাৎ সকল পর্যায়ে পরামর্শভিত্তিক কাজ সম্পন্ন করতেন এবং সমস্যার সমাধানও করতেন।

ফেনী, নোয়াখালী ও কেন্দ্রিয় পর্যায়েও দেখেছি জরুরীভাবে তিনি যে কোন কাজের সিদ্ধান্ত দিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সকল স্তরের সকল পর্যায়ের বৈঠকাদিতে পরামর্শ না করে কোন মতামত বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতেন না। শূরার অধিবেশন ও জেলা আমীর সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামায়াত প্রত্যেকটি হেদায়েতী বক্তব্যে দায়িত্বশীলদের প্রতি প্রত্যেক কাজ পরামর্শভিত্তিক করতে জোরালোভাবে গুরুত্ব দিতেন। তারপরও দেখেছি কোন কোন জেলাতে পরামর্শভিত্তিক কাজ না করায় জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। মুহতারাম মকবুল আহমাদ সাহেবকে দেখেছি আজীবন সকল পর্যায়ে নিজে পরামর্শভিত্তিক কাজ করতে এবং অন্যদেরকে করাতে কঠিনভাবে অভ্যস্থ ছিলেন। মুহতারাম আমীরে জামায়াত (সাবেক) অধ্যাপক গোলাম আযম এর দায়িত্ব পালনে জীবনে দেখেছি শতভাগ পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতেন। তেমনিভাবে মুহতারাম মরহুমকেও দেখেছি শতভাগ পরামর্শ ভিত্তিক সংগঠন পরিচালনা করতেন।

জাতীয় নির্বাচনে গণসংযোগ ও নির্বাচনী সভাগুলোতে মুহতারাম সংগঠন পদ্ধতি মোতাবেক নিয়ম শৃংখলা ও সময়ানুবর্তিতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। আমরা তখন পরামর্শ দিয়েছি নির্বাচনে পাবলিক জড়িত, জনগণের মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। এরপর আমাদের পরামর্শ মেনে নিয়ে তিনি গণসংযোগ ও নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলেন। জেলা পর্যায়ের দায়িত্ব পালন থেকে শুরু করে (আমৃত্যু) আমীরে জামায়াত পর্যন্ত পুরো জীবন তিনি এই নীতির উপর অটল ও দৃঢ় ছিলেন। আল্লাহ মরহুমের জীবনী থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

৫। **ত্যাগ ও কুরবানীর সোনালী মডেল :**

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.

অর্থ: তোমরা কি মনে করেছো, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখে নেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং কারা জিহাদ করতে গিয়ে ধৈর্যধারণ করতে পারে। (সূরা আলে ইমরান- ১৪২)।

উক্ত আয়াতে জিহাদ ও সবরকে বাংলা ভাষায় ত্যাগ ও কুরবানী বলা হয়েছে। এর আরো ২টি অর্থ হচ্ছে- জুলুম নির্যাতন সহ্য করা ও আমৃত্যু জীবন ও সম্পদকে আল্লাহর পথে সমর্পণ করা। এই মহৎ গুন ও যোগ্যতা আমরা মরহুম মকবুল আহমাদ সাহেবের পুরো জীবনে দেখেছি। বিষয়টি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করলে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হবে। এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে শুধুমাত্র আংশিকভাবে ইংগিত দেয়ার চেষ্টা করবো।

বিষয়টি উপস্থাপন করতে আমি মরহুমের জীবনকে মাত্র দুটো অধ্যায়ে ভাগ করে দেখাতে চাই।

১ম অধ্যায়ে ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রায় এক দশক কাল। এ সময়ে আত্মগোপন, হিজরাত, আন্ডারগ্রাউন্ড সাংগঠনিক কাজে নেতৃত্ব দান। (জেলা দায়িত্বশীল থেকে কেন্দ্রীয় তদারককারী) তখনকার সময় সর্বোচ্চ কুরবানী, চরম পরীক্ষা, ত্যাগ-তিতিক্ষার চূড়ান্ত একটা পর্যায় অতিবাহিত করেছেন। অনেকের জীবনে এ অধ্যায়টি ছিলো কুরবানীর শেষ স্তর। মুহতারাম মরহুম আল্লাহর অশেষ সাহায্য ও রহমতের বদৌলতে কঠিন এক দশক পরীক্ষায় কাটিয়েছেন।

২য় অধ্যায় চূড়ান্ত পর্যায়ের জুলুম নির্যাতন ও পরীক্ষা। এই পরীক্ষার সময়সীমা প্রায় ১ যুগ ২০১১ হতে ২০২১ বা মৃত্যু পর্যন্ত। এ সময়টি তাঁর কঠিন দায়িত্ব ছিলো- নায়েবে আমীর, ভারপ্রাপ্ত আমীর ও আমীরে জামায়াত। যে দায়িত্ব পালনে তিনি আত্মগোপনে, হিজরাত অবস্থা, চরম অসুস্থতা, হুলিয়া, কারাভোগসহ সকল অবস্থায় দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আর উক্ত সময়ে তাঁর সাথী (সাবেক আমীর, বর্তমান আমীর, নায়েবে আমীর, সেক্রেটারী জেনারেলসহ কেন্দ্রীয় টীম) গণের উপর চলছিলো নানা ধরনের মিথ্যা ষড়যন্ত্রের সাজানো নাটক। তথাকথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের নামে গ্রেফতার, রিমান্ড, জুলুম-নির্যাতন, আদালত নামের হয়রানী, মিথ্যা মামলাসহ পুরো দেশ জুড়ে চলছে জামায়াত ধ্বংসের আন্দোলন, সাজানো মিথ্যা মামলায় পরিকল্পিত ত্রাস সৃষ্টি ও ফাঁসি কার্যকর।

এই কঠিন সময়ে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত সংগঠনের নেতৃত্বদানের যে মহা পরীক্ষা, যা ইসলামের ইতিহাস বা ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে বিরল। বিষয়টি বিশ্লেষণ করে উপলব্ধি করতে পারলে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন মরহুমের কুরবানীর মান কোন স্তরে ছিলো। লিখতে বসে চিন্তা করতে করতে আমার কলম আর চলে না। তাই একদিন কলম বন্ধ করে শুধু চিন্তার সাগরে ডুবে গেলাম।

যুগে যুগে মহামানব ও ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের জুলুম-নির্যাতন ও কুরববানীর ইতিহাস থেকে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তার চাইতেও অধিক মাত্রায় মরহুম মকবুল আহমাদ সাহেবের জীবনে কুরবানী এসেছে। যেমন- (ক) জেলখানার জীবনে, কারাভোগের জুলুম (খ) হিযরাত বা বাড়ী ঘর ত্যাগ করে যাযাবরের জীবন যাপন করা (গ) মামলা হামলা ও হুলিয়াসহ কয়েক বৎসর অতিক্রম (ঘ) আত্মগোপনে থেকে সংগঠনের সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন (ঙ) শারিরীকভাবে চরম সংকটাপন্ন অবস্থায় সকল কর্ম পরিকল্পনা সম্পাদন করা (চ) দায়িত্বশীল সাথীদের উপর জুলুম-নির্যাতন, ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে শহীদ করাসহ এ সকল পরিবেশ অবলোকন করে ধৈর্যধারণ করা।

উপরোক্ত সকল অবস্থায়ও সংগঠনের চরম বিপর্যের সময় দায়িত্ব পালন, পরিস্থিতি মুকাবিলা করে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রায় ১ যুগ পর্যন্ত অতিক্রম করা কোন স্তরের কুরবানী তা চিন্তাশীলগণ মূল্যায়ণ করবেন। ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে বিভিন্নমুখী পরীক্ষা একজনের উপর আসার ঘটনা বিরল। তাই মরহুম মকবুল আহমাদ সাহেব অগ্নীপরীক্ষার এক জ্বলন্ত ও সোনালী মডেল হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সে মডেল অনুসরণ করার তৌফিক দান করেন। আমীন॥

৬। ইসলামী নৈতিকতা ও মানবীয় চরিত্রের ফুটন্ত গোলাপ :

আদম (আ.) এর সৃষ্টির পর থেকে সকল নবী ও রাসূলগণকে আল্লাহ তাঁর খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত নবীদের দায়িত্ব সমাপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সহ যুগে যুগে মুজাদ্দিদগণ, ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, মহা মানব ও সমাজ সংস্কারকগণ খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিলো- মৌলিক মানবীয় গুনাবলী, ইসলামী নৈতিকতা ও রাসূলে আকরামের শেখানো মহান চরিত্রের আদর্শ নমুনা। মরহুম মকবুল আহমাদ সাহেবকে আমরা দেখেছি তেমনি মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও ইসলামী নৈতিকতার এক জ্বলন্ত প্রদীপ। তার জীবনের গুনাবলীর ব্যাখ্যা ও বাস্তব জীবনের ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এ স্বল্প পরিসরে প্রত্যেকটি গুনের বিশ্লেষণ করতে হলে আমার এ ক্ষুদ্র লিখাটি

প্রকাশের সিমানা পেরিয়ে যাবে। তাই শুধু পয়েন্টগুলো উপস্থাপন করা হলো যাতে করে সম্মানিত পাঠকগণ সহজেই উনার জীবনের কাজগুলো চিন্তার জগতে এনে, তা বাস্তব জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারে। কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হচ্ছে-

১. মজবুত ঈমান
২. আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী
৩. সত্যিকারের মুত্তাকী
৪. ধৈর্যের পাহাড়
৫. উঁচু মানের আমানতদার
৬. ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী
৭. কঠোর সময়ানুবর্তি
৮. ইনসাফ বা ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী।
৯. উখুয়্যাত বা ভ্রাতৃত্ব রক্ষাকারী
১০. ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজের অধিকারী
১১. মিষ্টিভাষী
১২. আকাশের ন্যায় প্রশস্ত মনের অধিকারী
১৩. অনাড়ম্বর জীবন যাপনকারী
১৪. পরিবার, সমাজ ও সংগঠন সকল স্তরে নিয়ম শৃংখলার অনুসারী
১৫. পরিপাটি, সাজানো ও সুন্দর জীবন যাপন
১৬. তিনি যেন জান্নাতী ফুল বা পবিত্র আত্মা।

পরিশেষে বলতে হয়, মরহুম মকবুল আহমাদ সাহেব নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে জান্নাতের উন্নত স্তরে স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে অসংখ্য ভক্ত ও অনুসারী ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করে চোখের পানিও ফেলেছেন। আমি ক্ষুদ্র তাই আমার সে যোগ্যতা ও জ্ঞান কোনটাই নেই। তারপরও আমার আবেগভরা একটা অনুরোধ থাকবে, আমরা যদি সিদ্ধান্ত নিতে পারি ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে মরহুমের মত হবো। তিনি যে কাজ করে জান্নাতের ফুল হলেন, আমিও সে কাজ করে জান্নাতের ফুল হতে চাই। এক কথায় মরহুমের আত্মা তখনই পরিতৃপ্ত হবে, যখন তাঁর সাথীদের কমপক্ষে একটা অংশ সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, আমরা মরহুমের আদর্শ ও চরিত্র হুবহু অনুকরণ করবো। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর (আল্লাহর) ভালোবাসার মাধ্যমে জান্নাতী ফুল হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন॥

লেখক : সাবেক ফেনী মহকুমা ও পরে জেলা আমীর।

গুণী ব্যক্তিত্ব মকবুল আহমাদ (রহ:)

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার

মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) ছিলেন একজন সৎ ও গুণী ব্যক্তিত্ব। বাল্যকাল থেকেই জামায়াতে নামাজ আদায়, কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত, মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা এবং নিয়মিত পড়াশুনার প্রতি অধিক মনোযোগী ছিলেন।

তার শিক্ষা জীবন শুরু হয় দাগনভূঞার পূর্বচন্দ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রাথ মিক শিক্ষা শেষে কামাল আতাতুর্ক হাই স্কুলে ভর্তি হন। হাই স্কুলে পড়াকালীন সময়ে তার সাথে আমার প্রথম পরিচয়। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি ফেনী সরকারী কলেজে ভর্তি হন। কলেজে অধ্যয়নকালে ফেনী আলীয়া মাদরাসা হলে এক দাওয়াতুন্নবী (সা.) মাহফিলে ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক গোলাম আযমের বক্তব্য শোনেন অত্যন্ত আগ্রহের সাথে। তখন থেকে তার মধ্যে দ্বীনি কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়নের পাশাপাশি তিনি সম-সাময়িক ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকদের লেখা বই-পুস্তক পড়তেন এবং তার পরিচিত শিক্ষিত লোকদেরকে ইসলামী বই-পুস্তক পড়তে দিতেন। তখন দেশে সামরিক শাসন চলছিল।

কলেজে অধ্যয়নকালে ফেনী আলীয়া মাদরাসা হলে এক দাওয়াতুন্নবী (সা.) মাহফিলে ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক গোলাম আযমের বক্তব্য শোনেন অত্যন্ত আগ্রহের সাথে। তখন থেকে তার মধ্যে দ্বীনি কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়নের পাশাপাশি তিনি সম-সাময়িক ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকদের লেখা বই-পুস্তক পড়তেন।

১৯৬২ সালে সামরিক শাসনের অবসান হলে দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা আরম্ভ হয়। তখন থেকে তিনি জামায়াতে

ইসলামীর সাংগঠনিক কর্মকান্ডের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। ফেনী সরকারী কলেজ থেকে বিএ পাশ করার পর তিনি সদর উপজেলার সরিষাদী হাই স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। সেখানে কয়েক বছর সুনামের সাথে শিক্ষকতা করার পর ফেনী সেন্ট্রাল হাই স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক মরহুম কামাল হাসান চৌধুরী তাকে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সফলতার সহিত খ্যাতনামা ফেনী সেন্ট্রাল হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি জামায়াতে ইসলামীর ফেনী শহর কমিটির সভাপতি ও পরবর্তীতে ফেনী মহকুমা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ধর্মীয় রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু হলে জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ মকবুল আহমাদকে সংগঠনের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়ে যান। তৃণমুল থেকে বেড়ে ওঠা এ সাংগঠনিক কর্মবীর ক্রমশঃ যোগ্য ও দক্ষ হয়ে গড়ে উঠেন। বেশ কয়েক বছর তিনি দলের বিভিন্ন দায়িত্ববান পদে থেকে কাজ করেন এবং পরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীর নির্বাচিত হন। দলের গুরুত্বপূর্ণ এ পদে থেকে তিনি সুচারুরূপে বেশ কয়েক বছর অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। সাংগঠনিক ব্যস্ততার মাঝেও তিনি সর্বদা নিজ এলাকার মানুষের খোঁজ খবর রাখতেন। সাধ্য অনুযায়ী দু:স্থ ও অসহায় মানুষকে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করতেন। আমীরে জামায়াত পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার কয়েক মাস পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চলতি বছরের ১৩ এপ্রিল দুপুরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। একইদিন রাত ১১টায় নিজ জেলা ফেনীর দাগনভূঁএঞা উপজেলার ওমরাবাদ গ্রামে পূর্ব পুরুষের বসত বাড়ীর প্রাঙ্গণে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় তার আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, সহকর্মী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, আলেম-ওলামা, ব্যবসায়ী ও বিপুল সংখ্যক মুসল্লি অংশ নেন।

মহান আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে দোয়া করি- তিনি যেন এ মহৎ ব্যক্তির সব নেক আমল কবুল করে তাকে জান্নাতের আ'লা দরজা নসীব করেন।

লেখক : বর্তমানে সেক্রেটারী, ফেনী মহিলা মাদরাসা, প্রবীণ রাজনীতিবিদ, বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, কলাম লেখক। ইসলামীক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) এর সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল। মরহুম মকবুল আহমাদের দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু/ দায়িত্বশীল।

মকবুল আহমাদ সাহেব
ইসলামী আন্দোলনের বাতিঘর

কবির আহমদ

পুলিশ প্রশাসনের লোকেরা উনাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে উনি সুস্পষ্টভাবে উত্তর দিতেন। পুলিশ প্রশাসনের লোকদের ও তাদের পরিবারের খোঁজ খবর নিতেন। পুলিশ প্রশাসনের লোকদেরকে ইসলামী জীবন যাপনের জন্য দাওয়াত দিতেন। তাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, পর্দা করা, তাদের পরিবারকে পর্দা করার জন্য তাগিদ দিতেন। পুলিশ প্রশাসনের লোকজন আশ্চর্য হয়ে বলতেন, 'উনি কেমন মানুষ, ভয় ভীতি বলতে কিছু নাই। উল্টো আমাদেরকে রিমান্ড নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন এবং নসিহত করতেন!'

মুহতারাম মকবুল আহমাদ সাহেব আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনি পরকালের জগতে চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে। এই ক্ষণজন্মা মানুষটি আপাদমস্তকে একজন সাহাবা চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তিনি পুরো জীবন ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। অত্যন্ত কঠিন ও বিপদজনক সময়ে তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর এবং পরে আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যদি আমীরের দায়িত্ব পালন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিতেন দুনিয়ার মানুষের কাছে জামায়াতে ইসলামীর মান মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেত বলে আমার ধারণা। এই মানুষটি সম্পর্কে লিখতে ভয় হয় না জানি কিছু কম লিখা হয়ে যায়। একদিন তিনি সাংগঠনিক সফর শেষে ফেনী থেকে ঢাকা আসছেন। ফেনী মহিপালে রাস্তায় দুইজন মানুষ ঢাকা আসার জন্য গাড়ীর অপেক্ষায় আছে। এমন সময় মকবুল আহমাদ সাহেবের গাড়িটি এসে দুইজন লোকের সামনে থামলো। লোক দু'টি হলো একজন উনার আপন ভাতিজা আর একজন জামায়াতের রুকন। মকবুল আহমাদ সাহেব তার ভাতিজাকে বললেন এই গাড়িটির মালিক জামায়াতে ইসলামী তাই যেই লোকটি জামায়াতের রুকন

গাড়িতে ঢাকা যাওয়ার আধিকার তার বেশী আর গাড়িতে সিটও খালি আছে একটি। এই বলে জামায়াতের রুকনকে গাড়িতে উঠিয়ে নিলেন এবং উনার ভাতিজাকে বললেন রাতে উনার বাসায় থেকে সকালে তার কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য। আল্লাহ তোমার এই দায়ীকে কবরে হাশরে বেহেশতে সম্মানিত কর। আমাদেরকে তার জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে ইসলামী আন্দোলন করার তৌফিক দাও।

১৯৮৬ সালে জাতীয় নির্বাচন :

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী- ২ আসন থেকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তৎকালীন সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মকবুল আহমাদ সাহেবকে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে প্রার্থী দেওয়া হয়। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন হাটে বাজারে নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মকবুল আহমাদ বক্তব্য রাখতেন। তার স্বভাব সুলভ বক্তব্য ঃ "আমি আপনাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিতে পারবোনা, কারণ সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব হলো দেশের জন্য আইন রচনা করা। জনগণকে হালুয়া রুটি দেওয়া নয়। আপনারা যদি আমাকে নির্বাচিত করেন আমি আপনাদের জন্য বিনা সুদে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবো।" মকবুল আহমাদ সাহেবের প্রায় সকল নির্বাচনী সভায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখতেন তৎকালীন ফেনী প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোফাসসেরুল হক খন্দকার। মোফাসসের ভাইয়ের মাঠ কাঁপানো বক্তব্য লোকেরা এখনও স্মরণ করেন। ঘটনার পালাক্রমে মরহুম মোফাসসেরুল হক খন্দকার পরবর্তিতে মকবুল অহমাদ সাহেবের বেয়াই হন। উনার মেঝ ছেলে ইমরান মোফাসসেরুল হক ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করেন। আর আমাদের মত ছোট খাট দুই চারজন বক্তাকেও মকবুল আহমাদ সাহেবের নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে হতো।

যানবাহন বলতে একটা মাত্র হোন্ডা। মোফাসসের ভাই ড্রাইভ করতো, মকবুল আহমাদ সাহেব মাঝখানে বসতেন পিছনে আমাদের মত একজন। এই রকম একদিন আমার এলাকায় শর্শদী হাইস্কুল মাঠে পাল্লা মার্কার সমর্থনে জনসভা বিকাল ৫টায়। আমি তখন ফেনী সরকারী কলেজ ছাত্র শিবিরের সভাপতি। যথারীতি মোফাসসের ভাই হোন্ডা ড্রাইভ করছেন স্যার মাঝখানে বসা আমি পিছনে জনসভার উদ্দেশ্যে ফেনী থেকে রওয়ানা দিয়ে বিকাল ৪টায় শর্শদী বাজারে পৌছলাম। আমাদের হোন্ডা শর্শদী বাজারে পৌছানোর সাথে সাথে বিপরীত দিক থেকে একটা লোক দৌড়ে আমাদের দিকে আসছে। তিনি আওয়ামীলীগের একজন লোক। আজিজ ভাই যিনি পাউডার আজিজ হিসেবে বেশী পরিচিত ছিলেন। এই লোকটার দৌড়ে আসা দেখে আমার কলিজার পানি শুকিয়ে গেল। না জানি কি অঘটন ঘটে যায়?

এই পরিস্থিতিতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি স্যারকে আড়াল করে সামনে দাঁড়ালাম। লোকটি দ্রুতগতিতে আমাদের দিকে এসে সোজা মকবুল আহমাদ সাহেবের পা ধরে সালাম করে বললেন, "স্যার! আমি পাউডার আজিজ। আমাকে আপনি চিনতে পেরেছেন?" অনেকক্ষণ চিন্তা করে স্যার তাকে চিনতে পারলেন। তারপর সেই আজিজ ভাই আমাদের নির্বাচনী ক্যাম্পিংয়ে যুক্ত হয়ে বাজারের প্রত্যেকটি দোকানে আমাদের সাথে গেলেন এবং স্যারকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, "উনি আমাদের মকবুল আহমাদ স্যার, পাল্লা মার্কায় ভোটে দাঁড়িয়েছেন। তিনি আমাদের শর্শদী স্কুলের স্যার ছিলেন। উনাকে আপনারা সবাই ভোট দিবেন।" এই কথা বলাই হয়নি মকবুল আহমাদ সাহেব স্বাধীনতার পূর্বে শর্শদী হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। দোকানদারদের সাথে সাক্ষাতের পর শর্শদী হাইস্কুল মাঠে যথারীতি নির্বাচনী জনসভা শুরু হলো। স্যার উনার স্বভাবসুলভ বক্তব্য রাখলেন মানুষ মনযোগ সহকারে শুনলেন। আমার নাম যখন বক্তব্য দেওয়ার জন্য ঘোষণা হলো তখন লোকজন শুধু বলাবলি করছে আওয়ামীলীগের মোস্তফা ডাক্তারের ভাই। আমার বক্তব্য ও জনসভার শেষে অনেক লোক এসে আমার সাথে দেখা করে বললো আপনিও কি জামায়াত? আমি বললাম আমি জামায়াতে ইসলামী করি। অনেকেই খুব খুশী হলো আবার কেউ কেউ আশ্চর্য হলো।

রাতে ফেনীতে গিয়ে স্যারকে বললাম, "স্যার আজকে খুব ভয় পেয়েছি। আজিজ ভাই এইরকম করলো।" স্যার বললেন, "যুদ্ধের সময় আজিজ আমার সাথে দেখা করে বলেছে কে বা কারা তাকে মেরে ফেলবে। স্যার আপনি আমাকে বাঁচান।" স্যার একটা চিঠি লিখে দিয়েছেন সেটা দিয়ে আজিজ ভাই ইন্ডিয়া চলে গিয়েছেন। এইজন্য আজিজ ভাই স্যারকে এতো বেশী শ্রদ্ধা করে।

১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আর একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। সারাদিন নির্বাচনী প্রচারণা শেষে মকবুল আহমাদ সাহেব ফেনীতে আসলেন তার বিশ্রামের রুমে, সাথে আমিও ছিলাম। কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে স্যারকে জিজ্ঞাসা করা হলো, স্যার রাতে কি খাবেন? তিনি বললেন, 'একটা রুটি আর একটু সবজি হলে চলবে।' তারা পীড়াপীড়ি করতে লাগলো ভাত, মাছ, গোস্ত খাওয়ানোর জন্য। তিনি একবাক্যে না করে দিলেন। তারপর বললেন, 'ভাত, মাছ, গোস্ত, কবিরের জন্য নিয়ে আসো।' আমি বললাম, 'স্যার! আমি বাসায় গিয়ে খাবো।'

তারা মকবুল আহমাদ সাহেবের জন্য খাবার নিয়ে এলেন। তিনি যথারীতি রুটি ও সবজি খাচ্ছেন। আমি উনার পাশে বসা। উনি যেই রুমে খাচ্ছেন সেই রুমের বারান্দা দিয়ে একটি লোক বার বার পায়চারি করছে। স্যার আমাকে বললেন, 'কবির লোকটি কি চায় দেখতো।' আমি বারান্দায় গিয়ে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি চান।' লোকটি আমাকে বললো,

'আমি মকবুল আহমাদ সাহেবের সাথে দেখা করতে চাই।' আমি মকবুল আহমাদ সাহেবকে বলার সাথে সাথে তিনি বললেন লোকটিকে ডাক। আমি লোকটিকে ডেকে স্যারের রুমে নিয়ে গেলাম। লোকটি বললো, 'আমি আপনার নির্বাচনের জন্য ৫,০০০/- টাকা দিতে চাই।' এই বলে লোকটি টাকাগুলি স্যারের হাতে দিতে চেষ্টা করলো। মকবুল আহমাদ সাহেব টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, 'আমারতো টাকার প্রয়োজন নেই। আপনি কেন আমাকে টাকা দিবেন। জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনী ফান্ড গঠন করেছে। আপনি নির্বাচনী ফান্ডে এই ৫,০০০/- টাকা জমা দিতে পারবেন।' আমাকে বললেন জামায়াতের নির্বাচনী একাউন্ট নং দেওয়ার জন্য। স্যার লোকটাকে আরো বললেন, 'দেখেন আমি নির্বাচনে প্রার্থী হইনি। জামায়াতে ইসলামী আমাকে নির্বাচনে প্রার্থী করেছে। আমার থাকা খাওয়ার সকল ব্যবস্থা জামায়াতে ইসলামী করছে। এই যে খাচ্ছি এবং এই রুমে থাকি কোন ভাড়া লাগেনা। আপনি আপনার টাকাটা জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী ফান্ডে জমা করুন।'

লোকটি চলে যাওয়ার পর আমি মকবুল আহমাদ সাহেবকে বললাম, স্যার আমরা নির্বাচনের টাকার জন্য কত লোকের কাছে যাচ্ছি। আপনি লোকটার থেকে ৫,০০০/- টাকা নিলেন না। তিনি আমাকে বললেন, 'দেখ কবির, লোকটি যদি আমার হাতে আজকে ৫,০০০/- টাকা দিতে পারতো, আমি যদি নির্বাচনে বিজয়ী হই, তখন এই লোকটি বলবে আপনার নির্বাচনের সময় আপনাকে ৫,০০০/- টাকা দিয়েছি। আপনি আমাকে এই অবৈধ সুবিধাটা দিতে হবে। তখন আমার কি জবাব হবে। আমি তো লোকটাকে অবৈধ সুবিধা দিতে পারবো না। তাই লোকটার কাছ থেকে টাকা নিজ হাতে না নিয়ে জামায়াতের ফান্ডে জমা দিতে বললাম।'

শিক্ষক হিসেবে মকবুল আহমাদ :

আমার বড় দুই ভাই মকবুল আহমাদ সাহেবের সরাসরি ছাত্র। দুইজনই আওয়ামীলীগ করেন। আমি যখন ঢাকায় বসবাস শুরু করি একবার আমার বাসায় ভাইয়েরা যখন বেড়াতে আসলেন তখন আমার বাসায় মকবুল আহমাদ সাহেবকে দাওয়াত করলাম। রাতের খাবার প্রস্তুত হলো। মকবুল সাহেব আমার বাসায় পৌছার সাথে সাথে আমার দুই ভাই মকবুল আমহমাদ সাহেবকে পায়ে ধরে সালাম করলেন। আমার এক ভাই ডাক্তার আর এক ভাই হাই স্কুলের হেড মাস্টার। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় হলো আমার দুই ভাই কেউ স্যারের সামনে সোফায় বসবেনা। উনারা দুইজনে ফ্লোরে বসে পড়ে বার বার। অনেক কষ্ট হয়েছে তাদেরকে সোফায় বসাতে। খাওয়া দাওয়া শেষে স্যার বিদায় নেওয়ার পর স্যারের ব্যাপারে নানা আলাপচারিতায় তারা দু'জন মগ্ন। ঠিক এই সময় আমি তাদের আলাপে যোগ দিয়ে বললাম

স্যার যদি এত ভাল হয়, তাহলে তার দলতো আরো অনেক ভালো। আমার বড় দুই ভাই একবাক্যে স্বীকার করলেন। জামায়াতের লোকেরা যদি স্যারের মত ভালো হয় তাহলে নির্দ্বিধায় জামায়াতে ইসলামী করা যায়।

কর্মস্থলে মকবুল আহমাদ সাহেব :

মকবুল আহমাদ সাহেব যখন শর্শদি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন তখন স্কুলের ছাত্রদেরকে নিয়ে নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। উনার ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল শর্শদি দারুল উলুম মাদ্রাসার মোহতামিম ও প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা নাজির আহমদ সাহেবের সাথে। শর্শদি স্কুলে শিক্ষকতা করাকালিন সময়ে স্কুলের একজন দপ্তরি ছিল। আবদুল খালেক নামে। মকবুল আহমাদ সাহেব সেই দপ্তরিকে আপনি বলে সম্বোধন করতেন এবং আবদুল খালেক ভাই বলে ডাকতেন। স্যারের অন্যান্য কলিগেরা এই জন্য স্যারকে বিভিন্ন কথা বলতেন। স্যার বলতেন আবদুল খালেক সেওতো আমাদের মতো মানুষ তাকে আপনি বলে সম্বোধন করলে, ভাই বলে ডাকলে অসুবিধা হবে কেন?

মকবুল আহমাদ সাহেব যখন সাংগঠনিক অফিসে অফিস করতেন উনার সাথে সে সকল অফিস স্টাফ কাজ করতেন তারা মকবুল আহমাদ সাহেবের ব্যবহারে ও আচরণে মুগ্ধ হতেন। উনি কাউকে ধমক দিয়ে কথা বলতেন না। কোন সময় যদি অধিক সময় অফিসে থাকতেন স্টাফদের ডিউটির সময় শেষ হলে উনি স্টাফদের বলতেন আপনাদের ডিউটির সময় শেষ আমার কিছু জরুরী কাজ আছে আমাকে আরো কিছু সময় অফিসে কাজ করতে হবে। আপনাদের ছুটি আপনারা চলে যান। আমি পরে আসছি।

সাংগঠনিক সম্পদের ব্যবহারে মকবুল আহমাদ সাহেব :

মকবুল আহমাদ সাহেব সাংগঠনিক সম্পদ ব্যবহারে অত্যন্ত আমানতদারীতার পরিচয় দিতেন। কোন চিঠি উনার কাছে আসলে সেই চিঠির খাম উনি পুনরায় ব্যবহার করতেন। উনার নিজের নাম কেটে দিয়ে যাকে চিঠি দিচ্ছেন তার নামটি লিখে সেই খামটি পুনরায় ব্যবহার করতেন। কোন কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখা থাকলে সেই পৃষ্ঠায় ক্রস দিয়ে অপর পৃষ্ঠায় চিঠি লিখে তিনি আমাদের কাছে পাঠাতেন। সংগঠনের গাড়ী ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আমানতদার। অফিসে যানবাহনের দায়িত্বে ছিলেন অনেকদিন নুর উল্লাহ খন্দকার। রাতে বাসায় যাওয়ার জন্য মকবুল আহমাদ সাহেবের জন্য গাড়ি রাখার কথা বললে স্যার বলতেন, 'আমার বাসাতো নিকটেই, হেটেও যাওয়া যাবে অন্য দায়িত্বশীলদেরকে গাড়ি দাও।' কখনো যদি গাড়ি ব্যবহার করতেন প্রায় সময় সি.এন.জি ব্যবহার করতেন। তিনি একদিন আমার সাংগঠনিক এলাকায় সফরে এসেছেন সিএনজি নিয়ে। তিনি বললেন, 'কবির

তোমার এখানে আসার জন্য একটি বাহন হলেইতো হয়। সিএনজি কেন রিক্সায় আসতে তো আমার কোন আপত্তি নাই। সিএনজিতে আসতে তো আমার কোন অসুবিধা হয়নি। আমাদের অন্য দায়িত্বশীলদের জন্য সেই গাড়িগুলি ব্যবহার করা যাবে।' মকবুল আহমাদ সাহেব কখনও উনার ছেলে মেয়েদেরকে সংগঠনের গাড়িতে তাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতেন না। তারা নিজ দায়িত্বে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতেন। পরবর্তী সময়ে উনার বড় ছেলে মাসুদ যখন গাড়ি কিনলেন তখন মকবুল আহমাদ সাহেব প্রায় সময় মাসুদের গাড়িটাই ব্যবহার করতেন। সংগঠনের গাড়ি অন্য দায়িত্বশীলদের জন্য ব্যবহারের সুযোগ করে দিতেন। স্যার যখন গ্রেপ্তার হলেন উনার স্ত্রী-সন্তানদেরকে দেখেছি সিএনজিতে করে কোর্টে যেতে। বড় কোন গাড়ি তারাও ব্যবহার করতেন না।

গ্রেফতার অবস্থায় মকবুল আহমাদ সাহেব :

উনি গ্রেফতার অবস্থায়ও সর্বাবস্থায় হাঁসি মুখে থাকতেন। উনাকে কখনও জিজ্ঞাসা করলে তিনি কোন অসুবিধার কথা বলতেন না। উনার কোন চাহিদাও থাকতো না। জেলে থেকেও তিনি অন্য দায়িত্বশীলদের খোঁজ-খবর নিয়ে তাদেরকে সহযোগীতার কথা বলতেন। পুলিশ প্রশাসনের লোকেরা উনাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে উনি সুস্পষ্টভাবে উত্তর দিতেন। পুলিশ প্রশাসনের লোকদের ও তাদের পরিবারের খোঁজ খবর নিতেন। পুলিশ প্রশাসনের লোকদেরকে ইসলামী জীবন যাপনের জন্য দাওয়াত দিতেন। তাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, পর্দা করা, তাদের পরিবারকে পর্দা করার জন্য তাগিদ দিতেন। পুলিশ প্রশাসনের লোকজন আশ্চর্য হয়ে বলতেন, 'উনি কেমন মানুষ, ভয় ভীতি বলতে কিছু নাই। উল্টো আমাদেরকে রিমান্ড নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন এবং নসিহত করতেন?' একদিন কোর্টে উনাকে হাজির করা হবে জানতে পারলাম। উনি আমাকে যাওয়ার জন্য উকিলের মাধ্যমে খবর পাঠালেন। যথাসময়ে কোর্টে হাজির হলাম। উনার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। উনার অবস্থা জানতে চাইলাম। উনি এত কষ্টের মধ্যেও বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ ভাল আছি।' আমাদের জন্য তিনি উদ্বিগ্ন। আমরা যাতে ভাল থাকি সেই জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। সেই দিন তিনি কোর্টে আসলেন, উনার জন্য লোক সমাগমের কোন ব্যবস্থা করলেন না আমাদের দায়িত্বশীলরা। আমাদের অন্য দায়িত্বশীলদের কোর্টে আসার সময় প্রটোকলের জন্যে জনশক্তি রাখতে হতো। মকবুল আহমাদ সাহেব সাংগঠনিক প্রটোকল ও জনশক্তিকে কষ্ট দেওয়া পছন্দ করতেন না। তিনি জেল ও জেলের জীবনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসেবে নিয়েছেন।

দায়িত্বশীল হিসেবে মকবুল আহমাদ :

মকবুল আহমাদ সাহেব এমন একজন দায়িত্বশীল ছিলেন যার কাছে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত কর্মী থেকে শুরু করে কেন্দ্রের একজন

নায়েবে আমীর পর্যন্ত সকলে বিনা প্রটোকলে সাক্ষাত করতে পারতেন এবং মন খুলে তাদের কথা বলতে পারতেন। সংগঠনের সর্বস্তরের জনশক্তি তার দু:খ দুর্দশা, মনের ব্যথার কথা নি:সংকোচে নির্দ্বিধায় সকল প্রকার ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে উনার কাছে বলতে পারতেন এবং তিনি হাঁসি মুখে দরদের সাথে তাদের কথা মনযোগ সহকারে শুনতেন, সান্ত্বনা দিতেন ও সমাধান দিতেন। সর্বস্তরের জনশক্তি যত দু:খ-কষ্ট-বেদনা, রাগ-বিরাগ, মান-অভিমান নিয়ে মকবুল আহমাদ সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতেন। তারা আলাপের পর সকল দু:খ বেদনা ভুলে হাসি মুখে এবং সন্তুষ্টচিত্তে উনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার মাঠে ময়দানে আন্দোলনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। আজ মকবুল আহমাদ সাহেব আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পরকালীন জীবনে চলে গিয়েছেন। আল্লাহ তুমি তোমার কুদরাতি ক্ষমতাবলে এই শূন্যতা পূরণ করে দাও।

ব্যক্তি মকবুল আহমাদ সাহেব :

ব্যক্তিগত জীবনে মকবুল আহমাদ সাহেব ছিলেন সাদা-সিদে একজন মানুষ। নিরহংকার এই মানুষটি জামায়াতে ইসলামীর সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব পালন করেছেন। তার কোনো কাজে, কথায়, আচরণে বা অঙ্গ ভঙ্গিতে নেতা নেতা ভাবের পরিচয় ফুটে উঠতো না। তিনি সর্বদা সাধারণ একজন ঈমানদার মানুষের মতই আচরণ করতেন। আমরা ছোট খাট নেতা বা দায়িত্বশীলেরা কথায় কাজে আলাপচারিতায় আমি এই করেছি, সেই করেছি, আমাকে ছাড়া এইটা সম্ভব ছিলোনা বা হতোনা ইত্যাদি ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক বলে ফেলি। মকবুল আহমাদ সাহেবের সাথে আমার পরিচয় প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। এই পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে সাংগঠনিক, পারিবারিক আলাপ আলোচনায় ব্যক্তিগত সম্পর্কে মকবুল আহমাদ সাহেব এই কথা কখনও উচ্চারণ করেননি "আমি করেছি, আমার নেতৃত্বে হয়েছে, আমাকে ছাড়া সম্ভব নয়।" আল্লাহ আমাদেরকে মকবুল আহমাদ সাহেবের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে ময়দানে দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল।

একবার এক সাংবাদিক মকবুল আহমাদ সাহেবের সাক্ষাতকার নিলেন এবং পত্রিকায় ছাপালেন। ঐ সাংবাদিক উনাকে প্রশ্ন করলেন জীবনে আপনার কি প্রত্যাশা ছিল? কি পেয়েছেন আর কি পান নি? মকবুল আহমাদ সাহেব তার স্বভাবসুলভ হাঁসি দিয়ে উত্তর দিলেন, 'জীবনে যা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ অনেক পেয়েছি। না পাওয়ার কোন বেদনা নাই। জীবনে উচ্চ কোন আকাংখা ছিল না। তাই জীবনে কি পেয়েছি কি পাইনি এমন কোন হিসাব কখনও করিনি ভবিষ্যতেও করবো না। সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকর আলহমাদুলিল্লাহ।'

সাংগঠনিক সফরে মকবুল আহমাদ সাহেব :

মকবুল আহমাদ সাহেব ভারপ্রাপ্ত আমীর থাকাকালীন চট্টগ্রাম মহানগরীর একটি জনসভায় বক্তব্য দেওয়ার জন্য যাচ্ছেন। সৌভাগ্যক্রমে আমি কেন্দ্র থেকে উনার সফরসঙ্গী হলাম। কঠিন মূহুর্ত, তাই সতর্কতার সাথে যেতে হচ্ছে। যাওয়ার পথে কোথায় নাস্তা হবে, কখন কিভাবে যেতে হবে, কয়বার গাড়ি পরিবর্তন করতে হবে, উনি কোন ড্রেসে থাকবেন, ইত্যাদি বিষয়ে কেন্দ্র থেকে একটি নির্দেশনা আমার হাতে বুঝিয়ে দেয়া হল। নির্দেশনার আলোকে আমি যখন যেইটা বলেছি করেছি এতবড় নেতা হিসেবে তিনি একটি প্রশ্নতো করেননি, বরং নিজ থেকে কোন পরামর্শও যোগ করেননি। নি:সংকোচে বিনা বাক্য ব্যয়ে সবকিছু মেনে নিলেন। অন্য কোন নেতা হলে উনার অনেক সংযোজন, বিয়োজন অনেক পছন্দের তালিকা আমাকে মান্য করতে হতো। আমরা যখন চট্টগ্রাম পৌছলাম আমাদের গাড়ি পরিবর্তন করে আমাদের থাকার জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন তারা দেখিয়ে দিলেন এইরুমে ভারপ্রাপ্ত আমীর থাকবেন, এই রুমে আমি থাকবো। মকবুল আহমাদ সাহেব বললেন, 'আমার জন্য যেই রুম আপনারা দেখালেন এখানে সুবিধা অনেক বেশী তাই এই রুমে কবির আহমদের থাকার ব্যবস্থা করুন। আমাকে কবির আহমদের রুমটি দিন।' আমাদের সবার অনুরোধে উনি ঐ রুমে থাকলেন। আমরা সেই জায়গায় তিনদিন থাকলাম। কতবার যে তিনি আমার খোঁজ খবর নিয়েছেন কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা? তার কোন হিসাব নাই। আমাদের খাদেমকে বার বার আমার খেয়াল রাখার অনুরোধ করলেন মকবুল আহমাদ সাহেব। আমি খুবই লজ্জিত হলাম, আমি যেখানে উনার খোঁজ খবর রাখবো উল্টো তিনি আমার খোঁজ খবর নিচ্ছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আসলেন সেখানে আমাদের তিন দিনের থাকা খাওয়ার একটা ছক তৈরী করতে মকবুল আহমাদ সাহেব এত সাদা মাটা খাওয়ারসহ একটা ছক বললেন, 'দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বললেন স্যার আমাদেরকে তো কিছু করতে হবে না মনে হচ্ছে।'

তারা বললেন, 'স্যার খাবারের মেনু কিছু বাড়িয়ে দিন।' স্যার বললেন, 'খাবতো আমি। ন্যূনতম যতটুকু প্রয়োজন সেইটা বলেছি। এর চেয়ে বেশী কিছু প্রয়োজন হবে না।' স্যার সেই একটি সবজি ও এক রুটি আর এক চামচ ভাত এক কাপ ডালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বার বার এসে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। তিনি তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে হাঁসি মুখে বলছেন, 'আলহামদুলিল্লাহ খুব ভাল আছি কোন অসুবিধা হচ্ছেনা আপনারা দু:চিন্তা করবেন না।' আমরা ঐ জায়গায় পৌছলাম সকাল ১১টায়। তৎকালীন মহানগরী আমীর মাওলানা শামছুল ইসলাম ভাই রাত ১০টায় দেখা করতে আসলেন ভারপ্রাপ্ত আমীর মকবুল আহমাদ সাহেবের সাথে। আগামীকাল বিশাল জনসভা। সামছুল ইসলাম ভাই লজ্জিত এবং বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করছেন ভারপ্রাপ্ত আমীরের কাছে দেখা করতে দেরিতে আসার জন্য। মকবুল

আহমাদ সাহেব তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে হাসিমুখে বললেন, 'শামছুল ইসলাম সাহেব! আপনার কাঁধে এত বড় দায়িত্বের বোঝা। আগামীকাল এত বড় জনসভা আপনি কষ্ট করে দেখা করতে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। আপনিতো বার বার ফোনে খবর নিয়েছেন। এবং যত দ্রুত সম্ভব বাসায় গিয়ে বিশ্রাম নিন। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন, যাতে সুন্দরভাবে সফলভাবে আগামীকালের জনসভা আল্লাহ কবুল করেন।' এই কথা শুনার পর শামছুল ইসলাম ভাইয়ের সকল ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। তিনি অনেক হালকা হলেন নিজের অনুশোচনা থেকে। বিদায়ের প্রাক্কালে শামছুল ইসলাম ভাই বলে গেলেন, 'কবির ভাই! নেতা হলে এমনই হওয়া উচিত।'

পারিবারিক জীবনে মকবুল আহমাদ সাহেব :

আমীরে জামায়াত থাকাকালীন মকবুল আহমাদ সাহেবের ছোট ছেলে নোমানের বিয়ের ব্যাপারে আমাদের শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অর্থসম্পাদক আজহারুল ইসলাম ভাইয়ের একমাত্র মেয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব দিলেন আমার মাধ্যমে। বিশেষ কারণে মকবুল আহমাদ সাহেব সরাসরি সচরাচর চলাফিরা করেন না। উনার সব কিছু নিয়ন্ত্রিত। উনি উনার পরিবার থেকে ছেলে, ভাই, ভায়রা সকলকে ডাকলেন এবং আমাকেও ডাকলেন। পরিবারের সবাইকে বললেন, 'আমার পক্ষ থেকে কবির আহমদ এই বিয়ের সকল দায়-দায়িত্ব পালন করবে। তোমরা সকল বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত মনে করে তার সিদ্ধান্ত মেনে নিবে। উভয় পক্ষের আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে বিয়ের দিন তারিখ ঠিক হলো। অনুষ্ঠান করার ব্যাপারে উভয় পক্ষের বড় অনুষ্ঠানের চাহিদা। মকবুল আহমাদ সাহেব বললেন, 'সারাদেশে ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীরা জেল-যুলুম নির্যাতনের শিকার, তাই বড় আকারের অনুষ্ঠান নয়। উভয় পক্ষের একটাই অনুষ্ঠান হবে সর্বোচ্চ পাঁচশত লোকের উপস্থিতিতে। তাই করা হলো। মকবুল আহমাদ সাহেব আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, 'কবির! তুমি যেহেতু উভয় পক্ষের সাথে যোগাযোগ রাখছো, উভয় পক্ষ তো বড় বড় অনুষ্ঠান করে টাকা খরচ করতে চেয়েছিল। তাই উভয় পক্ষ থেকে ৫০,০০০/- টাকা করে আদায় করে সংগঠনের ফান্ডে জমা দাও।' আমি স্যারের নির্দেশ মত মেয়ের বাবা আজহারুল ইসলাম ভাই থেকে ৫০,০০০/- টাকা এবং স্যারের বড় ছেলে মাসুদ থেকে ৫০,০০০/- টাকা সংগ্রহ করে সংগঠনের ফান্ডে স্যারের হাতে পৌঁছে দিয়ে আসলাম। টাকা দিতে যাওয়ার পর স্যার বললেন, 'অনুষ্ঠানে খরচ করলে কয়েক লক্ষ টাকাও করা যায়। ষ্ট্যান্ডার্ড এমন একটি জিনিস যা যত টানে তত লম্বা হয়, অনেকটা রাবারের মত। তাই এটাকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হয়। আমাদের আন্দোলনের ভাইয়েরা সারাদেশে অনেক কষ্টে আছে। এই এক লক্ষ টাকা তাদের জন্য উভয় পক্ষ দান করলো তারা অনেক ছাওয়াবের ভাগিদার হবে। আল্লাহ তাদের এই দানকে কবুল করুন।' এই বলে স্যার দোয়া করলেন।

দায়ী ইলাল্লাহ্ হিসেবে মকবুল আহ্মাদ :

তিনি নিয়মিত অব্যাহত গতিতে দাওয়াতী কাজ করতেন। উনার ব্যক্তিগত ডাইরিতে অসংখ্য লোকের নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার থাকতো। তিনি সেই সমস্ত লোকের কাছে ব্যক্তিগতভাবে ছুটে যেতেন তাদের আন্দোলনের দাওয়াত দিতেন, বই উপহার দিতেন ও বিক্রয় করতেন। সারা দেশের লোকদের নাম ঠিকানা মকবুল আহমাদ সাহেবের কাছে থাকতো। তিনি দেশের বিভিন্ন জেলার দায়িত্বশীলদেরকে উনার পরিচিত লোকদের নাম ঠিকানা ও ফোন নাম্বার দিয়ে দাওয়াত দিতে বলতেন এবং পরবর্তী সময়ে খোঁজ খবর নিতেন, দাওয়াত দিয়েছেন কিনা? উনার দাওয়াতী টার্গেটের লোকদের সাথে সাক্ষাত করতেন। যাদের সাথে সাক্ষাত করতেন তারা অনেকে অত্যন্ত উৎসাহিত হতো এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে সংগঠনে অগ্রসর হতেন। সারা দেশের মত ঢাকা মহানগরীতে তিনি বিভিন্ন থানা আমীরদেরকে ফোন করে লোকদের নাম ঠিকানা দিয়ে দাওয়াত দিতে বলতেন এবং খোঁজ খবর নিতেন। একই ধারাবাহিকতায় আমি যখন ঢাকা মহানগরীর খিলগাঁও থানার আমীর ছিলাম তিনি ৪ বার আমার থানায় উনার পরিচিত লোকদের কাছে আমাকে নিয়ে গিয়েছেন, আমাকে পরিচয় করে দিয়েছেন এবং সেই সমস্ত লোকদের খোঁজ খবর নিতেন। স্যার যখনই ফোন করতেন প্রায় সময়ই দুয়েকজন লোকের নাম ঠিকানা দিতেন। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে বলতেন, উনার সালাম দিতে বলতেন। একবার তিনি জাপান সফর থেকে এসে জাপানে যাদের সাথে উনার সাক্ষাৎ বা পরিচয় হয়েছে প্রত্যেকের ঢাকার বাসায় আমাকে নিয়ে গিয়েছেন, তাদের পরিবারের খোঁজ খবর নিয়েছেন। অনেকের পারিবারিক সমস্যা ছিল সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করেছেন। এক বাসায় গিয়ে দেখা হলো আজাদ ভাইয়ের ছেলের সাথে। আজাদ ভাইর ছেলে তখন ইন্টারমেডিয়েটে পড়ে। সে তখনও তার বাবাকে দেখে নাই। তিনি ছেলেটিকে খুব আদর স্নেহ করলেন এবং বললেন তোমার বাবাকে জাপানে বলে এসেছি একবারেই দেশে চলে আসতে এবং তোমাদের সাথে একসাথে বসবাস করতে। এক বৎসরের মধ্যে আজাদ ভাই জাপান থেকে দেশে আসলেন। ঢাকায় বাড়ি করলেন এবং সংগঠনের রুকনপ্রার্থী পর্যন্ত আমার হতে হয়েছেন। এইভাবে মকবুল আহমাদ সাহেব সারা জীবন দায়ী ইলাল্লাহর ভূমিকা পালন করেছেন। উনার পরিচিত লোকদের মধ্যে যেমনি ছিল সমাজের সর্বোচ্চ স্তরের লোক তেমনি ছিল অতি সাধারণ একজন লোকজন। আমাদেরকে যখন নাম ঠিকানা দিতেন এমন সাধারণ লোকের সাথে পরিচিত হয়ে আমরা আশ্চর্য হতাম, এই রকম একজন সাধারণ লোকের সাথেও মকবুল আহমাদ সাহেবের মত এত বড় নেতা হয়ে সম্পর্ক রাখতেন ও যোগাযোগ করতেন। একবার তিনি আমাকে বাসাবো এক বাসায় নিয়ে গেলেন, সেখানে একজন বৃদ্ধ লোকের সাথে দেখা করলেন এবং আমাকে পরিচয় করে দিলেন। উনার বাসায় চট বিছানো ছিল, মকবুল আহমাদ সাহেব উনার সাথে চটের উপরে বসে উনাকে অনেক সম্মান

করে দরদের সাথে কথা বললেন। যাওয়ার সময় উনার জন্য উপহার নিয়ে গেলেন এবং আসার সময় কিছু টাকা উনাকে দিয়ে আসলেন। পরে স্যার আমাকে বললেন, ঐ বয়স্ক লোকটি হলেন মাওলানা আবদুল জাব্বার সাহেব। তিনি একসময় জামায়াতে ইসলামীর আমীরে জামায়াতের দায়িত্বে ছিলেন। মাওলানা আবদুল জাব্বার সাহেব যতদিন বেঁচে ছিলেন মকবুল আহমাদ সাহেব আমার মাধ্যমে উনার সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং খোঁজ খবর নিতেন। মাওলানা আবদুল জাব্বার সাহেবের ইন্তেকালের খবর পেয়ে মকবুল আহমাদ সাহেব উনার জানাযায় হাজির হলেন। এইভাবে এই দা'য়ী ইলাল্লাহ সমাজের সর্বস্তরের লোকের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, যোগাযোগ করতেন, দাওয়াত দিতেন।

হে আল্লাহ এই মহান ব্যক্তিটিকে তুমি আমাদের মাঝে থেকে উঠিয়ে নিয়েছো তোমার কাছে। আল্লাহ তুমি তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে দাখিল করো। আমাদেরকে তার জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে এই বাংলার জমিনে দ্বীন কায়েমের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য তৌফিক দান কর। আমীন॥

লেখক: সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের এক পথিকৃতের বিদায়

একজন মকবুল আহমদ কতটা আমানতদার ও শিশুসুলভ সারল্যের অধিকারী ছিলেন তা বলে শেষ করা যাবেনা। সর্বশেষ তিনি যখন ইন্তেকালের আগে হাসপাতালের আইসিইউতে ছিলেন তখন উনার মায়াবী চেহারাখানি দেখতে ঢাকায় গিয়েছিলাম। কিন্তু সে মায়াবি চাহনি যে আমার সর্বশেষ চাহনি হবে সেটি কখনো ভাবতে পারিনি।

এ.কে.এম শামছুদ্দিন

বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের এক পথিকৃৎ ফেনীর গর্বিত সন্তান মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.)। কোন কোন মানুষের জন্ম হয় ইতিহাস তৈরীর জন্য। আর অধিকাংশ মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে ইতিহাসের সাক্ষী হওয়ার জন্য। তেমনি একজন মকবুল আহমাদ (রহ.) ছিলেন ইতিহাস তৈরীর কারিগর। আর আমরা সেই ইতিহাসের প্রত্যক্ষদর্শী স্বাক্ষী। একজন সদালাপি, মহানুভব হৃদয়ের অধিকারী, ন্যায়-ইনসাফের বাতিঘর, সর্বোপরী ইনসানে কামেল বলতে যা বুঝায় তারই বাস্তব প্রতিচ্ছবি ছিলেন তিনি।

১৯৮০ সালের কোন স্নিগ্ধ সকালে যখন আমি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করি তখন তিনি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক। সেই সময়ে তিনি একবার ফেনী সফরে আসলে তাঁর সাথে আমার সরাসরি প্রথম পরিচয় ঘটে। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর পর্যন্ত ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বোধের সম্পর্ক অটুট ছিল।

১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতের প্রার্থী হিসেবে তিনি যখন ফেনী- ২ সংসদীয় আসন থেকে নির্বাচন করছিলেন, তখন আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর নির্বাচন পরিচালক হওয়ার। নির্বাচনের সময়টা যেহেতু স্বৈরাচার এরশাদের সামরিক শাসনকাল সেহেতু সেই সময়টি

এমনিতেই একটু কঠিন ছিল। তখন ভোট ডাকাতির মহোৎসব হতো। কিন্তু একটি বিপরীত মুহূর্তেও তিনি নিজেকে সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের দ্বারে দ্বারে উপস্থাপন করেছেন। একজন একনিষ্ঠ দায়ী হিসেবে তিনি নির্বাচনী গণসংযোগকে দাওয়াতে দ্বীনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

আমি নির্বাচন পরিচালক হিসেবে তাঁর বিভিন্ন গণসংযোগ ও পথসভার সিডিউল তৈরী করতাম। তিনি আমাদের প্রদত্ত সিডিউলের আলোকে নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল হিসেবে আমাদের পরিকল্পনা প্রস্তাবনায় হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ অধিকার থাকলেও তিনি কখনো হস্তক্ষেপ করতেন না। এটা দ্বারা বুঝা যায় তিনি সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষায় কতটুকু অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি সার্বক্ষণিক সংগঠন ও শৃঙ্খলা বিষয়ে আপোষহীন ছিলেন। শুধু নির্বাচনকালীন সময় নয় পরবর্তীতে তিনি যখনই ফেনীতে বিভিন্ন সময় সফরে আসতেন ৩ দিন কিংবা ৭ দিনে কর্মসূচী হাতে নিয়ে আসতেন। আমরা জেলা জামায়াত উনার সফরের যে সিডিউল তৈরী করে দিতাম তিনি সেই সিডিউলের বাইরে কখনো যেতেন না। তিনি শুধু সফরে আসার আগে জানিয়ে দিতেন কোথায় কোন কোন কাজ তিনি করবেন। আর ব্যক্তিগতভাবে তিনি কার কার সাথে দেখা করবেন।

১৯৯১ সালে জাতীয় নির্বাচনেও তিনি জামায়াতের দলীয় প্রার্থী হিসেবে ফেনীতে নির্বাচন করেছেন। আমি তখন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী হিসেবে উনার নির্বাচনী কার্যক্রমের পরিচালক হওয়ায় খুব কাছ থেকে উনার সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আমি দেখেছি তিনি কতটা সময়ানুবর্তী ছিলেন। তিনি সময়, ইনসাফ এবং খুলুসিয়াত এসব বিষয়ে বেশি কঠোর ছিলেন। বিপদে মুসিবতে সর্বদা আমাদেরকে ধৈর্য ধারণের নসিহত করতেন। কখনো কোনো দুঃসময়ে তিনি ভেঙ্গে পড়তেন না। জামায়াতের সবচেয়ে কঠিন সংকটকালীন মুহূর্তে যখন তিনি আমীরে জামায়াত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন তখন এ কঠিন সময়েও আমাকে মাঝে মাঝে ফোন করতেন। সব খোঁজ-খবর নিয়মিত রাখতেন। বেছে বেছে কিছু মানুষের নাম ধরে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। তিনি ফোনে বলতেন মাওলানা আবদুস সাত্তার সাহেব কেমন আছেন? উনার কি খবর, শফিউল্লাহ ভূঁইয়ার কি খবর? হাজী মাকছুদ সাহেব, মফিজ খাঁনসহ অনেক ব্যক্তির নাম ধরে ধরে তিনি খোঁজ-খবর নিতেন। ফেনীর সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির খোঁজ-খবর তিনি সর্বদা রাখতেন। সর্বদা যে কোন বিষয়ে তিনি ধৈর্যের সাথে সহনশীলভাবে আল্লাহর উপর ইস্তেকামাতসহ ময়দানে কাজ পরিচালনার নসিহত করতেন। তিনি ছিলেন খুব পরিপাটি জীবন পরিচালনার মানুষ।

তাঁর ইমারতের শেষ পর্যায়ে আমি আরেকটি ইতিহাসের সাক্ষী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করি। সেটি হল, যে মানুষটির সংগঠনে হাতে খড়ি শুরু হয়েছিল এ ফেনীর মাটি থেকে সে মানুষটির বিদায় বেলার সাক্ষী হওয়ার

সুযোগ পেয়েছিলাম আমরা। ২০১৮ সালের কঠিন সময়ে বিদায়ী কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সভা আয়োজনের একটি সুবর্ণ সুযোগ আমার নিকট আসে। আমি এই সুযোগটি হাতছাড়া করিনি। আমীরে জামায়াত মকবুল আহমাদ (রহ) সে বিদায়ী কর্ম পরিষদের অধিবেশন থেকেই বিদায় নিলেন। মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় সে মহান সুযোগটি সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে পেরে আমি মহান রবের দরবারে শুকরিয়ার মস্তক অবনত করি সর্বদা।

একজন মকবুল আহমাদ কতটা আমানতদার ও শিশুসুলভ সারল্যের অধিকারী ছিলেন তা বলে শেষ করা যাবেনা। সর্বশেষ তিনি যখন ইন্তেকালের আগে হাসপাতালের আইসিইউতে ছিলেন তখন উনার মায়াবী চেহারাখানি দেখতে ঢাকায় গিয়েছিলাম। কিন্তু সে মায়াবি চাহনি যে আমার সর্বশেষ চাহনি হবে সেটি কখনো ভাবতে পারিনি।

সে অন্তিম যাত্রায় ফেনীর দাগনভূঞার ওমরাবাদ গ্রামে কঠোর লকডাউন এর প্রথম দিন আরো পহেলা রমজান নামাজে জানাজার আয়োজন নিয়ে খুবই সন্ধিহান ছিলাম, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। কিন্তু জীবদ্দশায় উনার দেওয়া ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি ইস্তেকামাতের মহান উপদেশ বাণীর কথা স্মরণ রেখে গভীর রজনীতে জানাযা ও দাফন কাফনের আয়োজন করতে সমর্থ হয়েছিলাম। দ্বীনের এই মহানায়ককে রাজকীয় বিদায় দিতে সেদিন ফেনীর মাটিতে হাজারো শোকার্ত জনতার সাথে সমবেত হয়েছিলেন বর্তমান আমীরে জামায়াত মুহতারাম ডাক্তার শফিকুর রহমান, সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ প্রায় অধিকাংশ জাতীয় নেতৃবৃন্দ, পার্শ্ববর্তী জেলার আমিরগণসহ অসংখ্য ভ্রাতৃপ্রতিম রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। মহান মাওলা মনিব দিনের এই পতাকাবাহী পথিকৃত আমাদের রাহবার মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ) কে তার সন্তুষ্টির আলোকে জান্নাতে মাকামে আ'লা দান করুন। আমীন॥

লেখক : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য ও ফেনী জেলা আমীর।

মুহাম্মদ আলাউদ্দিন

সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য

আল্ হামদুলিল্লাহ
সুবহানাল্লাহ।

যেই নেতা ক্বাবেল (উপযুক্ত)
সেই নেতা সাবেক আমীর মাক্ববুল (গ্রহণযোগ্য)।
ক্বাবেলের দাবীদার অনেক
মাক্ববুল আছে কয়জনেক।

আমিরাবাদ গ্রামের ক্বাবেল
দেশব্যাপী হলেন মাক্ববুল।
অন্তর আছে সব মানুষের
স্বচ্ছমন আছে কয়জনের।

দেখতে যিনি সুন্দর
মনটাও তাঁর সুন্দর।
তাইতো কবি বলেছেনঃ--
"" মাক্ববুল তো সাজ হায়
ক্বাবেল তো বহুত হায়
মগর আয়নাকে মা'নন্দে নেহি
দেলতো বহুত হায় ""

প্রতিপক্ষ পায়নি যাঁ দোষ
সকলেই তাঁর প্রতি ছিল খোশ।
জীবনে যতবার তাঁকে দেখেছি
সুন্দর আচরণ তাঁর পেয়েছি।

মুনাজাত মাওলা তোমার দরবারে
স্থান দিও তোমার জান্নাতে।
আমীন আমীন আমীন
ইয়া রাব্বাল আলামিন।

লেখকঃ জেলা আমীর, নোয়াখালী। ১৩/০৬/২১ইং
বর্তমানে কুমিল্লা অঞ্চল টীম সদস্য।

মকবুল স্যার একজন আদর্শ পথ প্রদর্শক

জনাব মকবুল আহমাদ সাহেব অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিলেন। তিনি যখন ফেনীতে আসতেন, তখন তার ব্যাগের মধ্যে কয়েকটি জিনিষ দেখা যেত। যেমন একটা ডায়েরী, একটা ঔষুধের বক্স, সুই-সুতাসহ একটা সেলাইয়ের বক্স। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম "স্যার! সুই-সুতার বক্সটা কি সফরের সময় দরকার হয়।" তিনি বললেন, "অনেক সময় জামা-কাপড় গেঞ্জি ইত্যাদি ছেঁড়া থাকে, বাসায় সময় পাই না, তাই সফরে সময় পেলে প্রয়োজনীয় কাপড়গুলো সেলাই করে নিতে হয়।" তার এ ধরনের অবস্থা দেখলে মনে হয় দিল্লীর বাদশাহ আলমগীর জিন্দাপীর আবার নতুন করে দুনিয়ায় আগমন করেছেন।

অধ্যাপক আবু ইউসুফ

বাংলাদেশের পূর্ব দক্ষিণাঞ্চলের প্রবেশদ্বার নামে খ্যাত অত্যন্ত সুপরিচিত ও সুপ্রাচীন অথচ ছোট্ট একটি জনপদের নাম ফেনী। এ এলাকাটি একসময় চট্টগ্রামের অংশ থাকলেও ১৮৭৬ সালে একে মহকুমায় রূপান্তর করে পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে জেলায় পরিণত করা হয়। ফেনী জেলায় বহু আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষাবিদ, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক ও সরকারী আমলা জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক বীর শমসের গাজী, সাধক পাগলামিয়া, শিক্ষাবিদ স্যার এ.এফ রহমান, খান বাহাদুর আবদুল আজিজ, সাংবাদিক আবদুস সালাম ধর্মীয় নেতা ও বীর মুজাহিদ মাওলানা নুর মোহাম্মদ আজমী প্রমুখ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতেও এখানে অনেক গুণীজন জন্মগ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ সমাজসেবক, মানবদরদী মজলুম জননেতা বিশ্ব ইসলামী

আন্দোলনের অন্যতম সিপাহশালার বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের দু:সময়ের কান্ডারী জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর, বাংলাদেশের কৃতি সন্তান ও ফেনীর গৌরব জনাব মকবুল আহমাদ।

১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহণকারী এই ক্ষণজন্মা ১৯৬২ সালে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার পর আধুনিক জাহেলিয়াতের শৃংখল থেকে গোটা দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার অভিপ্রায় নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁদে তুলে নেন।

এ পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক কর্ম জীবনের গন্ডি পেরিয়ে নিজেকে সঁপে দেন মহান রবের ডাকে তাঁর জমিনে তাঁর দেয়া জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। পরবর্তীতে ইসলামী আন্দোলনের পথে সকল ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিকুল পরিবেশ সহ্য করে অব্যাহত রাখেন ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের কঠিন পথের যাত্রা। এ যাত্রা হতে তাঁকে মৃত্যু পর্যন্ত কেউ থামাতে পারেনি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সরাসরি ছাত্র না হলেও ফেনীতে আমাদের বড় ভাইদের অনেকেই তাঁর ছাত্র ছিলেন। এ সুবাদে আমরা তাঁকে পরিচয়ের শুরু থেকেই স্যার বলে সম্বোধন করতাম। আমাদের সাংগঠনিক ধারায় পরস্পরকে ভাই বলে ডাকার নিয়ম প্রচলন থাকলেও ফেনীতে কাউকে কোনদিন তাঁকে মকবুল ভাই ডাকতে শুনিনি। তিনি ছিলেন জাতি, ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের কাছে একজন গ্রহণযোগ্য ও সম্মানিত ব্যক্তি। বাস্তবেই তিনি ছিলেন ফেনীর একজন আদর্শ সন্তান।

তার জীবনের অসংখ্য স্মৃতি থেকে কয়েকটি স্মৃতি পাঠকের উদ্দেশ্যে তুলে ধরলাম :

ইউনিট নাযেম থেকে আমীরে জামায়াত

বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়ে যে কয়জন মর্দে মুজাহিদ সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে জনাব মকবুল আহমাদ অন্যতম। তার মতো তৃণমূল পর্যায়ের ইউনিট দায়িত্বশীল থেকে আমীরে জামায়াতের ভূমিকা পালন করা দায়িত্বশীল এ সংগঠনের ইতিহাসে বিরল। বিশেষ করে যখন জামায়াতে ইসলামী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী চক্রের রোষানলের শিকার হয় এবং এর অধিকাংশ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সরকারের মিথ্যা মামলার শিকার হয়ে কারাগারে বন্দী হয়ে একের পর এক বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন, যখন সারাদেশে লক্ষ লক্ষ নেতা-কর্মীকে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলখানায় পুরা হচ্ছে, যখন জামায়াতকে সকল পর্যায়ের নেতৃত্বশূণ্য করে তাকে সার্বিকভাবে কোনঠাসা করার অপচেষ্টা চলছিল ঠিক তখনই বাহ্যিকভাবে সহজ সরল অথচ দায়িত্ব পালনে দৃঢ়চেতা ও শক্ত মনোবলের অধিকারী এই ব্যক্তিটির উপর জামায়াতে ইসলামী পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে।

তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সংগঠন পরিচালনা করে সংগঠনকে কাংখিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট হন। এ যেন বিশ্ব নবী (স) এর প্রিয়তম সাহাবী হযরত আবু বকরের (রা) এক মূর্ত প্রতীক।

মূলত: তখন ফেনীতে সংগঠনের রুকন মানের দায়িত্বশীল ছিলেন মাত্র হাতেগোনা কয়েক জন। জনাব মকবুল সাহেব রুকন হওয়ার খবর শুনে অনেকেই জামায়াতের রুকন কি রকম? এ ভেবে মকবুল সাহেবকে দেখতে আসতেন। অত:পর ১৯৬৭ সাল থেকে তাঁর আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন শুরু হয়। প্রথমে ফেনী শহর ইউনিট নাযেম তারপর ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তৎকালীন ফেনী মহকুমা ও পরবর্তীতে '৭০-'৭১ সালের জুন পর্যন্ত নোয়াখালী জেলার আমীরের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি সংগঠনের চট্টগ্রাম বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত তিনি সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি সহকারী সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৪ সালে তিনি কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ২০১০ সালের জুন মাস থেকে জামায়াতের তৎকালীন আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে গ্রেফতার করা হলে তাঁকে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব দেয়া হয়। অবশেষে ২০১৬ সালের ১৭ অক্টোবর তিনি আমীর নির্বাচিত হন এবং ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীরে জামায়াত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

রাজনৈতিক জীবন

আজকের দুনিয়ায় প্রচলিত রাজনৈতিক অর্থে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের পৃথক কোন রাজনৈতিক জীবন আছে বলে আমি মনে করিনা বরং সমাজে ও রাষ্ট্রে আল্লাহর রাসূল (স) এর রেখে যাওয়া জীবনাদর্শকে বাস্তবায়নের আন্দোলন করতে গিয়ে যাকে যতটুকু রাজনীতি করার প্রয়োজন হয় তাই হলো ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের রাজনীতি। মূলত: রাজনীতি ও ইসলামী আন্দোলন একে অপরের পরিপূরক বা একে অপরের অংশ বিশেষ। এ অর্থে জনাব মকবুল আহমাদ এর রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি ১৯৭০ সালে ঐতিহাসিক প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ফেনী সোনাগাজী আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এরপর ১৯৮৬ ও ১৯৯১ সালে তিনি ফেনী (আংশিক) ও দাগনভূঁঞা থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিশ দলীয় জোট গঠন হলে তিনি জাতীয় নেতা হিসাবে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিশেষ করে ২০১০ সালের পরে

দেশে রাজনৈতিক অংগনে চরম অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তিনি জোট নেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছাকাছি থেকে জোটের সাহসী নেতৃত্ব প্রদান করেন।

সামাজিক জীবন

ক্ষণজন্মা এ মহান ব্যক্তি আজীবন মানুষের খেদমতে কাজ করে গেছেন। তাঁর রয়েছে এক বর্ণাঢ্য সামাজিক জীবন, গ্রাম্য জীবন থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর এই খেদমত অব্যাহত ছিল। তিনি ছাত্র জীবন থেকে "ওমরাবাদ পল্লী মঙ্গল সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত গজারিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার সভাপতি ছিলেন। সিলোনীয়া আঞ্জুমানে ফালাহিল মুসলিমীন ট্রাস্ট এর সভাপতি, দাগনভূঁঞা সিরাজাম মনিরা সোসাইটির সভাপতি, ফেনী ইসলামিক সোসাইটির সভাপতি, ফালাহিল মুসলেমিন ট্রাস্ট ফেনী এর সভাপতি ছিলেন। ঢাকায় অবস্থিত জনকল্যাণমূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠান ফালাহ-ই-আম ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউটের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। দেশের অন্যতম বৃহৎ ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আধুনিক প্রকাশনী বি.আই ট্রাস্টের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ঢাকা রহমতপুরস্থ আশ শেফা আর রাহমাহ নামক সামাজিক সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানেরও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

ইনসাফের এক মূর্ত প্রতীক

জনাব মকবুল আহমাদ ছিলেন ইনসাফের এক মূর্ত প্রতীক। জানা যায় যে, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যেও মানুষ হিসেবে কোন সমস্যা হলে তার সমাধানের দায়িত্ব দেয়া হতো তাঁকে। একবার মরহুম আব্বাস আলী খাঁন সাহেব এবং তার জিলা জয়পুরহাটের দায়িত্বশীলদের মধ্যে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা নিয়ে সামান্য ভুল বুঝাবুঝি হলে জনাব মকবুল সাহেবকে তা সমাধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি সমাধানের জন্য সবাইকে নিয়ে আলোচনায় বসলে স্থানীয় দায়িত্বশীলদের কথা শুনে খাঁন সাহেব বললেন, এ কথাগুলো শুনার জন্য কি আমি এ প্রতিষ্ঠানগুলো করেছি? এ কথার উত্তরে মকুবল সাহেব বললেন, ব্যক্তি আব্বাস আলী খাঁনকে প্রতিষ্ঠান করার জন্যে মানুষ টাকা দেয়নি, বরং জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীরকে মানুষ টাকা দিয়েছে। এ কথার পর সবাই চুপ হয়ে গেলেন এবং সমস্যাটি সহজে সমাধান হয়ে গেল।

২০১৭ সালে ফেনী জেলার পক্ষ হতে আমি কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য নির্বাচিত হলে আমাদের ৮/১০ জনকে শপথ দেয়ার জন্য ঢাকায় একটি বাসায় একত্রিত করা হয়। সেখানে তৎকালিন আমীরে জামায়াত হিসেবে

তিনি উপস্থিত হলে আমাদের সকলের সাথে সালাম বিনিময়ের পর তিনি করমর্দন করেন। এ অবস্থায় আমি সর্বশেষ ব্যক্তি হওয়ায় স্যারকে অনেক দিন পর দেখতে পেয়ে আবেগের কারনে আমি স্যারের সাথে কোলাকোলি করি কিন্তু পরক্ষনে তিনি পূনরায় সবার সাথে কোলাকুলির কাজটি সেরে নেন। তাৎক্ষনিক বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তোলে যে, তিনি মনে করেছেন আমি তাঁর জেলার লোক হওয়ার কারনে অন্যরা মনে করতে পারে যে তিনি শুধুমাত্র আমার সাথে কোলাকুলি করলেন কেন? তাই পূনরায় অন্যদের সাথেও তা করে নেন, যেন কারো মনে আঞ্চলিকতা কোন ধরনের সন্দেহের উদ্রেগ না হয়। এ যেন জামায়াত কর্মী দায়িত্বশীলদের নিকট ইন্‌সাফের এক মূর্ত প্রতীক।

দু:খী মানুষের দরদী বন্ধু

জনাব মকবুল আহমাদ ছিলেন দু:খী, অভাবী মানুষের এক দরদী বন্ধু। এক সময় সাংগঠনিক ও সামাজিক প্রয়োজনে তিনি মাসে কয়েকবার ফেনী আসতেন। তিনি ফেনী আসবেন এ খবর আমরা জানার আগে অনেক সময় কিছু অভাবী দরিদ্র লোক তা জেনে যেতেন এবং জামায়াত অফিসে এসে ভিড় জমাতেন। তাদেরকে আসার কারন জানতে চাইলে তারা বলতেন কেন আজকে স্যার আসবেন আপনারা তা জানেন না? এরপর তিনি তাদেরকে ডেকে সমস্যা শুনতেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করে যেতেন আর ফেনীর দায়িত্বশীলদেরকে তাদের ব্যাপারে সহযোগীতা করার জন্য বলে যেতেন।

বান্দার হকের ব্যাপারে ছিলেন আপোষহীন

জনাব মকবুল আহমাদ মহান আল্লাহর হকের ব্যাপারে যেমন ছিলেন সচেতন, তেমনি বান্দার হকের ব্যাপারেও ছিলেন আপোষহীন। আমরা অনেকেই ছোট-খাট বিষয়গুলো এড়িয়ে গেলে তিনি এ ব্যাপারে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন। ১৯৯২ সালে তিনি আমাকে ডেকে দাগনভূঁঞা সিরাজাম মুনিরা সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত "দাগনভূঁঞা একাডেমী" এর পরিচালনার দায়িত্ব দিলে আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর আদেশ মেনে নিই। স্কুলের দায়িত্ব পালনের কোন এক সময় আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে স্কুলে ছোট্ট একটি প্যাডের পাতায় আমি স্যারকে একটি চিঠি লিখি। এর কিছুদিন পর তিনি ফেনী সফরে আসলে আমাকে ডেকে পাঠান। আমি মনে করেছিলাম যে প্রয়োজনে আমি তাঁকে পত্রটি দিয়েছি তা হয়ত হয়ে গেছে তাই তিনি আমাকে ডাকছেন। পরে আমি যখন তাঁর সাথে দেখা করি তিনি বলেন, ইউসুফ তুমি আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলে, আমি উত্তরে হ্যাঁ বললে তিনি হাতে আমার দেয়ে পত্রটি নিয়ে বলেন, তোমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে স্কুলের প্যাডের পাতা ব্যবহার করা ঠিক হয়েছে কি না? আমি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে বললাম এটা করা ঠিক হয়নি, ভবিষ্যতে এ রকম হবে না স্যার। তিনি বললেন ছোট খাট বিষয়গুলোও বান্দার হক। এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

দায়ী ইলাল্লাহর মূর্ত প্রতীক :

জনাব মকবুল স্যার ছিলেন দায়ী ইলাল্লাহর মূর্ত প্রতীক। সার্বক্ষনিক সাংগঠনিক কাজে থাকলে সময় পেলে টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াতী কাজে অভ্যস্থ ছিলেন তিনি। ফেনীতে সফরে আসলে তাঁর ব্যাগের মধ্যে অনেক জিনিষের মধ্যে একটি পুরানো বড় ডাইরী দেখা যেত। এতে তিনি কয়েকশ লোকের ঠিকানা টেলিফোন নম্বর সংরক্ষন করতেন। এবং সময় করে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন, তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন, দাওয়াতপ্রাপ্ত নিস্ক্রিয় ভাইদেরকে সংগঠনে এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করতেন। এ যেন দায়ী ইলাল্লাহের এক মূর্ত প্রতীক।

নিরহংকার লোভহীন ব্যক্তিত্ব

মুহতারাম মকবুল আহমাদ ছিলেন একজন নিরহংকার লোভহীন ব্যক্তিত্ব। এতবড় জাতীয় নেতা হলেও তাঁর আচার আচরনে কোন ধরনের অহংকারের চিহ্ন দেখা যেত না। আর দুনিয়ার কোন স্বার্থের প্রতি তার লোভ ছিলনা বললে অত্যুক্তি হবে না। ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী ২নং আসন থেকে ফেনী জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে তাঁর নাম প্রস্তাব করার আগেই তিনি কেন্দ্রীয় সংগঠনকে বুঝিয়ে তাঁর নাম প্রস্তাবনায় না রাখার জন্য রাজি করে নেন। পরবর্তীতে জেলা জামায়াতের পক্ষ হতে তার নাম প্রস্তাব করলে তিনি তা বার বার এড়িয়ে যান, এমনকি এই কারনে তিনি দীর্ঘদিন ফেনীতে আসা পর্যন্ত বন্ধ করে দেন। পরে তিনি একবার ফেনী আসলে জেলা মজলিশে শূরায় পূনরায় তাঁর নামের প্রস্তাবনা আসলে তিনি নাখোশ হয়ে বলেন যে, তোমরা আমার নাম নিয়ে এ জাতীয় প্রস্তাব দেবে মনে করে আমি ফেনীতে আসা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছি। তারপরও আমার নাম আসছে কেন? উপস্থিত বৈঠকে আমি স্যারকে লক্ষ্য করে বললাম স্যার আপনার বাড়ী যদি ফেনী না হতো তাহলে আমরা আপনার প্রস্তাবটি দিতাম না। তিনি উত্তরে হেঁসে বললেন তাই! তারপরও আমরা তাঁর নামের প্রস্তাবনা কেন্দ্রে পাঠালেও তিনি তা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। এ থেকে প্রমানিত হয় যে, তিনি কত বড় লোভহীন ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

সহজ সরল জীবন যাপন

জনাব মকবুল আহমাদ সাহেব অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিলেন। তিনি যখন ফেনীতে আসতেন, তখন তার ব্যাগের মধ্যে কয়েকটি জিনিষ দেখা যেত। যেমন একটা ডায়েরী, একটা ঔষুধের বক্স, সুই-সুতাসহ একটা সেলাইয়ের বক্স। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম স্যার সুই-সুতার বক্সটা কি সফরের সময় দরকার হয়। তিনি বললেন অনেক সময় জামা-কাপড় গেঞ্জি ইত্যাদি ছেঁড়া থাকে, বাসায় সময় পাইনা, তাই সফরে সময়

পেলে প্রয়োজনীয় কাপড়গুলো সেলাই করে নিতে হয়। তার এ ধরনের অবস্থা দেখলে মনে হয় দিল্লীর বাদশাহ আলমগীর জিন্দাপীর আবার নতুন করে দুনিয়ায় আগমন করেছেন।

ইন্তেকাল

"প্রত্যেক জীনবকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে" আল্লাহ তা'য়ালার এই চিরন্তন ঘোষণা থেকে জনাব মকবুল আহমাদ সাহেবও ব্যতিক্রম নন। আমীরে জামায়াত থাকাকালিন ব্লাড ক্যান্সার নামক মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেও যথাযথাভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ২০২১ সালের মার্চের শেষের দিকে তিনি কোভিট-১৯ এ আক্রান্ত হন। অবশেষে ২০২১ সালের ১৩ই এপ্রিল মঙ্গলবার দুপুর ১.০০ টায় বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের ক্ষনজন্মা এই প্রাণ-পুরুষ, প্রখ্যাত দা'য়ী ইলাল্লাহ, ফেনীর গৌরব, বাংলাদেশের কৃতি সন্তান, কঠিন দু:সময়ের ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার ও কান্ডারী মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে এই নশ্বর জগত ত্যাগ করে তার রবের সান্নিধ্যে চলে যান। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্ন ইলাহি রাজেউন।

জানাজা ও শেষ বিদায়

ঢাকার বিখ্যাত ইবনে সীনা হাসপাতালে চিকিৎসা রত সাবেক আমীরে জামায়াত মুহতারাম মকবুল সাহেবের ইন্তেকালের খবর মুহূর্তের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সকল প্রচার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে দেশে ইসলামী আন্দোলনের সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মাঝে চরম ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়। পরবর্তী করনীয় নিয়ে আলোচনার জন্যে আমরা জেলা কার্যালয়ে একত্রিত হলে মুহতারাম জিলা আমীর জনাব এ. কে.এম শামছুদ্দীন বর্তমান আমীরে জামায়াত মোহতারাম ডা: শফিকুর রহমানের সাথে আলাপ করে জানান যে, আজ রাত ১২টা থেকে সারাদেশে আবার নতুন করে লকডাউন ঘোষনা এবং রমজানের রোজার প্রথম দিন হওয়ার কারনে ফেনী শহর সহ একাদিক স্থানে মরহুম মকবুল সাহেবের জানাযা করার চিন্তা থাকলেও পরিস্থিতির আলোকে শুধুমাত্র রাত ১০টায় তাঁর গ্রামের বাড়ীতে জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। তিনি জানাযা নামাযের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহনের জন্য স্থানীয় দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব দেন। পরবর্তী আমি এবং জেলা সহ-সেক্রেটারী জনাব মাওলানা আবদুল মালেক জানাযার কার্যক্রম তদারকী করার পরামর্শ দিলে আমরা বাদ মাগরিব সেখানে পৌছি। সেখানে গিয়ে দেখি জানাযার যাবতীয় প্রস্তুতি মোটামুটি সম্পন্ন হয়েছে। তবে যে বিষয়টি আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছিল তা হচ্ছে আজ রমজান শুরু হওয়ায় মানুষ তারাবীহ এর নামাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। রাত বারটা হতে লকডাউন শুরু হওয়ায় যাতায়াতের সকল প্রকার যানবাহন ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় জানাযায় লোক সমাগম কেমন হবে? কিন্তু যখন এশার নামাজ শেষ

করে আমরা জানাযার স্থানে গিয়ে দেখি চতুর্দিক থেকে হাজার হাজার মানুষ জানাযার দিকে আসছে আর আসছে। এ যেন এক বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ার। এদিকে ঢাকা থেকে মুহতারাম আমীরে জামায়াত ও সেক্রেটারী জেনারেলের নেতৃত্বে মরহুমের কফিন নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ফেনী উদ্দেশ্যে যথাসময়ে রওয়ানা দিলেও রাস্তায় প্রচন্ড জ্যামের কারণে যথাসময়ে কফিন এসে পৌঁছতে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ইতিমধ্যে জানাযার মাঠ হাজার হাজার মুসল্লিতে কানায় কানায় ভরে উঠে। অবশেষে ১১টার দিকে মরহুমের কফিন নিয়ে আমীরে জামায়াত সেখানে পৌঁছেন। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ জানযার স্থলে পৌঁছলে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারনা হয়। মধ্যরাত্রিতে আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে আমীর জামায়াত তাঁর প্রিয় মুরুব্বী এবং দীর্ঘদিনের সাথীকে নিয়ে এক হৃদয় বিদারক বক্তব্যের পর নিজেই মরহুমের জানায়ার ইমামতি করেন। জানাযা শেষে আমরা যখন মুহতারাম মকবুল আহমাদের কফিনকে দাফনের উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ী সম্মুখস্থ কবরস্থানে নিয়ে যাই তখন আরেক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারনা হয়। যেই সংগঠনের সাবেক আমীরে জামায়াত সংগঠনের দায়িত্ব পালন শেষে যার হাতে এই কাফেলার পতাকা উঠিয়ে দিয়ে এসেছিলেন, তিনি নিজে তাঁর রাহবারকে নিজ হাতে দাফন করার জন্য সেক্রেটারী জেনারেলকে সাথে নিয়ে কবরে নেমে পড়েন এবং নিজ হাতে নিজের রাহবারকে মহান আল্লাহর নিকট সোপর্দ করেন। এ যেন নিজের আপন ভাইকে কবরস্থ করছেন, যা আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এক বিরল ঘটনা। মূলতঃ মকবুল আহমাদ সাহেব ছিলেন এক ক্ষনজন্মা আল্লাহর দ্বীনের একনিষ্ঠ রাহবার। তাঁর জীবন ও কর্মকে পর্যালোচনা করলে মনে হয় যেন তিনি আল্লাহর রাসূল (স) এর সাহাবাদের এক মূর্ত প্রতীক। তাঁকে হারিয়ে বিশ্ব মুসলিম হারিয়েছে একজন নির্ভিক সীপাহসালার, বাংলাদেশ হারিয়েছে একজন দেশপ্রেমিক জন নেতা। আমরা হারিয়েছি একজন আদর্শ পথ প্রদর্শককে, যার ক্ষতি কোনদিন পূরণ হবার নয়। পরিশেষে মহান আল্লাহ যেন তার জীবনের সকল নেক আমলগুলো কবুল করেন এবং এর ওসিলায় তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মোকাম জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন এ কামনা করে সমাপ্ত করছি।

লেখক :

নায়েবে আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ফেনী জেলা ও সেক্রেটারী দারুল ইসলাম সোসাইটি ফেনী।

সকলের প্রিয় মকবুল আহমাদ (রহ.)

মাওলানা মাহমুদুল হক

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে শেকড় থেকে শিখরে দায়িত্ব পালনকারী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কঠিন সময়ের কান্ডারী মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.)। তাঁর সাথে ইসলামী আন্দোলনের সুবাদে ছাত্র জীবন থেকে পরিচয়। তবে উনাকে সরাসরি কাছাকাছি থেকে দেখার ও উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছি ১৯৮৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন। স্যারের সাথে নানা কাজে বিভিন্ন সময় যোগাযোগ করতে হতো। এ কারণে মরহুমের সাথে অনেক স্মৃতি আছে। তাই ভাবছি কোনটা রেখে কোনটা লিখব। লেখার কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সংক্ষেপে কয়েকটি উল্লেখ করলাম।

তিনি মাঝে মাঝে আমাকে ফোন করে কিছু বাংলা যুক্তবর্ণ বিশিষ্ট শব্দের বানান, সমোচ্চারিত শব্দের অর্থের পার্থক্য জানতে চাইতেন। উনার মত নিরেট মুখলেস ও ভদ্র লোক আমাকে পরীক্ষা করার জন্য তা করতেন তা আমার মনে হতো না। আমি মনে করতাম আমি বাংলার ছাত্র বিধায় স্যার হয়তো ঐ শব্দের ব্যাপারে কোন দ্বিধাদ্বন্ধ দূর করতে প্রশ্ন করেছেন।

নির্ভিক ও আদর্শবাদী মকবুল আহমাদ :

স্বৈরাচার বিরোধী ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে জোটবদ্ধ আন্দোলন তীব্র হলে ১৯৮৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন সেনা শাসক জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ। ফেনী-দাগনভূঁঞা তখন এক আসন ছিল। সে নির্বাচনে মকবুল সাহেব জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে দাঁড়িপাল্লা মার্কায় নির্বাচন করেন। নির্বাচনে মিছিল, মিটিং, গণসংযোগ বেশ জোরে শোরে চলে। বর্তমান নির্বাচনের মত আইন কানুন আবদ্ধ, নিরস নির্বাচন ছিল না তা। দলের প্রার্থীর সাথে খোলা জীপে বেশ কিছু নির্বাচনী কর্মী

মিছিল করতে করতে গণসংযোগে যেত। নির্বাচনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরে যাই হোক প্রচার প্রোপাগান্ডায় হৈ হৈ রব রৈ রৈ কান্ডের কমতি ছিল না। আমার বাড়ী সোনাগাজী হওয়ায় আমি নির্বাচনী রং চং দেখার বা মিছিলে খুব বেশী অংশ নেয়ার সুযোগ পাইনি। তবে ২/৩ ইউনিয়নের ভোটার চিঠি লিখে দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছি বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে। নির্বাচনের ১দিন আগে ফেনী এসে ভোট দেখে যাওয়ার মনস্থ করি। ভোটের দিন সকালে দাঁড়ি পাল্লার নির্বাচনী অফিসে চারিদিক থেকে সংবাদ আসা শুরু হয়। একটা অংশে জয়নাল হাজারীর নৌকা মার্কার লোকেরা, আরেক অংশে ভিপি জয়নালের নির্বাচনী কর্মীরা কেন্দ্র দখল করে জামায়াতের এজেন্টদেরকে কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়েছে। একজন দায়িত্বশীলসহ কিছু স্বেচ্ছাসেবক অফিসে বসা ছিল। অফিসের সামনে একটা খোলা জিপ পড়ে থাকায় ভোটের অবস্থা দেখার মানসে দায়িত্বশীলের নেতৃত্বে আমরা কিছু স্বোচ্ছাসেবক কোরেশমুন্সীর দিকে রওয়ানা হলাম। রাজাপুর বাজার পার হয়ে মালেক মিয়ার বাজারের কাছাকাছি গেলে পশ্চিম দিক থেকে শ্বশ্রুমন্ডিত এক হোন্ডা আরোহীকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। তিনি কাছে এসে বললেন, 'হায় হায় বরবাদ, নৌকার লোকেরা লতিফপুর কেন্দ্র দখল করে সমানে জাল ভোট দিচ্ছে। আপনারা আসছেন ভালই হলো। আমি গিয়ে সংবাদ জানাই।' একথা বলে লোকটি হোন্ডা ফিরিয়ে চলে গেলো। পরে বুঝলাম লোকটি ছিল নৌকার প্রার্থীর ইনফরমার। আমরা কেন্দ্রের সামনে গিয়ে পৌছেছি এ মুহূর্তে মকবুল সাহেবও উনাকে বহনকারী মাইক্রোতে করে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকসহ সেখানে হাজির। কিছু ভেবে ওঠার আগে হঠাৎ নৌকার লোকেরা বিশাল এক কিরিচ দিয়ে উনার মাইক্রোর গ্লাসে দিল কোপ। গ্লাস ভেঙ্গে খান খান হয়ে উনার গায়ে পড়ল। তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন। উনার গাড়ির ড্রাইভার মুহূর্তে উদাও। অথচ মকবুল সাহেব বীরদর্পে গাড়ি থেকে নামলেন। ভীতির কোন চিহ্ন উনার চেহারায় নেই। আমরা তো অবাক। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা হামলাকারীদের ধাওয়া করলে তারা পালিয়ে যায়। তিনি সবাইকে শান্ত হতে বললেন। তারপর ভোটকেন্দ্রে ঢুকে প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার ও নির্বাচনী এজেন্টদের সালাম দিলেন, কুশল বিনিময় করলেন, সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিলেন। এমতাবস্থায় আমাদের দুয়েক জন কর্মী পোলিং অফিসার থেকে বই নিয়ে জাল ভোট দেয়ার মানসে তর্ক করছে দেখে তিনি গেলেন প্রচন্ডভাবে ক্ষেপে। তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা আমার সাথে এসেছ, তোমরা তো এ কেন্দ্রের ভোটার না। তোমরা জাল ভোট দিয়ে কি ইসলাম কায়েম করবে আমাকে বল দেখি? আওয়ামী লীগ ভোট ডাকাতি করছে, জাতীয় পার্টি ভোট ডাকাতি করছে। এটা তাদের জন্য মানানসই। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী এদেশে ইসলাম কায়েম করতে চায়; মানবাধিকার বাস্তবায়ন করতে চায়, আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। জামায়াতের

আদর্শের সাথে ভোট কারচুপি বা ভোট ডাকাতি খাপ-খায়না। এখানে যারা ভোটার আছেন তারা নিজের ভোট দিন, কেন্দ্র পাহারা দিন, যাতে জনগণ নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে। এতে আমি যে ভোট পাব সেটা হবে ইসলামের পক্ষে। আমি এম.পি হলাম কি হলাম না সেটা বড় কথা না, ইসলামী আদর্শ জিতছে কিনা সেটা বড় কথা।”

সোনাগাজীর প্রবাস ফেরৎ আবদুস সালাম ভাই একজন আনকোরা ড্রাইভার। তিনি ড্রাইভ করে স্যারের গাড়ি দাগনভূঁঞা নিলেন। জীবনের ঝুঁকির সে কঠিন মুহূর্তে সেদিন মকবুল সাহেবকে দেখেছি দু:সাহসী মানুষ হিসেবে। বাংলাদেশে সাধারণ সেক্যুলার রাজনীতিক দূরে থাক দ্বিতীয় কোন পীর-বুযুর্গ ব্যক্তি পাওয়া যাবে কিনা আমি জানিনা যিনি নির্বাচনী হারজিতের এ মুহূর্তে আদর্শ ধারণ করে থাকবেন।

এ নির্বাচনে ভোট ডাকাতির মহোৎসব হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই টার্ম ব্যতীত বাংলাদেশে কোন নির্বাচনই সুষ্ঠু হয়নি এবং হবার সম্ভাবনাও নেই। এরশাদ আমলের সে নির্বাচন শেষে ১৯৮৮ আমাদের একটি শিক্ষাশিবিরে ‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিধারা’ শীর্ষক এক আলোচনায় শহীদ কামারুজ্জামান ভাই বলেছিলেন, ‘এরশাদের এ ইলেকশান মডেল হচ্ছে- ইলেকশান ইলেকশান, ১০টা হোন্ডা, ২০জন গুন্ডা, ইলেকশান ঠান্ডা।” গুণ্ডামীর রাজনীতি থেকে বিগত তিনযুগ আমরা পরিত্রাণ পাইনি। সামনের দিনগুলোর কথা আল্লাহই ভাল জানেন।

আমরা জাতি হিসেবে অপচয়ী ও দায়িত্ব জ্ঞানহীন :

১৯৯৫-১৯৯৯ইং সনে আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদরাসায় আমি হোস্টেল সুপারের দায়িত্বে ছিলাম। সে সময় ফালাহিয়া মাদ্‌রাসা ক্যাম্পাসে কোন মসজিদ না থাকায় আমরা শান্তি কোম্পানী মসজিদে জামায়াতে নামাজ আদায় করতাম। ফজরের পর মসজিদে ছাত্রদের হাজিরা ডেকে কুরআন তা'লিম ও নসিহতের কাজ চলত। হাজিরা ডাকা শেষ হলে আমি হোস্টেলে ফিরে আসতাম আর বিষয় শিক্ষকেরা কুরআন তা'লিমের কাজ চালাতেন। সন তারিখ মনে নেই। একদিন মসজিদ থেকে ফিরে এসে দেখি মকবুল সাহেব মাদরাসার বারান্দায় হেটে হেটে লাইটগুলোর সুইচ অফ করছেন। ডায়াবেটিস রোগী হওয়ায় ফেনী আসলে ফজরের পর বৃষ্টি-বাদল না থাকলে তিনি রাস্তায়ও হাঁটতেন। একদিন দেখি পৌরসভার লাইট পোস্টের সুইচ অফ করছেন। যা হোক উনি আমাকে বললেন, মাহমুদ! আমরা জাতি হিসেবে অপচয়ী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। বিদ্যুৎ জাতীয় সম্পদ। এ বিদ্যুতের অভাবে জাতীয় বহু গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন ও কাজ কারবার আটকে যায়। মাদ্‌রাসার লাইট বা পৌরসভার বাতি যেখানে অপচয় হয় নাগরিক হিসেবে তোমার

আমার দায়িত্ব তা রোধ করা। এতে একদিকে প্রতিষ্ঠানের অর্থের অপচয় অপরদিকে জাতীয় সম্পদ অনাহুত নস্ট হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। কিয়ামতের দিন কি গোটা জাতির সামনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবাব দিতে পারবে? মকবুল সাহেবের মত দেশপ্রেমিক এ সোনার মানুষগুলোকে এ জাতি কি চিনতে পেরেছে?

কলমে জং ধরবে :

আমি ছাত্র জীবন থেকে একটু আধটু লেখালেখি করি। মাঝে মাঝে কিছু স্মরণিকা বা সাময়িকী প্রকাশ করেছি তা মকবুল স্যার জানতেন। সে কারণে ফালাহিয়া মাদ্‌রাসায় যোগ দেয়ার পর তিনি ঢাকা থেকে ফেনী আসলে আমাকে লেখালেখি করতে উৎসাহিত করতেন। বেশ কয়েকবার সৌদি আরবের জামেয়া ইমামের পাক্ষিক পত্রিকা "মেরআতুল জামেয়া" এর কিছু পুরাতন ও চলতি সংখ্যা এনে আমাকে দিয়ে বলেন এগুলো থেকে কোন লেখা অনুবাদ করে সংগ্রাম বা সোনার বাংলায় পাঠানো যায় কিনা দেখবে। আর তুমি লেখালেখি করবে। কিছু লেখা আমি অনুবাদ করেছিলাম বটে কিন্তু পাঠাব পাঠাচ্ছি করে নানা ব্যস্ততায় আর পাঠানো হয়নি। ৯৫, ৯৮ ও ২০০৩ সালে ফালাহিয়ার ৩টি বার্ষিকী ও স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় আমার সম্পাদনায়। সে সুবাদে তিনবারই মকবুল স্যারের সহযোগিতা নিয়েছি সবচেয়ে বেশী। বিশেষ করে বিজ্ঞাপন কালেকশনে ও ছাপানোর ক্ষেত্রে তিনি সার্বিক সহযোগিতা করেছিলেন। সে সময় দেখলাম উনার আলাদীনের আশ্চর্য ডায়েরী। ডায়েরী বের করে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ফোন করছেন আর এক স্লিপে উনি যে পাঠাচ্ছেন তার প্রমাণপত্র ও বিজ্ঞাপন দেয়ার রিকোয়েস্ট। কি আশ্চর্য ব্যাপার! আমি আর অধ্যক্ষ মরহুম আবুল হাশেম (রহ.) যেখানে গিয়েছি সাদরে আপ্যায়িত হয়েছি। বার্ষিকী ছাপানোর পর কিছু কপি অগ্রীম নিয়ে বিজ্ঞাপনের বিল কালেকশন করে আল ফালাহ্ প্রেসের বিল পরিশোধ করে বাকী কপি নিয়ে ফেনী ফিরলাম। এখন ভাবি মানুষের উপর উনার কি পরিমাণ নৈতিক প্রভাব ছিল। একটি ফোন ও এক টুকরা কাগজের নোটে আমরা বড় ঝামেলার কাজ সহজে উৎরে গেলাম।

২০০৩ সালে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুককে ফালাহিয়া মাদ্‌রাসায় ২৫ বছর পূর্তি উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে দাওয়াত দেয়া হয়। সেবার স্মারকের জন্য বাণী ও বিজ্ঞাপনগুলো কালেকশনে তিনি আগের মত নির্দিষ্ট সময়ে করে দেন। আসার সময় আমাকে বলেন মাহমুদ তোমাকে কত করে বললাম লেখালেখি করতে। কিন্তু ব্যস্ততার অজুহাত পেশ কর। ব্যস্ততা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ছাড়বেনা। কিন্তু এক সময় তোমার কলমে জং ধরে যাবে, প্রতিভা ফিকে হয়ে যাবে, লিখতে চাইলেও আর লিখতে পারবে না। তাই আবারও

তোমাকে একই উপদেশ দিচ্ছি। আমি তখন বলেছিলাম- ঠিক আছে স্যার, এখন থেকে চেষ্টা করব। মরহুমের জানাযায় অংশ গ্রহণ করতে গেলে এই কথাগুলো আমার কর্ণকুহরে যেন অনুরণিত হচ্ছে। আর আমি উনার বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে আওড়াচ্ছি স্যার আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। আমি আপনার কথা রাখতে পারিনি।

তোমার জন্য সাড়ে তিন হাত জায়গা :

আরেকবার কি একটা কাজে স্যারের কেন্দ্রীয় অফিসে সাক্ষাতে গেলাম এখন মনে নেই। আলাপ-চারিতার এক ফাঁকে আমাকে বললেন, অমুক (সাবেক ফেনী শহর আমীর) ঢাকা এসেছে তাকে একটা ভাল চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিতে। তার শ্বশুর সাহেবও রিকোয়েস্ট করেছেন। তাকে আর তোমাকে বলেছিলাম ছাত্র জীবন শেষে ফেনীতে ইসলামী আন্দোলনে সময় দিতে। কিন্তু সে বড় লোক হতে চায়। তাকে বলেছি ফেনী ইসলামী আন্দোলনকে রেখে ঢাকা এসে হয়তো কখনো তুমি বড় লোক হবে, বিশাল টাওয়ারের মালিক বনে যাবে। তার শীর্ষদেশের দিকে তাকাতে গিয়ে তোমার মাথার টুপি পড়ে যাবে। কিন্তু মনে রেখো তোমার জন্য সাড়ে তিন হাতের বেশী বরাদ্দ নেই। আমি বললাম, 'স্যার আপনি একথা বলা মানে উনার প্রতি বদদোয়া।' উনি আমাকে বললেন, "তুমি মনে করছ বদদোয়া। আমি বদ দোয়া দেয়ার কে? বাস্তব কথা বলেছি। কারো পেছনে কথা বলা আমার অভ্যাস নয়। তোমাকে বলার কারণ হলো তুমিও সে একই বিষয়ে অনার্স করেছ, দু'জনে পরস্পর বন্ধু ও ছাত্র নেতা ছিলে। তার আছরে তুমিও যেন ফেনী ত্যাগ না কর।"

সেলায়ে রেহেমী ও দ্বীনি দায়িত্ব :

মকবুল স্যার দ্বীনের নির্ভেজাল দা'য়ী ছিলেন। তিনি বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন যাকে যেখানে পেতেন সুযোগ করে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত দিতেন- একথা সকলের জানা। ২০০৪ সালে আমি ফেনী শহর আমীর থাকাকালে একদিন আমাকে ফোন দিলেন। উনার এক ভাগনী আমার চাচী শ্বাশুড়ী। উনার ভাগনী জামাই ফেনী জেলা শিক্ষা অফিসার মরহুম আবদুল কুদ্দুস সাহেব। আমার আত্মীয়তার সুবাদে উনার ভাগনী, নাতি-নাতনিদের আমি দাওয়াত দিই কিনা খবর নিলেন। আমার স্ত্রীর খবর নিলেন। পরবর্তীতে অবশ্য আমার স্ত্রীর নাম্বারও উনার কাছে ছিল। উনি সরাসরি তাকেও ফোন দিয়ে আমার খোঁজ খবর নিতেন। বিশেষ করে আমি ২০১৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর হোন্ডা এক্সিডেন্ট করে ইবনে সীনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালে নিয়মিত খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন।

যা হোক আরেকদিন ফোন করে আমাকে বললেন ফেনী ইসলামী ব্যাংকে উনার এক মামাতো শ্যালক মোসলেহ্ উদ্দিন আছেন লক্ষীপুর বাড়ী আমি যেন উনার খোঁজ খবর রাখি, সাংগঠনিকভাবে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করি। আমি বললাম, 'স্যার উনি তো রুকন হয়েছেন।' উনি মাশা-আল্লাহ, মাশা-আল্লাহ বলে খুব খুশীর ভাব প্রকাশ করলেন। আত্মীয়তার সকল শেকড়ে নক্ করে দাওয়াত দানকারী দা'য়ী দ্বিতীয়তটি কি আমরা খুঁজে পাব! এ ক্ষেত্রে আমরা সকলে যদি এক একজন মকবুল আহমাদ হতে পারতাম ইসলামী আন্দোলন অল্প সময়ে গণভিত্তি অর্জন করতো নিঃসন্দেহে।

দৈনিক সংগ্রামের বিজ্ঞাপন বুথে গাউয়া ইঁদুর :

সন তারিখ মনে নেই, সম্ভবতঃ ১৯৯৯ সালের শেষ দিকের কোন একসময় হবে। মাদ্‌রাসার বেশ কিছু কাজ নিয়ে মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ মরহুম মাওলানা আবুল হাশেম (রহ.) আমাকে ঢাকা পাঠালেন। তন্মধ্যে একটি কাজ ছিল দৈনিক সংগ্রামে একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছাপাতে দিয়ে আসা, আর আগের একটি বিজ্ঞাপনের বিল পরিশোধ করা। দু'টোর জন্য ৫০০ টাকা করে মোট ১,০০০/- টাকা দিয়ে বললেন, 'বিজ্ঞাপন ম্যানেজার থেকে দু'টো বিল/ক্যাশ মেমো নিয়ে আসবেন।' সে মোতাবেক আমি দৈনিক সংগ্রামের বিজ্ঞাপন ম্যানেজারের কক্ষে যাই। তখনকার ম্যানেজারকে খুঁজে পাইনি বা তিনি তখনও অফিসে আসেননি। অফিসে থাকা একজন স্টাফকে বললাম, 'ভাই আমার এই বিজ্ঞাপনটা রাখুন। আগের বিল ও আজকেরটার জন্য একটা বিল/ক্যাশ মেমো আমাকে দিন এবং টাকাটা গ্রহণ করুন।' আগের বিজ্ঞাপন নম্বর ও মূল্য জানার জন্য আমি টেবিলে রাখা রেকর্ড বই উল্টাতে থাকি। ফালাহিয়া মাদ্‌রাসার নামে কয়েকটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে বিলের মূল্য ২৫০/- টাকা। বর্তমানটার মূল্যও ২৫০/- টাকা হিসেবে ৫০০ টাকা দিয়ে আমি ক্যাশ মেমো নিয়ে বেরিয়ে আসি। আল ফালাহ অফিসের নিচ তলায় ছিল মকবুল স্যারের অফিস। আমি উনার অফিসে ঢুকে সালাম দিতেই উনি সালামের জবাব দিয়ে বেশ উৎফুল্ল চেহারায় বললেন, 'কি খবর মাহমুদ কখন আসলে?' বললাম, 'স্যার! সকালে। মাদ্‌রাসার কিছু কাজ নিয়ে। এক ফাঁকে দৈনিক সংগ্রামে মাদ্‌রাসার একটা বিজ্ঞাপন দেয়ার দায়িত্ব দিলেন প্রিন্সিপাল সাহেব, এজন্য এখানে আসা। আর আপনার দোয়া নিয়ে যাওয়াও দরকার।' অনেক বিষয়ের খোঁজ খবর নিলেন পরামর্শ দিলেন। এক ফাঁকে আমি বলে উঠলাম 'স্যার বিজ্ঞাপন দিতে গিয়ে দৈনিক সংগ্রামের বিজ্ঞাপন বুথে একটা মস্তবড় গাউয়া ইঁদুর দেখলাম'। (ফেনী, নোয়াখালীর ভাষায় গাছে গাছে দৌড়ে এ ধরনের বড় সাইজের ইঁদুরকে গাউয়া ইঁদুর বলে)। উনি বললেন, সর্বনাশ! তাহলে ডকুমেন্টারী জিনিস সব সাবাড় করে দিবে। উনি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কাউকে ডাকতে যাবেন এভাব দেখে আমি বললাম, 'স্যার! আপনি কয়েক মিনিট

সময় দিলে আমার কিশোর বয়েসের একটা গল্প বলবো। তারপর আপনি ইঁদুর তাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েন। তিনি হেঁসে বললেন, বল।

উনার সম্মতি পেয়ে বললাম, 'আমার দাদার নাম হাজী মোহাম্মদ ইসরাফিল। তিনি একজন অবস্থা সম্পন্ন কৃষক ও পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি ছিলেন। আমাদের অনেকগুলো জমির মধ্যে চারটি ভিটি জমি ছিল। সে জমিতে দাদা বিশাল একান্নবর্তী পরিবারের জন্য বিন্নি ধান, চিনি গুড়া ধান ও সবজির চাষ করতেন। সম্ভবত: ১৯৭৮ সালের দিকে হবে, একবার দাদা নাতিদের ঢেকে বললেন, তোরা কই থাকিস? গাউয়া ইঁদুর বিন্নি ধান সব গোলায় ডুকাইছে। তোরা গিয়ে ইঁদুর ধরবি, আর ধান উদ্ধার করবি। যে কথা সে কাজ। লাঠি-সোটা, খন্তা-কোদাল, কোঁচ ও বস্তাসহ চাচাতো-জেঠাতো ভাইদের নিয়ে ইঁদুরের গর্ত খুঁড়ে ৫০ কেজির মত ধান উদ্ধার করলাম। দুইটা ইঁদুর ধরলাম। ভাবলাম দুই ইঁদুরের খাওয়ার চাহিদা কত? কি কারণে গোটা জমিন তছনছ করে এত ধান জমা করল? তারা বাচ্চা দেবে ভবিষ্যতের জন্য জমা আর কি? তারপর বললাম, 'স্যার কিচ্ছা তো শেষ করলাম, এবার আসল কথায় আসি। সংগ্রামের বিজ্ঞাপন বুথে আসলে গাউয়া ইঁদুর ঢুকেনি। ইঁদুর স্বভাবের মানুষ ঢুকেছে। আমি ফালাহিয়া মাদ্‌রাসার আভ্যন্তরীণ অডিট কমিটির সদস্য। সে হিসেবে বিগত দু'বছরের আয়-ব্যয়ের প্রত্যেকটি ডকুমেন্ট জনাব মফিজুল হক খাঁন, অধ্যাপক রফিক সাহেব ও আমি দেখেছি। সেখানে সংগ্রামের বিজ্ঞাপন বিল দেখলাম ৫০০ টাকা আর সংগ্রামের রেকর্ড খাতায় পেইড লেখা আছে ২৫০ টাকা কোন ইঁদুরের কারণে সংগ্রামে এ জঘন্য ঘটনা ঘটছে একটু দেখবেন। এটাতো একটি ছোট কেইস। আরো বড় কেইস থাকা অস্বাভাবিক নয়। তিনি আমাকে বললেন, আমি দেখব। যাওয়ার সময় তোমার ইঁদুর কাহিনী ইউনুস (ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান) সাহেবকে বলে যাবে। তিনি বর্তমানে দৈনিক সংগ্রামের চেয়ারম্যান। যে কথা সে কাজ। নাটকের অপর দৃশ্য যবনিকার অন্তরালে বিজ্ঞ কলা কৌশলীগণ মঞ্চস্থ করেছেন। সৌভাগ্যবান বা দুর্ভাগ্যবান দর্শকেরা তা দেখেছেন। সে ইতিহাস অনেকের জানা। মাদ্‌রাসায় এসে প্রিন্সিপাল সাহেবকে ৫০০ টাকা টাকা ফেরৎ ও বিজ্ঞাপন বিল দিয়ে র‍্যাটস স্টোরী বলার পর তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'এটাও কি সম্ভব?' বিশ্বাস করব কাকে?

ধরন না ধরণ :

তিনি মাঝে মাঝে আমাকে ফোন করে কিছু বাংলা যুক্তবর্ণ বিশিষ্ট শব্দের বানান, সমোচ্চারিত শব্দের অর্থের পার্থক্য জানতে চাইতেন। উনার মত নিরেট মুখলেস ও ভদ্র লোক আমাকে পরীক্ষা করার জন্য তা করতেন তা আমার মনে হতো না। আমি মনে করতাম আমি বাংলার ছাত্র বিধায় স্যার

হয়তো ঐ শব্দের ব্যাপারে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করতে প্রশ্ন করেছেন। একবার বললেন ধরন আর ধরণ কি? আমি বললাম, স্যার ধরন (দন্ত্য-ন দিয়ে) মানে প্রকার। আর ধরণ (মধ্য-ণ দিয়ে) অর্থ ধরা বা পাকড়াও করা।

তিনি ছিলেন ফালাহিয়া মাদ্‌রাসার নিয়ন্ত্রণকারী আঞ্জুমানে ফালাহিল মুসলেমিনের প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সদস্য। সে হিসেবে মাদ্‌রাসার উত্তরোত্তর উন্নতিতে উৎফুল্ল হতেন। মাদ্‌রাসা ফলাফলে শীর্ষ দশে বা টপ টেনে যাচ্ছে বা কোন ছাত্রের কৃতিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে শুনে মহা খুশি হতেন। উত্তরোত্তর তা বাড়ানোর জন্য পরামর্শ দিতেন। শিক্ষকদের কৃতিত্বের জন্য ধন্যবাদ জানাতেন।

আমাদের ব্যবহারিক জীবন :

গত কয়েকমাস ধরে কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন বইয়ের নোট, বিগত দিনে আমার প্রদত্ত ও দায়িত্বশীলদের থেকে শোনা বক্তব্যের নোটগুলো ল্যাপটপে টাইপ করছি। একটি নোট হাতে পড়ল ২০০৫ সালের। ২৩ ও ২৪ জুন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে 'জিলা মহানগরী মজলিশে শূরা সদস্যদের শিক্ষা শিবিরে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রদত্ত বক্তব্যের নোট। উদ্বোধনী বক্তব্য রেখেছিলেন আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। তিনি দ্বিতীয় অধিবেশনে "বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক আলোচনাও রাখেন। এ বিষয়ে ১৯৮৯ সালে আল ফালাহ মিলনায়তনেও উনার মুখে বক্তব্য শুনেছি ও নোট করেছি। যা পরবর্তীতে বই আকারে প্রকাশ পেয়েছে। মাওলানা এ.কে.এম ইউসুফ সাহেব দারসুল কুরআন পেশ করার কথা থাকলেও তিনি অসুস্থ থাকায় আলহাজ্ব মাস্টার সফিক উল্লাহ সাহেব সুরা আনকাবুতের ৪৩ নং আয়াত থেকে দারস পেশ করেন। সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ সাহেব আলোচনা করেন জিলা শূরা সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে। এ.কে.এম নাজির আহমদ সাহেব জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস বিষয়ে আলোচনা রাখেন। আর মকবুল আহমাদ সাহেবের আলোচ্য বিষয় ছিল আমাদের ব্যবহারিক জীবন। এ হীরক খন্ড নেতৃবৃন্দের কেউ আজ আমাদের মাঝে নেই। আল্লাহ তাঁদের সকলকে তার শ্রেষ্ঠ বান্দাদের তালিকাভূক্ত করে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন। মকবুল আহমাদ সাহেবের আলোচনার আলোকোজ্জ্বল দিকগুলো পয়েন্ট ভিত্তিক তুলে ধরছি। এতে আশা করছি রাহবারের পাঠকদের চিন্তা ও আমলে রেখাপাত করতে পারে। তিনি বলেছেন- আমরা যে আদর্শের দিকে মানব জাতিকে ডাকছি সে আদর্শের আলোকে আগে নিজেদেরকে ঢেলে সাজানো দরকার। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিকসহ সকল দিকে আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক জীবন :

- আমাদেরকে নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর জীবনের মত মান মেন্টেইন করতে হবে।
- আমরা আমাদের নিজেদেরকে একটু জিজ্ঞেস করার দরকার-

১. আমরা কি এক নম্বর সৎ-যোগ্য হওয়ার পর্যায়ে পৌছতে পেরেছি?
২. আমরা যে দাওয়াত দিই, সিলেবাস ঠিক করা হয়েছে তা কি পুরোপুরি মেনে চলি?
৩. আমাদেরকে কোরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য পড়ার যে Guidance দেয়া আছে, তা অনুসরণ করছি কিনা?

- বাস্তবতা হলো প্রচলিত সমাজের লোক থেকে আমরা কিছুটা ভাল, তবে একটি কাংখিত ও টেকসই বিপ্লবের চাহিদার তুলনায় আমরা কিছুই না।
- আমাদের মাঝে খোদাভীতি, খুশু-খুযুর কমতি প্রকট। বন্দেগীর অনুভূতি নেই বললেই চলে। এ অবস্থাগুলো পরিবর্তন করা উচিত।
- স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেয়াও জরুরী।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রেও আমাদের কমতি আছে।
- আমাদের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী গুছানো নয়।
- জীবন মান সাধ্যের বাইরে না বাড়ানো, মধ্যম ধরনের জীবন যাপন করা দরকার।
- ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর ব্যাপারে আমরা এখনও যথেষ্ট উদার নই। আমাদের এ কমতি কাটিয়ে উঠা উচিত।
- বিয়ে-থার ('বিয়ে-থা' স্যারের বলা শব্দ, মানে বিয়ে শাদি) ব্যাপারে ঋণ করে খরচ করা অনুচিত।
- ওয়াদা রক্ষার বিষয়টি আগের মত নেই।
- আমানতদারীতা কোথাও কোথাও প্রশ্নবোধক হচ্ছে।
- সুযোগ, সুবিধা পাওয়ার চাইতে দ্বীনি মান বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা জোরদার হওয়া দরকার।

পারিবারিক জীবন :

- পরিবার গঠনের জন্য নিজের ইচ্ছা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকা দরকার।
- পরিবারের সদস্যদের ঈমানী, আমলী স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা জোরদার করা উচিত।
- নিজেদের আচার-আচরণ, লেন-দেন এমন হওয়া দরকার যা দেখে পরিবারের সদস্যরা জীবন্ত ইসলাম অনুভব করে।
- বাড়ীর রেডিও, টিভি, ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। যাতে বিজাতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে বিবি-বাচ্চারা নৈতিকতার ধ্বংস না আনে।
- পারিবারিক বৈঠকগুলো নিয়ম পালনের কর্মসূচী না হয়ে প্রাণবন্ত হওয়া উচিত।

- বৃদ্ধ মাতা-পিতা থাকলে তাদের হক আদায়ে নজর দেয়া দরকার।
- জামা-কাপড়ের স্ট্যাটাস ও জৌলুস নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।
- আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে আপ্যায়ন করানো দরকার।
- ভাই-বোনদের সাধ্যমত হক আদায় করা। বিশেষ করে বোনদের মিরাসী হক অবশ্য দেয়া দরকার।
- শরয়ী পর্দায় কোন ধরনের শিথীলতা না করা।

সাংগঠনিক পরিবেশ :

- দায়িত্ব পালনে আমানতদারীতার পরিচয় দেয়া।
- নিজের বিভাগগুলোর দায়িত্ব পালনে ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সিরিয়াস হওয়া দরকার।
- গঠনতন্ত্র, সংগঠন পদ্ধতি, ইসলামী আন্দোলন সাফল্য ও বিভ্রান্তি, ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন, ইসলামী সংগঠন, ইসলামী বিপ্লব সাধনে সংগঠন বইগুলো বছরে কমপক্ষে একবার পড়া দরকার।
- দাওয়াতী টার্গেট, কর্মী টার্গেট, রুকন টার্গেটদের মাঝে মনোযোগ দিয়ে যোগাযোগ ও তত্ত্বাবধান করা দরকার।
- সময় দান হবে সর্বনিম্ন ৩ ঘন্টা। তবে পর্যায়ক্রমে শূরার সদস্যদের তা বাড়ানো উচিত।
- বাইতুলমালে ইয়ানত ১ম সপ্তাহে দেয়া। ৫% থেকে ধাপে ধাপে ১০% উন্নিত করার চেষ্টা করা দরকার।
- বৈঠকাদিতে টাইম মেন্টেইন করা দরকার। VIP হওয়ার চেষ্টা না করা।
- অযথা ব্যাখ্যা দিয়ে দায়িত্ব থেকে বাঁচার চেষ্টা না করা।
- সকল রিপোর্ট যথাসময়ে পৌছানো।
- কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকে সব সময় Welcome জানানো।
- শূরা সদস্যদের আচার-ব্যবহারের কারণে যেন জনশক্তির মাঝে প্রতিক্রিয়া না হয়।
- বাইতুল মালের আয়-ব্যয়ে সতর্ক থাকা।
- সংগঠনের টাকা ও সম্পদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় না করা।
- কোন সম্পদ ব্যবহারের দরকার হলে সংগঠনের অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করা।
- আয়-ব্যয়ের রশিদ ও ভাউচার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা।

সর্বশেষ :

- রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েমের আগে নিজের জীবনে ইসলাম কায়েম করতে হবে।

মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) নিজে পাকা মুসলিম হওয়ার ও থাকার সংগ্রামে জীবন শেষ করেছেন। সবাই এক নম্বর মুসলিম হোক তা তিনি মনে প্রাণে চাইতেন। তাঁর আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট। আমরা সকলে নম্বর ওয়ান মুসলিম হওয়ার চেষ্টা করতে পারি যা একটি কাংখিত টেকসই ইসলামী বিপ্লবের জন্য প্রথম শর্ত। তাহলে আমাদের নেতৃবৃন্দের আত্মত্যাগ সফল হবে।

তিনি ছিলেন সকলের প্রিয় :

কোন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে সকলের মন জয় করে চলা অনেকটা অসম্ভব। অধীনস্তরা বাইরে থেকে শ্রদ্ধা সম্মানের ভাব দেখালেও পেছনে গীবত করে দায়িত্বশীল ব্যক্তির প্রতি অসম্মান করা বাংগালী চরিত্রের অন্যতম দিক। মুসলিম হওয়ার পরেও আমরা এ খাসলত থেকে মুক্ত নই। আমার যাপিত জীবনের এটাই অভিজ্ঞতা। কিন্তু আমার একটা অবজারবেশন হলো মকবুল স্যার ছিলেন এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তিনি কোন দায়িত্বশীলের গীবত করা, পেছনে কথা বলা, সম্মানহানী হয় এমন আচরণ করা, রুঢ় ভাষা ব্যবহার করা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতেন। তবে আমানতদারীতা ও শৃঙ্খলা ভংগের ক্ষেত্রে তিনি কোন আপোষ করতেন না। তারপরও সকলে তাঁকে সামনে কি পেছনে সমানভাবে শ্রদ্ধা করতে দেখেছি। এখন ভাবি আসলে তিনি তাঁর মুয়ামালাত ও মুয়াশারাতে জীবনে স্বচ্ছ ও দ্বীনের পূর্ণ অনুবর্তী হওয়ায় সকলের প্রিয় ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি ইর্ষণীয় সুনামের অধিকারী ছিলেন।

এক দরাজদিল মানুষ :

আমার স্ত্রী শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজের লেকচারার। তার একজন ছাত্রী জান্নাতুল ফেরদাউস তার মাধ্যমে আমার কাছে আসল ফালাহ-ই-আম ট্রাস্টের বৃত্তির আবেদনে আমার সুপারিশের জন্য। আমি সুপারিশ করেছি। তিনি সে ছোট্ট সুপারিশটাকেও গুরুত্ব দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। মরহুম মকবুল আহমাদ সাহেব মানব সেবায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন এবং একটু ক্ষিণ আওয়াজেও তিনি সাড়া দিতেন। আল্লাহ তাঁর এ বান্দাহর কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিন। কিয়ামতের কঠিন দিনে তাঁকে সম্মানিত করুন। আমাদের সকল সাবেক নেতৃবৃন্দ যারা মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে বিদায় নিয়েছেন তাদের সকলকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানিয়ে নিন। আমাদের প্রতি রহম করুন। এ জমিনকে তিনি ইসলামের জন্য উর্বর করে দিন। বাতিলের সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে আমাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দিন। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। আমীন॥

একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব
মকবুল আহমাদ (রহ.)

"বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। বিশেষত: দ্বীনি আন্দোলনের প্রতিটি সাবেক, বর্তমান জনশক্তি, প্রতিটি সম্পদের ব্যবহার ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর আমানতদারিতার প্রমাণ বহন করে। অমায়িক ব্যবহার, নির্মল হাঁসি মানুষকে পর্দার অন্তরাল থেকে ভালবাসার উঁচু মিনার তৈরী করে গেছেন তিনি। যেখানে সমস্ত পৃথিবী প্রদর্শনেচ্ছার দৌড়ে হামাগুড়ি খাচ্ছে সেখানে তিনি এক প্রচার বিমুখ লাজুকতার আবরণের পিরামিড।"

মুফতী আবদুল হান্নান

একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব জনাব মকবুল আহমাদ (রহ.)। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনুকরণ, অনুসরণ যার ব্যক্তিত্বের মাঝে সুনিপুণভাবে ফুটে উঠেছিল। জীবনের পথচলার প্রতিটি বাঁকে বাঁকে তিনি রেখে গিয়েছিলেন তাঁর স্বাক্ষর। মহান আল্লাহর বাণী-

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

অর্থ: (হে নবী!) এটা আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ যে, তোমার ব্যবহার তাদের প্রতি বড়ই কোমল।নয়তো যদি তুমি রুক্ষ স্বভাবের বা কঠোর চিত্ত হতে, তাহলে তারা সবাই তোমার চার পাশ থেকে সরে যেতো।তাদের ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো এবং দ্বীনের ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শে তাদেরকে অন্তরভুক্ত করো।তারপর যখন কোন মতের ভিত্তিতে তোমরা স্থির সংকল্পবদ্ধ হবে তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো।আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা তাঁর ওপর ভরসা করে কাজ করে। (সূরা আলে ইমরান- ১৫৯)

অত্র আয়াতে কারীমার বাস্তব প্রতিচ্ছবি ছিলেন তিনি। বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। বিশেষত: দ্বীনি আন্দোলনের প্রতিটি সাবেক, বর্তমান জনশক্তি, প্রতিটি সম্পদের ব্যবহার ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর আমানতদারিতার প্রমাণ বহন করে। অমায়িক ব্যবহার, নির্মল হাঁসি মানুষকে পর্দার অন্তরাল থেকে ভালবাসার উঁচু মিনার তৈরী করে গেছেন তিনি। যেখানে সমস্ত পৃথিবী প্রদর্শনেচ্ছার দৌড়ে হামাগুড়ি খাচ্ছে সেখানে তিনি এক প্রচার বিমুখ লাজুকতার আবরণের পিরামিড।

জনশক্তির আমানতদারিতা :

মহান আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

> অর্থ: হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারদের হাতে ফেরত দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর লোকদের মধ্যে ফায়সালা করার সময় 'আদল' ও ন্যায়নীতি সহকারে ফায়সালা করো। আল্লাহ তোমাদের বড়ই উৎকৃষ্ট উপদেশ দান করেন। আর অবশ্যি আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন। (সূরা আন নিসা- ৫৮)

ইসলামী আন্দোলনে সবচেয়ে বড় আমানত জনশক্তির আমানত। সাবেক বর্তমান সমস্ত জনশক্তি হলো দায়িত্বশীলের নিকট আমানত। সবার যথাযথ হক আদায় করে দুনিয়া আখেরাতে জবাবদিহিতার মানদন্ডে উত্তীর্ণ হওয়া এক সুকঠিন বিষয়। মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) সে সুকঠিন মানদন্ডে ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়ে ছিলেন। তিনি আন্দোলনের সকল সাবেক বর্তমান জনশক্তিকে সর্বদা এক চোঁখে দেখতেন। কারো প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ কিংবা আঞ্চলিকতার প্রতিযোগীতা থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্নতর। আমরা অনেক সময় ময়দান পরিচালনা করতে গিয়ে সকল জনশক্তির প্রতি আচরণের সমতা, আন্তরিকতা, ভালোবাসার সমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনা। আমরা অনেক ক্ষেত্রে ময়দানের সাবেক দায়িত্বশীলদেরকে উপেক্ষা করে চলি। তিনি প্রায়শই বলতেন, আমাদের আন্দোলন দাঁড়িয়ে আছে সেই সব সাবেকদের পদচারণায় যাদের শ্রম, ঘাম ও ত্যাগের উপর আমাদের আন্দোলনের মজবুত ভিত্তি তৈরী হয়েছে। কিন্তু তিক্ত বাস্তবতা হচ্ছে আমরা সেইসব বিষয়কে হুবহু অনুসরণ করতে পারিনা। মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) এর জীবন থেকে আমাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হতে পারে সকল জনশক্তিকে যথাযথ আমানত হিসেবে ব্যবহার নিশ্চিত করা। যেমন বানিয়ে জামায়াত সাইয়্যেদ

আবুল আ'লা মওদুদী (রহ.) এর ব্যাপারে মরহুম আব্বাস আলী খাঁন (রহ.) ও মরহুম অধ্যাপক গোলাম আযম (রহ.) দু'জনের মনের গোপন অবস্থা ছিল বানিয়ে জামায়াত তাকেই বেশী ভালবাসেন। খাঁন সাহেব মনে করতেন পূর্ব পাকিস্তানে বানিয়ে জামায়াত সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন তাকে। অপরদিকে প্রফেসর সাহেব মনে করতেন তাঁকেই সবচেয়ে ভালবাসতেন। বাস্তবে উনারা পরে মনের গোপন কথা প্রকাশ করে দেখলেন, এ জাতীয় মনের বাসনায় মাওলানা আবদুর রহীম (রহ.), মাওলানা আবদুল খালেক (রহ.) সহ সবার চিন্তা চেতনা এক। তখন সবাই মনের অজান্তেই বুঝলেন আসলে বানিয়ে জামায়াত সকল জনশক্তিকে সমানভাবে সর্বোচ্চ ভালবাসতেন। যাতে সবার ধারণা আশ্চর্যজনকভাবে এক ছিল। এটি ছিল আমাদের জন্য সুমহান শিক্ষা। মরহুম মকবুল আহমাদও (রহ.) হুবহু এমন চরিত্রের মানুষ ছিলেন।

সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের আমানত :

মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ.

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! জেনে বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না, নিজেদের আমানতসমূহের খেয়ানত করো না। (সূরা আনফাল- ২৭)।

মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) দ্বীনি আন্দোলনের প্রতিটি সম্পদের যথাযথ ব্যবহারে আমানদারীতার পরিচয় দিতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। আন্দোলনের প্রতিটি সম্পত্তিকে তিনি গণিমত মনে করতেন। তিনি দীর্ঘ প্রায় চার দশকের বেশি সময় আন্দোলনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বে আসীন ছিলেন। রাজধানীতে বসবাসকালে রাজধানীর অভ্যন্তরে কেন্দ্রের নির্ধারিত প্রাইভেট গাড়ি ব্যবহারের সুযোগ থাকলেও তিনি অধিকাংশ সময় সাধারণ সিএনজিতে চলাচল করতেন। প্রাইভেট গাড়ি ব্যবহার করতেন না। পরবর্তীকালে নিজের ছেলে গাড়ী কিনলে সেই গাড়িতে করে অনেক সময় সাংগঠনিক কাজ করতেন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক প্রয়োজনে আন্দোলনের গাড়ী ব্যবহার করা সেতো অনেক দুরুহ ব্যাপার। সবসময় এমন ঘটেছে যে, তিনি ফেনীতে সাংগঠনিক সফরে আসলে যদি বাড়ীতে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করতেন ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ খরচ বহন করতেন। কখনো সংগঠনের গাড়ীর এক পয়সার তেল তিনি ব্যবহার করতেন না। শুধু তাই নয় ক্ষুদ্র একটি পাঁচ টাকার কলমও তিনি সংগঠন ও ব্যক্তির প্রয়োজনে আলাদা আলাদা ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। অতি ক্ষুদ্র কাগজের টুকরো ব্যবহারেও তিনি বাছ-বিচার করতেন। কোন

কাগজের টুকরাটি সংগঠনের প্রয়োজনে ব্যবহার করলে সেটি আর ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতেন না। এরকম অনন্য অসাধারণ চরিত্রের মানুষ ছিলেন তিনি। উনার জীবন থেকে অসংখ্য শিক্ষার মাঝে একটি শিক্ষা গ্রহণ আমাদের সর্বক্ষেত্রে করা উচিত। তা হলো সংগঠনের সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা। অন্যথায় জনাব মকবুল আহমাদ দুনিয়া আখেরাতে সফলতার মানদন্ডে উত্তীর্ণ হবেন ঠিকই আমরা ব্যর্থ হয়ে যাবো।

খাদ্যাভ্যাস ও পানাহারে পরিমিতবোধ :

খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান হলো-

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

অর্থ: "আর খাও ও পান করো কিন্তু সীমা অতিক্রম করে যেয়ো না, আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আরাফ-৩১)

এ আয়াতের হুকুম শতভাগ মেনে চলতেন মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.)। তিনি খাদ্য গ্রহণে ছিলেন খুবই পরিমিতিবোধ সম্পন্ন। যেটুকু নাহলে নয় ততটুকুই গ্রহণ করতেন। সাংগঠনিক প্রোগ্রামাদিতে আরো কঠিন ছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রং চা আর টোস্ট বিস্কুট দিয়ে প্রোগ্রাম চালিয়ে নিতেন। বিলাশ বহুল খাওয়া দাওয়া তিনি গ্রহণতো করতেনই না বরং অপছন্দ করতেন। আমরা আমাদের চলমান ময়দানে খাদ্যাভ্যাসের বিষয়টি খুবই সুনিপুণভাবে মেনে চলা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- বর্তমান আমীরে জামায়াত মুহতারাম ডা. শফিকুর রহমান সাহেব যখন ফেনী সফরে এসেছিলেন তখন দুপুরে খাদ্য গ্রহণের সময় কোন প্রকার বিলাসিতাপূর্ণ খাবার গ্রহণ না করে শুধুমাত্র সালাদ খেয়ে বিদায় নিয়েছেন। ভাবা যায়! এ আন্দোলনের রাহবাররা কতটা পরিমিতিবোধ সম্পন্ন জীবন পরিচালনা করেন। আমাদের বাস্তব সাংগঠনিক ময়দানে এ ক্ষুদ্র বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরী।

কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে ব্যবহার :

রাসুল (সা.) বলেছেন-

إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ.

অর্থ: তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা খাওয়াবে এবং তোমরা

যেমন পোশাক পরবে তাদেরকে তা পরাবে। তোমরা তাদের উপর এমন কোন কাজের ভার চাপিয়ে দিবে না, যা করতে তারা হিমশিম খেয়ে যায়। যদি তোমরা তাদেরকে কোন কাজের ভার চাপিয়ে দাও, তাহলে এ কাজে তাদের সাহায্যও করো। (মুসলিম শরীফ- ৪২০৫)

মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) জীবনে কখনো অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে রূঢ় আচরণ কিংবা 'তুই' সম্বোধন করেছেন অথবা একবারের জন্যও রুক্ষ মেজাজ দেখিয়েছিলেন এমন কোন প্রমাণ যাওয়া না। তিনি বায়োজ্যেষ্ঠ কর্মচারীদেরকে আপনি বলে সম্বোধন করতেন। বয়োকনিষ্ঠদের সাধারণত শান্তস্বরে নাম ধরে তুমি বলে সম্বোধন করতেন। কর্মচারীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক খোঁজ-খবর নিতেন। তাদেরকে সাধ্যের বাহিরে কোন কাজ চাপিয়ে দিতেননা। এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় বর্ণনা করা যায়। সাবেক আমীরে জামায়াত প্রফেসর গোলাম আযম (রহ.) এর একজন ব্যক্তিগত খাদেম ছিলেন নাম 'আতাউর রহমান'। একবার খাদেম জরাক্রান্ত হলে মরহুম প্রফেসর সাহেব নিজ হাতে তার মাথায় পানি ঢেলেছেন। এমনকি তার কাপড় চোপড়ও ধৌত করে দিয়েছিলেন। এমন নজির তাঁর অনবধ্য সৃষ্টি আত্মজীবনী গ্রন্থ "জীবনে যা দেখলাম" এ সন্নিবেশিত আছে। এই ঘটনাগুলোতো আমাদের পথ চলার পাথেয়। অনুপম দিক নির্দেশনা আমাদের জন্য। অধ:স্তনের প্রতি আচার আচরণের উত্তরাধিকার।

এভাবে যদি প্রতিটি বিষয়ে আলাদা আলাদা পয়েন্টভিত্তিক বর্ণনা করা যায় তাহলে ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) তার উদারতা, আদর্শের ব্যাপারে আপোষহীনতা, চরিত্রের নিষ্কলুষতা, সাংগঠনিক শৃংখলা বিধানের যোগ্যতাসহ সব বিষয়ে আমাদের জন্য এক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। মহান রাব্বে কায়েনাত যেন আমাদের রাহবারকে জান্নাতে সর্বোচ্চ মাকামে আসীন করেন। আমাদেরকে যেন তাঁর দেখানো পথে পরিচালিত করেন। আমীন।

লেখক : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ফেনী জেলার সেক্রেটারী ও কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য।

মরহুম মকবুল আহমাদ
একটি প্রেরণাময় জীবনের অবসান

মাওলানা আবদুল মালেক

তিনি সংগঠনের জনশক্তিকে স্বার্থপরতা, সংকির্ণমনতা, মানবিক দুর্বলতা এবং মেজাজের ভারসাম্যহীনতা ঝেড়ে মুছে উদারতা, সাহসিকতা আন্তরিকতা সম্পন্ন জনশক্তি রূপে গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ দিতেন। প্রেরণা যোগাতেন।

মকবুল আহমাদ একটি প্রেরণার নাম। যাকে প্রথম দেখেছিলাম ১৯৮৪ সালে। আর শেষ দেখেছিলাম ২০২১ সালে। প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ফেনী পাঁচগাছিয়া রোডস্থ হায়দার বিল্ডিং এ ফেনী মহকুমা জামায়াত অফিসে। সেখানে পারস্পরিক পরিচিত হলাম। একসাথে বসে নাস্তা করাকালে অনেক কথা হল, যার ভিত্তিতে সেদিনই বুঝতে পারলাম তিনি একজন সহজ, সরল এবং সাদা মনের মানুষ। সেদিন যে ভক্তি, শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা, আস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তার বাস্তব প্রমাণ পেলাম পরবর্তী দিনগুলোতে। আর শেষ সাক্ষাত হয়েছিল ২০২১ সালের ১২ এপ্রিল ঢাকা শ্যামলী ইবনে সিনা হাসপাতালে। মৃত্যু বরণের আগের দিন দেখতে গিয়েছিলাম হাসপাতালের আই.সি.ইউ কেবিনে। কিছুই বললেন না, কিছুই বলতে পারলেন না। ফেনী জেলা আমীরসহ উনার বেডের পাশে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে মহান মালিকের দরবারে শুধু বলেছিলাম,'প্রভূ হে! তুমি তোমার বান্দাহকে দুনিয়াতে সন্মানিত করেছো। পরকালেও তাঁকে তুমি সন্মানিত মেহমান হিসেবে কবুল করিও।'

ব্যক্তিগত জীবন :

ব্যক্তি মকবুল আহমাদ সাহেবকে দেখেছি- তিনি ছিলেন নির্মল মনের অধিকারী। খুব সহজ সরলভাবে জীবন যাপন করতেন। সহজ সরলভাবে কথা বলতেন। সময়ের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই কঠোর। একবার উনিসহ

এশার নামাজের পর রাত ৮.৩০ মিনিটে আমাদের একটা বৈঠক ছিল। রাত ৮.৪৫ মিনিট দু'একজন ছাড়াই বৈঠক শুরু হয়ে গেল। পরদিন সকাল ৭.০০ মি: আরেকটি বৈঠক হওয়ার কথা। মরহুম মোস্তফা ভাই বৈঠকের সভাপতি। পৌণে আটটা পর্যন্ত সবাই হাজির হলে তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে মোস্তফা ভাইকে আঞ্চলিক ভাষায় বললেন, "তোমাদের প্রোগ্রাম এরকম হিছল হিছল ক্যা?" সময়ের ব্যাপারে তোমাদেরকে আরও কঠোর হতে হবে।

মকবুল সাহেব সফরে এলে দেখতাম ছোট একটা পলিথিনে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ, আমার দেখার আগ্রহ দেখে উনি আমাকে দেখালেন, আর আমি দেখলাম ঐ ব্যাগের ভিতর ছোট একটা কেঁচি, ব্লেড, স্টাফলার, সুঁই-সুতা, বুতাম, মোমবাতি, ম্যাচ, দাঁতের খিলাল ইত্যাদি। জানতে চাইলাম এত ছোট খাটো জিনিষ নিয়ে চলতে হবে কেন? তিনি বললেন, কোন জিনিষ যখন দরকার হয় তখন কারও কাছে চেয়ে ব্যবহারের চাইতে নিজের জিনিস নিজের কাজে ব্যবহার করাইতো ভাল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সু-সম্পর্ক রেখে চলতেন। সিন্দুরপুর ইউনিয়নের রঘুনাথপুরে উনার ভগ্নিপতি গোফরান মিয়া (মাইজ্জামিয়া) মকবুল সাহেব উনার বাড়ীতে খাবেন শুনলেই বাজার থেকে খাসি ছাগল কিনে ফেলতেন। নিজ পুকুর থেকে বড় রুই, কাতল তুলে পাক করতেন। খেতে বসলে অবাক হতাম। এ সাধারণ মেহমানদারির জন্য এত বড় আয়োজন। একবার মাইজ্জা মিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এতবড় আয়োজন কেন? উত্তরে বললেন এটাই আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। আমার আব্বাও এরকম করতেন। ১৯৮৫ সালে একবার মোটবী বাজার মসজিদে এক শববেদারী অনুষ্ঠান ছিল। শববেদারী শেষ করে সকাল বেলায় আরও কিছু সাংগঠনিক কাজ সেরে সকাল ৯ টার দিকে আমি এবং মকবুল সাহেব রিক্সায় করে যখন ফেনী ফিরছিলাম। গোহাড়ুয়া পৌছলে রাস্তার কয়েক ফুট দূরে থেকে আমাদেরকে চিহ্নিত করলেন এক ব্যক্তি। অবশেষে বিকট একটা আওয়াজ দিয়ে হাতে ধান কাটার একটা বড় 'কাছি'নিয়ে আমাদের দিকে তেড়ে আসতে দেখে আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম। এবং ভাবলাম আজ বুঝি শেষ। রিক্সার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো আপনি মকবুল সাহেব না? মকবুল সাহেব বললেন হ্যাঁ। লোকটি বলল আমি গোহাড়ুয়ার অজি উল্যাহ এবং বললেন-আমি খবর পেয়েছি মুক্তি বাহিনীরা আপনাকে মেরে ফেলেছে এবং মকবুল সাহেবকে ধরে আবেগে কেঁদেই ফেললেন। বায়না ধরলেন তার বাড়ীতে যেতে হবে। মকবুল সাহেবও উনার আবেগের কাছে পরাজিত হলেন। রিক্সা রাস্তায় রেখে রিক্সাওয়ালাসহ আমরা কাঁচা রাস্তায় হেঁটে উনার ঘরে গেলাম। আমাদের নাস্তা দিলেন এবং তিন জনকে তিন গ্লাস গরম দুধ খাওয়ালেন। ঘরে বসেই '৭১ সালের আরও কিছু ভাইদের নাম ধরে উনারা দু'জন আলোচনা করলেন। সে এক আবেগঘন কান্নার পরিবেশ সৃষ্টি হল আমিও কান্না ধরে রাখতে পারিনি। সে ছিল আমার

জীবনের স্মরণীয়ক্ষণ। আরেকবার মধুয়াই নাদেরুজ্জামান সাহেবের দোকানে (নাদু মৌলভী দোকান) নাদু মৌলভীর এবং মকবুল সাহেব বসে ৭১ এর ভাইদের কথা, শহীদদের কথা স্মরণ করতেই যে আবেগঘন পরিবেশ তৈরী হল তাও জীবনকে কাঁদায়।

সংগঠন গুছানোই যার মূল কাজঃ

আমার যতদুর মনে পড়ে মকবুল সাহেবই ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রথম সাংগঠনিক সেক্রেটারী। আর সংগঠনই ছিল উনার জীবনের মিশন। তাই তো সাংগঠনিক টিসি, টিএস এ উনার আলোচনার বিষয় থাকতো সাংগঠনিক বিষয়ে। আর এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উনি খবর নিতেন জনশক্তির মান সম্পর্কে এবং তারই আলোকে পরামর্শ দিতেন, বক্তব্য রাখতেন। তিনি খবর নিতেন তাফহীমুল কোরআন পুরো সেট কার কার কাছে আছে। ৩০০/২০০ ইসলামী সাহিত্য কার কার কাছে আছে। তিনি খবর নিতেন সকল উপজিলায় সংগঠন আছে কিনা? ইউনিয়নে ওয়ার্ডে সংগঠন আছে কিনা? তার আলোকে পরামর্শ দিতেন। তিনি খবর নিতেন কার কার বিবি রুকন হয়েছেন। বালেগ হওয়ার শর্তে কার কার ছেলে মেয়ে ছাত্রশিবির এবং ছাত্রী সংস্থার সাথে আছে। দৈনিক সংগ্রাম, সোনার বাংলা নিয়মিত রাখেন কে কে? নিয়মিত পড়েন কে কে? দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী অনুশাসনগুলোও পালন করার খোঁজ খবর নিতেন।

সংগঠনের গতি প্রকৃতি ও নীতি আদর্শের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সজাগ, সচেতন এবং আপোষহীন। একবার আমরা কেন্দ্রীয় টিসিতে অবস্থান করছিলাম। তার আলোচনার পালা। আলোচনাকালে তিনি বললেন- আজই খবর পেলাম দৈনিক সংগ্রাম অফিসের গেইটে দোকানে বিক্রি হচ্ছে "রুকন হবার সহজ উপায়" নামক একখানা বই। এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন- সহজ উপায়ে কেন? স্বাভাবিক উপায়ে রুকন হতে হবে। রুকন হবার শর্টকার্ট কোন পথ নেই। অবশ্য বইটি তাৎক্ষণিকভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। না হয় একদিন হয়তো জানা যাবে "আমীর হবার সহজ উপায়" বই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। একথা শুনে টিসিতে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। "শৃংখলা ও পরিপাটি" একটি বিষয়ে তিনি টিসি, টিএস এ প্রায়ই আলোচনা করতেন। এ আলোচনায় তিনি জনশক্তির সামনে ব্যক্তিগত পড়ার টেবিলের বইপত্র, খাতা কলম গোছানো, ডাইনিং টেবিলের বাসন কোসন গোছানো, পরিপাটি জীবন, পারিবারিক পরিসর থেকে শুরু করে বৃহত্তর সামাজিক পরিসর এবং রাজনৈতিক পরিসরের এক আদর্শিক, যৌক্তিক ও আকর্ষণীয় চিত্র তুলে ধরতেন যা উপস্থিত সকলকে বিমোহিত করত। সাংগঠনিক ভাবে তাঁর জানাশুনার বাইরে কারোর সাথে সাক্ষাৎ হলে জানতে চাইতেন রুকন হয়েছেন কিনা? অথবা কোন দায়িত্ব পালন করেন কিনা? অথবা কোন ইউনিটে বসেন কিনা?

নির্বাচনে প্রার্থী :

জনাব মকবুল আহমাদ বাংলাদেশ আমলে ১৯৮৬, ১৯৯১ দুই নির্বাচনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। নমিনেশন পেপার দাখিলের আগে পরে মিলিয়ে আসন পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন মরহুম মোস্তফা ভাই, সামছুদ্দীন ভাই এবং আমি। আমি জীবনে বহু চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, মেয়র, এমপি প্রার্থীর সরাসরি পরিচালক বা পরিচালনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ হয়েছে। নির্বাচন পরিচালকের যায়গা থেকে বলছি মকবুল সাহেবের মত আনুগত্যশীল প্রার্থী আমি একজনও পাইনি, দেখিনি। প্রায় প্রার্থীদেরকে দেখেছি প্রার্থী নিজে নির্বাচন পরিচালক বা নির্বাচন পরিচালনা কমিটি নিয়ন্ত্রণ করেন। যা মোটেও ঠিক নয়। প্রার্থী নির্বাচন পরিচালকের নির্দেশ মত চলবেন এটাই চূড়ান্ত কথা। হাঁ, প্রার্থীর নিজের কিছু চিন্তা থাকে, মাঠে-ময়দানের কিছু সমস্যা, কিছু বাস্তবসম্মত প্রস্তাব প্রার্থীর নিকট আসে। ক্ষেত্র বিশেষে কিছু জটিলতা আসে, এসব কিছু পরিচালকের সাথে সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এতে করে ফলাফল যাই হোকনা কেন, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে ইনশা-আল্লাহ।

১৯৮৬ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সংগঠন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্রীয় নেতা যাদেরকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে, তারা প্রতি মাসে নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় এক সপ্তাহ করে সময় দিবেন। যথারীতি মকবুল সাহেবও এলাকায় সময় দেয়া শুরু করলেন। আমরা তার জন্য এক সপ্তাহের কর্মসূচী তৈরী করে রাখতাম। পরের মাসে ঢাকা থেকে এসে মকবুল সাহেব জানতে চাইতেন, এ সপ্তাহের কি কি কাজ, কর্মসূচী দিন। দিলে বাস্তবায়ন শুরু করতেন। এরই মাঝে উনার কোন ভক্ত বা আত্মীয় উনাকে বিয়ের দাওয়াত বা খাওয়ার দাওয়াত অনুষ্ঠানে যোগদানের দাওয়াত দিলে উনি বলতেন আমি শুনলাম, 'আপনি পরিচালক অমুকের সাথে যোগাযোগ করুন বা আমি যোগাযোগ করে জানাব।' এ ভাবেই তিনি শৃংখলা মেনে, আনুগত্য করে চলতেন। আমি মনে করি আমাদের মধ্যে যারা নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন বা হবেন, তাদের সকলকে নির্বাচন পরিচালকের আনুগত্য করে চলা উচিত। নির্বাচনী সভা বা সমাবেশ গুলোতে তিনি যে বক্তব্য রাখতেন তার ভাব ও ভাষা এরকম- তিনি বলতেন- "ভোট একটি আমানত, তার সঠিক ব্যবহার বা প্রয়োগই আমানতের সঠিক ব্যবহার। ভোট আমার নৈতিক অধিকার এটি কাউকে কেড়ে নিতে দিব না। ইসলামের পক্ষে আপনার রায় দিন। ন্যায়, ইনসাফ ও কল্যাণ রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে আপনার ভোট দিন। টাকা খেয়ে ভোট বিক্রি করব না। আমরা জাল ভোট দিব না, কাউকে জাল ভোট দিতে দিব না। আমরা ভোট কেন্দ্র দখল করব না, কাউকে ভোট কেন্দ্র দখল, অনিয়ম করতে দিব না। প্রশাসনের প্রতি নিরপেক্ষ থেকে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাতেন।

সাংগঠনিক জীবন :

সাংগঠনিক জীবনে দায়িত্ব পালন করতে করতে আমীরে জামায়াত এর পদেও দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে তাঁকে। জামায়াতের ইতিহাস সাক্ষী নিজ ঠিকানা ছেড়ে আত্মগোপনে থেকে মামলার ঝাঁপি মাথায় নিয়ে গ্রেফতারি পরওয়ানাকে মোকাবেলা করে কঠিন থেকে কঠিনতম সময়ে জামায়াতের সংগঠনকে তার মনজিলের দিকে নিয়ে গেছেন তা বাংলার মানুষের কাছে স্মরণীয় এবং বরণীয় হয়ে থাকবেন। আমি অবাক হতাম এত কঠিন সময়ও তিনি মাঝে মধ্যে আমাকে ফোন করতেন, উনার জানাশুনা লোকদের নাম ধরে ধরে খবর নিতেন। খবর নিতেন জেলা দায়িত্বশীলদের। খবর নিতেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর। খবর জানতে চাইতেন জেলা সংগঠনের কাজের গতি প্রকৃতি, হাল অবস্থা সম্পর্কে। কেন্দ্রিয় রুকন ইউনিট বৈঠকে ব্যক্তিগত রিপোর্ট এবং মান পর্যালোচনার একটা ঘটনা একদিন বলতে গিয়ে বললেন, প্রথম সারির একজন নেতার নাম ধরে বললেন তিনি একদিন বলেছিলেন, বৈঠকে মকবুল সাহেব যেভাবে আমাদের একেবারে ছোট খাটো বিষয়গুলোসহ পোক জোঁক বাছা শুরু করেন, এভাবে চললে কেমনে হবে? উনি বললেন। আমি বললাম আমরা চাইনা আমাদের নেতারা পোক জোঁকসহ খেয়ে বাঁচুক। আমরা চাই আমাদের নেতারা পোক জোঁক বাদ দিয়ে বাঁচুক। অর্থাৎ আমাদের নেতারা সকল দোষমুক্ত জীবনের অধিকারী হোক এটাই আমরা চাই। তাঁর আনুষ্ঠানিক আলোচনায় বা অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতায় বেশীরভাগ সময় জুড়ে থাকত সংগঠনের বিস্তৃতি, সম্প্রসারণ, মজবুতির উপর। সংগঠনের আভ্যন্তরীন পরিবেশ সুন্দর, নির্মল ও হৃদ্যতাপূর্ণ অবস্থার উপর গুরুত্ব দিতেন। টীম স্পিরিট গড়ে তোলার গুরুত্ব দিতেন। আমাদের নেতৃবৃন্দের নৈতিক মান আরও আকর্ষণীয় হয়। কর্মীদের নীতি নৈতিকতা যেন ত্রুটিমুক্ত হয় সে কথা বলতেন। মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামাজের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। একবার আমরা ক'জন আমাদের ম্যাচে মাঝে মধ্যে জামায়াতে নামাজ পড়ার জন্য বিছানা কিনেছিলাম এবং মাঝে মধ্যে জামায়াতে নামাজ পড়তাম। মকবুল সাহেব ঢাকা থেকে আসলে ম্যাচে থাকতেন। আমাদেরকে অনিয়মিতভাবে জামায়াত করতে দেখে আমাদেরকে নিয়ে বসলেন এবং ম্যাচে জামায়াত নিষিদ্ধ করে দিলেন আর বললেন জামায়াতের আয়োজন থাকতে পারে মসজিদের জামায়াত ফেল করলে এখানে জামায়াত হতে পারে সপ্তাহে দু-চার ওয়াক্তের জন্য, এর বেশী নয়। খাবার ঘরে বসেও অনেক সংশোধনী দিতেন যা আজও মনে পড়ে। তিনি সংগঠনের জনশক্তিকে স্বার্থপরতা, সংকির্ণমনতা, মানবিক দুর্বলতা এবং মেজাজের ভারসাম্যহীনতা ঝেড়ে মুছে উদারতা, সাহসিকতা ও আন্তরিকতা সম্পন্ন জনশক্তি রূপে গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ দিতেন। প্রেরণা যোগাতেন।

আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। তিনি কেন্দ্রিয় বডির কোন এক বৈঠকে

এক জ্যেষ্ঠ নেতার রেফারেন্স দিতে গিয়ে বললেন- ঐ নেতার উপর অর্পিত দায়িত্ব পর্যালোচনা হচ্ছিল। অন্যান্যদের উত্থাপিত সমালোচনার জবাবে তিনি বলছিলেন কি আশ্চর্য! আমি ঘরে গেলে গিন্নিসহ ছেলে মেয়েরা বলে আমি সংসারের ব্যাপারে উদাসীন আমি এটা করিনি, ওটা করিনি। অথচ চাকরির অফিসে গেলে বলে আমি নাকি অনিয়মিত। আমি এটা করিনি, সেটা করিনি। আবার সাংগঠনিক বৈঠকে আসলে আপনারা বলেন আমাকে দিয়ে এটা হয়নি, ওটা হয়নি। তাহলে আমার প্রশ্ন আমি সারাটা দিন থাকিটা কোথায়? করিটা কী? একবার আমি ঢাকা গেলাম। অফিসের আলমারির চাবি আমার পকেটে রয়ে গেল। অফিসে একটা নির্ধারিত বৈঠক ছিল উনিও ঐ বৈঠকে থাকার কথা এবং ছিলেনও। আমি বৈঠক শুরুর আধা ঘন্টা পর হাজির হলাম। উনি আমাকে দেখে বললেন গোটা জামায়াতে ইসলামী পকেটে নিয়ে চল কেন? আবার সেটা নিয়ে ঢাকা চলে গেলে। বললেন, অফিসের চাবি কয়েকজনের কাছে থাকতে হবে। এমনিভাবে অনেক টুকিটাকি ঘটনা আজ মনে পড়ে।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট দোয়া করি রাব্বুল আলামীন যেন মকবুল আহমাদের জীবনের সকল নেক আমলগুলো কবুল করেন। তাঁর জীবনের সকল গুনাহ্-খাতাগুলো মাফ করে দেন। তাঁর রেখে যাওয়া এ সংগঠন যেন আল্লাহ কবুল করেন। আন্দোলনের নেতা-কর্মীদেরকে আল্লাহ যেন হেফাজত করেন। এ আন্দোলনের প্রয়োজনে সব সময় যেন সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার তাওফীক দান করেন। দোয়া করি আল্লাহ মকবুল আহমাদকে দুনিয়াতে যেভাবে সম্মানিত করেছেন পরকালেও সেভাবে সম্মানিত মেহমান হিসেবে কবুল করেন এবং জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করেন। আমীন॥

লেখক : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ফেনী জেলার এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী।

দুর্দিনের কাণ্ডারি জননেতা মকবুল আহমাদ

আবদুল ওয়াদুদ সরদার

তিনি জাতীয় দুর্দিনের কাণ্ডারি হিসেবে দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতার ভূমিকা পালন করার নজির স্থাপন করেছেন। বর্তমান সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের সাংবিধানিক অধিকার, সংবাদপত্র ও মিডিয়ার বাকস্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

বাংলার জমিনে ইসলামী আন্দোলনের বর্ষীয়ান জননেতা মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) ৮২ বছর বয়সের কর্মময় জীবন শেষে দা'য়ী ইলাল্লাহর মহান দায়িত্বের পরিসমাপ্তি টেনে এক বর্ণিল জীবনের ইতিহাস রচনা করে আমাদের চলার পথকে শানিত করে গেলেন।

জনাব মকবুল আহমাদ ছিলেন খুবই জনদরদি ও দৃঢ় প্রত্যয়ী নিবেদিতপ্রাণ এক সমাজ কর্মী। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল মানবসেবা ও কর্মের মাধ্যমে দা'য়ী ইলাল্লাহর কাজকে সম্প্রসারিত করে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করা। দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফুটানোই ছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কর্মতালিকার এক বিশাল প্রোফাইল। তাঁর কর্ম ও জীবনচরিত আমাদের জীবনে মূর্তপ্রতীক হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে থাকবে। আমরা তাঁর বর্ণিল কর্মময় জীবনের কর্মস্পৃহা ও সমাজসেবার নিদর্শন দেখে সমাজসেবার মানসের দিকনির্দেশনায় বর্ণিত মহানবী (সা.)-এর হাদীসটি উদ্ধৃত করার প্রয়োজন অনুভব করছি। যে হাদীসের আলোকে তিনি সারাটি জীবন মানবসেবার মাধ্যমে নিজেকে একজন উত্তম দা'য়ী ইলাল্লাহ হিসেবে পেশ করেছেন।

রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয়, যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে।" আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়

নেক আমল হলো– কোনো মুসলিমের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করানো অথবা তার বিপদ, কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা। অথবা তার ঋণ আদায় করে দেয়া অথ বা তার ক্ষুধা দূর করা। আবার কোনো ভাইয়ের কাজে তার সাথে একটু হেঁটে যাওয়া, মসজিদে নববীতে এক মাস ইতিকাফ করার চেয়েও বেশি প্রিয়। যে ব্যক্তি কারো দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ্ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। কেউ নিজের ক্রোধ কার্যকর করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা সংবরণ করবে, কিয়ামতের দিন মহিমাময় আল্লাহ্ তার অন্তরে নিরাপত্তা ও সন্তুষ্টি দিয়ে ভরে দেবেন। যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের সাথে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে, কিয়ামতের কঠিন দিনে যে পুলসিরাতের ওপর সকলের পা পিছলে যাবে, সেদিন আল্লাহ তায়া'লা তাঁর পা সুদৃঢ় রাখবেন। সিরকা যেমন মধু নষ্ট করে দেয়, তেমনিভাবে অসৌজন্যমূলক আচরণ মানুষের নেক কর্ম বিনষ্ট করে দেয়।" (হাইসামী, মাজমাউস যাওয়াইদ ৮/১৯১); আলবানী, সহীহুল জামি-১/৯৭; সহীহুত তারগীব ২/৩৫৯)।

উক্ত হাদীসের আলোকে তাঁর কর্মজীবনের শতভাগ পরিচালনা করতে আমরা দেখেছি মরহুমের জীবন ও চরিত্রে। তাঁর সমাজসেবা ও কর্মময় জীবনে কখনো প্রদর্শনেচ্ছা পরিলক্ষিত হয়নি। নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানবসেবায় ব্রতী হয়ে সমস্ত কর্মকান্ড- পরিচালনা করেছেন। কোনো লোক তাঁর কাছে নিজ প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে এলে তিনি সুন্দর ব্যবহার দ্বারা তাকে অভ্যর্থনা করে ধীরস্থিরভাবে মনোযোগ দিয়ে কথা শুনে তা ডায়েরিতে নোট করতেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে সকল মানুষ বিমোহিত হতো। পরবর্তীতে গুরুত্বের আলোকে তালিকা তৈরি করে ফাইলভুক্ত করে সেসব সমস্যার সমাধান দিতেন। তিনি নিজ উদ্যোগে তাকে আবার ডেকে তার প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণ করে কিছু নসিহত ও দু-একটি ইসলামী সাহিত্য দিয়ে চা-নাস্তার মাধ্যমে বিদায় দিতেন। এটাই ছিল ব্যক্তি মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.)- এর জীবন ও চরিত্র। আমরা তাঁর একজন নগণ্য সহকর্মী হিসেবে চল্লিশ বছর খুব কাছে থেকে দেখেছি। তাঁকে কখনো কারো সঙ্গে খারাপ বা ক্রোধান্বিত হয়ে কথা বলতে দেখিনি। মিষ্টিভাষী, সদালাপী, হাস্যোজ্জ্বল চেহারার এক মূর্তপ্রতীক মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.)। যে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা কবরে শোয়ানোর পরেও আমরা দেখলাম, মুচকি হাসির ঝলক। ছোট-বড় সবার সাথে যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দিতে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। নীতির ব্যাপারে ছিলেন অটল। অন্যায়ের সাথে কখনোই তিনি আপস করতেন না। তাঁর চাল-চলন ওঠাবসা সবই ছিল খুবই সাদামাটা। সহজ-সরল জীবনযাপনে তিনি খুবই অভ্যস্ত ছিলেন। সারাটি জীবন তিনি পরোপকারে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। ধন-সম্পদ, পদমর্যাদার প্রতি কখনো কোনো মোহ আমাদের চোখে পড়েনি। দলমত-নির্বিশেষে সকলের নিকট তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব। সমাজসেবার মানসে গড়ে তোলা তাঁর সামাজিক

প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিদিন বহু মানুষকে বিভিন্নভাবে সেবা প্রদান করে চলেছে।

১৯৭৯-৮৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি তৎকালীন আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম (রহ.)-এর দিকনির্দেশনার আলোকে দেশের সকল জেলা আমীরদের ডেকে ডেকে সফর প্রোগ্রাম নিতে ও দিতে দেখেছি। ফলে তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করে করে সংগঠনের আভ্যন্তরীণ মজবুতি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপনের মাধ্যমে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে জামায়াতকে একটি গতিশীল সংগঠনে উন্নীত করেন।

তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ সংগঠক, যা প্রত্যেক নেতাকর্মীর হৃদয়ে প্রেরণার উৎস হিসেবে আজীবন লালিত হবে। তাঁর মতো এমন সাদামাটা, সদালাপী, সুমিষ্টভাষী, নিরহংকারী, বহু গুনে গুনান্বিত নির্ভিক দা'য়ী ইলাল্লাহ সত্যিই বিরল।

তাঁর এ বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের মাঝেও ব্যক্তিগতভাবে তিনি একজন সুসাহিত্যিকও বটে। তাঁর লিখিত সু-উন্নত নিবন্ধন পড়ার মাধ্যমে অনেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় জেনে তাদের চলার পথকে শানিত করেছে। তাঁর লেখা একখানা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে, যেটি পড়লে একজন পথহারা সাধারণ মানুষ তার জীবন চলার পাথেয় খুঁজে পাবে।

২০১০ সালের জুন মাসে দলের তৎকালীন আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রহ.)সহ শীর্ষনেতৃবৃন্দ গ্রেফতারের পর থেকে মরহুম মকবুল আহমাদ ভারপ্রাপ্ত আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব পালন করে অনন্য নজির স্থাপন করেছেন।

এ সময় দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে জামায়াতে ইসলামীসহ সকল বিরোধী দলের নেতাকর্মীরা আওয়ামী দুঃশাসন ও পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো। সরকারদলীয় দুশ্চরিত্র গুন্ডা বাহিনী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অসৎ সদস্যদের দ্বারা দেশের নিরীহ জনগণ ও বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীরা যখন গুম, খুন, জেল-জুলুম, হামলা-মামলার শিকারসহ বহু মানুষের বাড়িঘর অবৈধভাবে দখল করে নিচ্ছিল, ঠিক এমনই দুর্দিন ও কঠিন মুসিবতের সময়ের কান্ডারি হিসেবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব খুবই দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে পালন করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রায় সাড়ে চার বছর তিনি শুধু একটি কক্ষের মধ্যে অবস্থান করে জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি সুবৃহত্তর সংগঠনের আমীরের দায়িত্ব পালন করা যে কত কঠিন ও দুর্বিষহ, তা বর্ণনা করা অসম্ভব। একটি গৃহের মধ্যে একটানা সাড়ে চার বছর অন্তরীণ থেকে এ মজলুম মানুষটি জামায়াতে

ইসলামীর মতো সংগঠনের আমীরের দায়িত্ব পালন করে যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা যুগ যুগ ধরে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। তিনি জাতীয় দুর্দিনের কান্ডারি হিসেবে দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতর ভূমিকা পালন করার নজির স্থাপন করেছেন। বর্তমান সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের সাংবিধানিক অধিকার, সংবাদপত্র ও মিডিয়ার বাকস্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

২০১৭ সালের ৯ অক্টোবর তৎকালীন আমীরে জামায়াত মকবুল আহমাদ জামায়াতের নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের নিয়ে উত্তরায় তাঁর এক আত্মীয়ের বাসায় মিলিত হন। বিরাজমান পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে ডাকা ওই বৈঠক থেকে আমীরে জামায়াত মকবুল আহমাদসহ নির্বাহী পরিষদের শীর্ষ ৯ নেতাকে বিনা দোষে জুলুমবাজ সরকার গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করে। এ সময় আদালত তাদের বিরুদ্ধে আড়াই মাসেরও অধিক সময় রিমান্ড মঞ্জুর করে। রিমান্ডে আমীরে জামায়াত মকবুল আহমাদ অকুতোভয়, নির্ভীক ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন। কোনো ভয়ভীতি তাঁকে নীতি থেকে চুল পরিমাণও টলাতে পারেনি। তাঁকে বিভিন্ন ভয়ভীতি প্রদর্শনের সময় তিনি দৃঢ়তার সাথে তাদের বলেন, আমাকে ভয়ভীতি দিয়ে কোনো লাভ হবে না। আমাদের নিরপরাধ শীর্ষনেতৃবৃন্দকে যেভাবে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছেন, 'আমাকেও নিয়ে যান, চলেন যাই আমিও যেতে প্রস্তুত।' এটিই ছিল একজন অকুতোভয় নির্ভীক দা'য়ী ইলাল্লাহ ও মর্দে মুজাহিদ মকবুল আহমাদের অভিব্যক্তি।

রিমান্ডে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দীর্ঘ তদন্ত ও চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে যখন বুঝতে সক্ষম হলেন যে, জামায়াতের মতো একটি সুবৃহৎ দলের শীর্ষনেতার কোনো ব্যাংক একাউন্ট নেই! কোনো ব্যাংক-ব্যালেন্স নেই! কোনো আয়কর ফাইল নেই! তখন তারা সত্যিই আশ্চর্যান্বিত হলেন! কীভাবে সম্ভব? এমন একটি মানুষ যার কোনো ব্যাংক একাউন্ট নেই, যার কোনো ব্যাংক-ব্যালেন্স নেই, যার ঢাকা শহরে কোনো বাড়ি নেই। এটিই হলো ইসলামী আন্দোলন ও দা'য়ী ইলাল্লাহর মডেল, যা আমাদের সামনে দৃশ্যমান দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার রয়েছে।

চলমান পরিস্থিতিতে সরকারের এহেন দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সকল ভেদাভেদ ভুলে জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের বিকল্প কোনো পথ নেই।

মকবুল আহমাদ দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিলেন। সরকারের নির্যাতনের শিকার হয়ে দীর্ঘসময়

চিকিৎসাহীন অবস্থায় অজ্ঞাত গৃহাভ্যন্তরে কারারুদ্ধ অবস্থার মতো জীবনযাপন করায় নানাবিধ রোগ তাঁকে জাপটে ধরলে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত ১৩ এপ্রিল মঙ্গলবার তাঁর বর্ণিল কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি টেনে দুপুর ১টায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

জনাব মকবুল আহমাদের মৃত্যু সংবাদ শোনার সাথে সাথে বর্তমান আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান ছুটে যান হাসপাতালে, তার পরিবারের সদস্য ও নেতাকর্মীদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য। তাঁর এ বিয়োগ বেদনায় দেশ-বিদেশে কোটি কোটি নেতাকর্মী ও আমজনতার মাঝে এক শোকের ছায়া নেমে আসে।

করোনার এই লকডাউনে ঢাকায় জানাজা করা সম্ভব হয়নি, তাই অশ্রুসিক্ত হৃদয়ে দোয়া ও মাগফিরাতের জন্য সিজদায় অবনত হয়ে এ দা'য়ী ইলাল্লাহর সকল ক্রটি মাফ করে শহীদি মৃত্যু কামনা করছি। বিভিন্ন মিডিয়া, ভার্চুয়াল ও ওয়েব পেজে দেশ-বিদেশে শোকবাণী পোস্ট করে ভাইরাল হয়েছে।

কফিন ১৪ এপ্রিল রাত সাড়ে দশটায় মরহুমের নিজ গ্রামে পৌঁছায়। এ গভীর রাতেও হাজার হাজার জনতা ও শুভানুধ্যায়ী তাঁকে শেষ বিদায় ও একনজর দেখার জন্য জনভিড় লোকারণ্যে পরিণত হয়।

বর্ষীয়ান এ জননেতার জানাজা (পরের দিন ১৪ এপ্রিল) নামাজে ইমামতি করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বর্তমান আমীর জননেতা ডা. শফিকুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের বর্তমান সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতাকর্মীসহ আমজনতা। আমীরে জামায়াত তাঁর ইমামতিতে যখন আবেগাপ্লুত কণ্ঠে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে জানাজা শুরু করেন, তখন আকাশে-বাতাসে ক্রন্দনের রোল বইতে থাকে। আমীরে জামায়াতের আল্লাহু আকবার ধ্বনির সাথে সাথে মুক্তাদিদের ক্রন্দনের ধ্বনি একাত্তার মাধ্যমে তরঙ্গিত হতে হতে আসমানে ভেসে যায়, যা এখনো আমাদের কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সেই ক্রন্দন আর আবেগঘন পরিবেশ সত্যিই বিরল। করোনার এ লকডাউনের কারণে যারা এ জানাজায় উপস্থিত হতে পারেনি, তারা সত্যিই এ আবেগঘন পরিবেশ হতে বঞ্চিত ও মাহরুম হয়েছেন।

বর্তমান আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান তাঁর পূর্ব আমীর মকবুল আহমাদ (রহ.)-এর কবরে নিজে নেমে মরহুমের পুত্র ও ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে নিজ হাতে সমাহিত করে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে এক বিরল নজির স্থাপন করেন। এটি যুগ যুগান্তরে ইতিহাসের পাতায়

চিহ্নিত করে তাঁর উত্তরসূরিদের জন্য অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

আমাদের প্রাণপ্রিয় সাবেক আমীরে জামায়াত মকবুল আহমাদ (রহ.)-এর জীবন ও চরিত্র সত্যিই বড় অনন্য। তাঁর বর্ণিল এ সুমহান চরিত্র ও আদর্শ আমাদের জন্য উত্তম দিক নির্দেশক হিসেবে উদ্ভাসিত হয়ে থাকবে।

পরিশেষে বলতে চাই- আসুন, আমরা সকলে মিলে সাবেক আমীরে জামায়াত মরহুম মকবুল আহমাদের জীবনচরিতের আদলে আমাদের জীবন গড়ে তুলি। তাঁর রেখে যাওয়া সমাজসেবার মাধ্যমে দা'য়ী ইলাল্লাহর কাজকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠার মানসে নিজেকে তৈরি করি এবং সেই অনুযায়ী জীবন গড়ি। আর এর বিনিময় আমরা লাভ করি জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম জান্নাতুল ফেরদাউস। আমীন।

লেখক : সাংবাদিক।

তাঁর বিকল্প তিনি নিজেই

মরহুম মকবুল আহমাদ যা করে গেছেন, তার আলোচনার চাইতে আমাদের ব্যক্তি জীবনে তা কার্যকর করা উচিত। এই উদ্যোক্তা নিজের জন্য কিছু না করে সমাজের জন্য করে গেছেন। নিজে অল্পে তুষ্ট থেকে অপরকে সন্তুষ্ট করতে পছন্দ করতেন বেশি। নিজের জানামতে আমানতের খিয়ানত করেননি কখনো। মিথ্যার ধারে কাছেও যেতেন না তিনি।

দিদারুল আলম মজুমদার

মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) ছিলেন একজন মানবিক উদ্যোক্তা। তার রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ফেনীর গণমানুষের দলমত নির্বিশেষে অবিসংবাদিত নেতা। পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অংগনের শীর্ষ নেতা। তবে উনার জীবনে দুনিয়ামূখী কোন চরিত্র না থাকাতে আলোচনা ছাড়া সমালোচনা ছিলোনা কখনো। রাজনীতিতে ঘোরতর বিরোধী ফেনীর সাবেক এমপি জয়নাল হাজারীও উনার মৃত্যুর পর বিশেষ লাইভ করে উনার পক্ষে কথা বলেছেন।

বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতিতেও আমরা দেখেছি যে, গঠনমূলক কোন কাজের নিউজ পত্রিকায় স্থান পায়নি কখনো। একবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকগণ বললেন, আপনারা কমপক্ষে ভিসি অফিসের ফুলের টব হলেও ভেঙ্গে দিন, তাহলে আমরা বড় নিউজ করতে পারবো। ঠিক তদ্রুপ মকবুল সাহেবের বক্তব্যে কখনো উস্কানি ছিলোনা বিধায় নিউজ কম হতো।

আমরাও উনাকে উনার মৃত্যুর পর যেভাবে বুঝতেছি, সেভাবে জীবিত থাকতে বুঝতে পারিনি। আঞ্চলিক ভাষার কিছু প্রভাব ছিলো উনার বক্তব্যে। তাই ফেনীর ট্রাংক রোড়ে এক জনসভার বক্তব্যে আমাদের ছোট বেলায় দেখেছি কেউ কেউ উনার কথা নিয়ে মজা করতে। পরবর্তীতে ঢাকার প্রেসক্লাবের কোন এক মিটিংয়ে আঞ্চলিক ভাষায় বক্তব্য দেয়াতে উপস্থিত লোকজনের মধ্যেও তা দেখেছি।

উনি ঢাকাস্থ ফেনীবাসীদের সামাজিক সংগঠন, ফেনী ফোরাম ঢাকার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। উনার নির্দেশনায় চলেছিলো এই সংগঠনটি। গত তেইশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এই ফোরামের শুরুতে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার রূপকার মরহুম মোহাম্মদ ইউনূস।

বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমান ছিলেন এই ফোরামের সভাপতি। এরপর মানারাত ইউনিভার্সিটির ডীন প্রফেসর ড. সিরাজ উদ্দৌলা শাহীনের মত জাঁদরেল ব্যক্তিরা সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন এই ফোরামের। এই যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচনে মরহুম মকবুল আহমাদের বিচক্ষণতা প্রকাশ পেয়েছে।

এছাড়াও একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে মরহুম মকবুল আহমাদের উদ্যোগে ঢাকা, ফেনী এবং দেশব্যাপী অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভ করে সুনামের সাথে চলছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কৃর্তিমান ছাত্র-ছাত্রীরা দেশের বিভিন্ন পদবীতে অধিষ্ঠিত হয়ে দেশ ও জনগণের তরে ভালো সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন।

মরহুম মকবুল আহমাদ যা করে গেছেন, তার আলোচনার চাইতে আমাদের ব্যক্তি জীবনে তা কার্যকর করা উচিত। এই উদ্যোক্তা নিজের জন্য কিছু না করে সমাজের জন্য করে গেছেন। নিজে অল্পে তুষ্ট থেকে অপরকে সন্তুষ্ট করতে পছন্দ করতেন বেশি। নিজের জানামতে আমানতের খিয়ানত করেননি কখনো। মিথ্যার ধারে কাছেও যেতেন না তিনি।

তাই তাঁর বিষয়ে আদালতের টীমের কাছেও ভালো মানুষ বলে উনার দর্শনের বিপক্ষ সকলে স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। তবে এই ভালো মানুষটি ফেনীর দুই আসনে পরপর দুইবার প্রার্থী হয়েও অল্পের জন্য হেরে গিয়েছিলেন। এতে কি প্রমাণিত হয় যে, ভালো মানুষদের ভোট পেতে নেই বা তারা সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনায় যোগ্য না। একদিন ফেনীর ভূঁইয়া সাইকেল মার্টের ভূঁইয়া সাহেব বললেন, মকবুল সাহেবের মত ১০ জন মানুষের হাতে দেশের দায়িত্ব থাকলে দেশ স্বর্ণে পরিণত হয়ে যেতো। আমি বললাম তা কিভাবে সম্ভব। উনি বললেন, এই লোক মেহমানদারির খাতিরেও এককাপ চা খাবে না, যদি

তিনি চা একটু আগে খেয়ে থাকেন। আমাদের দেশ ও জনগণ তা কি কখনো চিন্তা করবে?

দাওয়াতে দ্বীন বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ছাত্র ইসলামী আন্দোলন কেন্দ্রের এক মিটিংয়ে শহীদ কামারুজ্জামান আমাদেরকে পরামর্শ দিলেন, তোমরা মকবুল আহমাদ সাহেবকে মেহমান করো। কারণ সম-সাময়িক সময়ে উনার মত দাওয়াতী চরিত্রের আর কারো তুলনা হয় না। মকবুল স্যারের সান্নিধ্যে গেলে দেখতাম পুরাতন বছরের ব্যবহৃত ডায়রীগুলো খুঁজে খুঁজে পুরাতন লোকদের হ্যালো করে খোঁজ নিতে।

আমি কয়েকটি ব্যবসায় বা কোম্পানীতে কেন যুক্ত হলাম, কোন সমস্যা হলো কিনা? এসব খোঁজ নিয়ে পরামর্শ দিতে দেরী করতেন না তিনি। যখন শুনতেন একটি আরেকটির সহযোগী, তখন খুশি হয়ে যেতেন।

আমার বাবা টেলিফোন বোর্ডে চাকুরি করতেন সুবাধে মকবুল সাহেবের সাথে ভালো পরিচয় এবং সম্পর্ক ছিলো। সেই সুবাধে মকবুল সাহেবের কথা উঠলেই বাবা বলতেন, ‘দুনিয়াতে কোন জান্নাতি লোক দেখতে চাইলে উনাকেই দেখতে হবে।’ বাবা বলতেন, ‘ফেনীর ট্রাংক রোড দিয়ে সেন্ট্রাল স্কুলে যেতে মকবুল সাহেবকে আমরা দেখতাম গাড়ীর চাকার টায়ার কাটা সেন্ডেল পরে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন। নির্লোভ এক মানুষ তিনি।’

এভাবে অনেক স্মৃতিময় পুরুষটি আজকে আমাদের রেখে চলে গেলেন আল্লাহর সান্নিধ্যে। মহান আল্লাহ মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানিয়ে নিন।

লেখক: শিল্প উদ্যোক্তা ও সদস্য, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক নয়াদেশ।

স্মৃতিতে মরহুম মকবুল আহমাদ

হে আল্লাহ! মরহুম মকবুল আহমাদ স্যারকে দুনিয়াতে যেভাবে ভালোবেসেছিলে, মৃত্যুর পর তাঁর আত্মাকে ইল্লিয়্যিনে স্থান করে দিও এবং কাল হাশরে মহা মুসিবতের দিন আরশের নিচে ছায়া দিও এবং জান্নাতে সর্বোচ্চ সম্মান দান করিও।

এম. একরামুল হক ভূঞা

একটি ফুটন্ত গোলাপের সৌরভ গ্রহণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল দ্বীনপ্রিয় ফেনীবাসী। ১৩ এপ্রিল ২০২১ইং পাওয়ারফুল একটি নক্ষত্র ঝরে গেলো। সেদিন রোজ মঙ্গলবার, দুপুর ১.৩০ কাঁদিয়ে গেলেন ভালবাসার মানুষদেরকে, হারিয়েছে ভালোবাসার মানুষগুলো প্রিয় মানুষটিকে, যার নাম মরহুম মকবুল আহমাদ। দুনিয়ার জমিনে তার সাক্ষাৎ আর মিলবে না। মহান রবের নিকট ফরিয়াদ, শেষ বিচারের দিন আমাদের সাথে প্রিয় মানুষটির সাক্ষাতসহ পুন:মিলন ঘটিয়ে দিও।

পড়ালেখার গন্ডি পেরিয়ে শিক্ষকতাকেই মহান পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। মোমবাতির মত আলো জ্বালিয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। তিনি দ্বীনকে জীবন উদ্দেশ্য হিসেবে বেছে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর সততার একটি কথা না লিখলে স্মৃতিচারণ যেন অপূর্ণাঙ্গই থেকেই যাবে। তাই লিখতে হলো মরহুম মকবুল আহমাদ স্যারের সাথে চলার পথের একটি ঘটনা। তিনি ছিলেন ফেনী ইসলামিক সোসাইটির জন্ম থেকে চেয়ারম্যান। আমি ফেনীতে এসেও স্যারকে চেয়ারম্যান হিসেবে পেয়েছি। যার কারণে স্যারের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল নিবিড়।

২০০৮ সালে একদা তাঁর মগবাজার অফিসে গেলে আপ্যায়ন পর্ব সেরে আমার নিকট থেকে ফেনীর অনেকের খবর নিলেন। তারপর অফিসিয়াল প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে আমি ফেনীতে আসার জন্য বিদায় নিলাম। আসার

সময় আমার Econo কলমটি স্যারের টেবিলে রেখে চলে এসেছি। আমি ফেনীতে পৌঁছার কিছুদিন পরে অর্থাৎ ১৯/০১/২০০৯ ইং আমার রেখে আসা দুই টাকা মূল্যের Econo কলমটি কাগজ পেছিয়ে স্যারের এক আত্মীয়ের মাধ্যমে আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সাথে "কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ" আবদুস শহীদ নাসিম এর লেখা বইটি আমাকে এবং আমার সহধর্মীনিকে, 'দোয়াপ্রার্থী' কথাটি লিখে স্বাক্ষর দিয়ে দিলেন। যথাসময় তা আমার হস্তগত হলো। হাতে পেয়ে আমি চিন্তা করলাম- এত ব্যবস্তার মধ্যেও তিনি দুই টাকা মূল্যের কলমটি কলমের মালিকের নিকট পাঠানো জরুরী মনে করলেন এবং তাতে সক্ষম হলেন। কি পরিমাণ আমানতদার এবং কত বেশি সচেতন হলে এ ধরনের কাজ করা যায়! অনেক বেশি ধী-শক্তি ছাড়া এ ধরনের কাজ করা একেবারে অসম্ভব।

জন দরদী মরহুম মকবুল আহমাদ স্যারের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে একটি ঈদ পূণর্মিলনী অনুষ্ঠানে শান্তি রোডের এক জীর্ণ কুঠিরে। ১৯৯৫ সালে রমজান ঈদের পরদিন, জনাব মাওলানা বদরুদ্দোজা সাহেব বা জনাব অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূঁঞা সাহেব দু'জনের একজন আমাকে স্যারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

সকলে বসে নাস্তা খাওয়ার পালা, খেতে বসে মরহুম মকবুল আহমাদ স্যার দু'টির বেশি আঙ্গুর খাচ্ছেন না। এ অবস্থা দেখে স্যারকে আমি আঙ্গুর নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে, 'আমাকে বলেন ডা. দুইটির বেশি খেতে অনুমতি দেননি।' স্যারের ডায়াবেটিস আছে সেকথা আমি জানতাম না। খাওয়া Controlling কাকে বলে এ বিষয়ে স্যার সব সময়ের জন্য জীবন্ত উদাহরণ। প্রায় ৪৫ বছর ডায়াবেটিস নিয়েই সুস্থতার সাথে দিনানিপাত করেছেন। শুধু সাবধানতার কারণে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছেন। তিনি ব্যায়াম করতেন প্রতিদিন ৩০-৪৫ মিনিট। হাটতেন ঘরের মধ্যে, যা ছিল Routine Work । স্যারের মোবাইল নম্বর লেখার ধরণ ছিল উপজেলা ভিত্তিক, সারা দেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষার অভিনব কৌশল।

একদা স্যারের সাথে একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার পর স্যার একটি সহজ সমাধান করে দিলেন এবং বললেন, 'নবী-রাসূল (সাঃ) আর আসবেন না। সে যুগেও অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটেছে। আল্লাহর সাহায্য কামনা করে সমাধান করেছে। মহান রব সবাইকে কবুল করুন একথা বলে তিনি শেষ করে দিলেন।'

২০১৩ সালে অফিসিয়াল কাজে স্যারের সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজন হলো। একইভাবে সোসাইটির কাগজ পত্রে স্বাক্ষর দরকার। ঢাকাতে অন্যান্য অফিসিয়াল কাজ সেরে স্যারের সাথে দেখা করার চিন্তা ছিল। স্যারের বাসা তখন মিরপুর ১২নং, পানির ট্যাংকির পার্শ্বে। যাওয়ার জন্য মনস্থ করার পরে একজন ভাই পরামর্শ দিলেন ড. মঈন উদ্দিন সাহেবের সাথে কথা বললে তিনি

Lunch এ যাওয়ার সময় নিয়ে যাবেন, তাই হলো। দুপুর ২টায় স্যারের বাসায় পৌছার সাথে সাথে আমাকে রি-ফ্রেশ হতে বললেন এবং দু'এক মিনিট পরে ধিরস্থিরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'জনাব মনোয়ার হোসেন চৌধুরী সাহেব ও জনাব কামাল হাসান চৌধুরী সাহেব কেমন আছেন?' এরপর দুপুরের খানা খেতে বললেন, 'ইতস্তত করে খেতে বসলাম। বাটিতে ভাতের অবস্থা দেখে খুব চিন্তা করলাম, আমরা দুইজন মানুষ এত অল্প ভাত, তারপরও খেতে বসে গেলাম, যদিও আমার চিন্তা ছিল অফিসিয়াল কাজ সেরে বাহিরে খাব। কিন্তু স্যারের নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব হয়নি। আল্লাহর কত মহিমা বাটিতে যা ভাত ছিল খাওয়া শেষে আরও থেকে গেল। স্যার মূলত ভাত খুব বেশি নেননি। সামান্য একচামুচ ভাতের সাথে সবজির পরিমাণ একটু বেশি নিয়েই খাওয়া শেষ। যা দেখে আমার মনে অনেক প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছিল।

সেদিনও আমাকে "ত্রৈমাসিক প্রেক্ষণ" ২০১১ নামে কবি মতিউর রহমান মল্লিক স্মারক বইটি গিফট করেন এবং একইভাবে প্রিয় একরামুল হক ও বেগম একরামুল হক কথাটির সাথে দোয়া প্রার্থী লিখে স্বাক্ষর করে দেন। যা আমার নিকট মৃত্যু অবদি স্মৃতি স্বরূপ থাকবে এবং স্যারের হাতের লেখাটুকুন আমার যখনই চোখে পড়বে, তখনই স্যারের জান্নাতী চেহারার কথা মনে করে দিবে। আমাকে স্যার সব সময় Principal একরাম সাহেব কেমন আছেন বলে ডাকতেন। এমন আদরের ডাক দিয়ে আরতো কেউ ডাকবেনা।

হে আল্লাহ! মরহুম মকবুল আহমাদ স্যারকে দুনিয়াতে যেভাবে ভালোবেসেছিলে, মৃত্যুর পর তাঁর আত্মাকে ইল্লিয়্যিনে স্থান করে দিও এবং কাল হাশরে মহা মুসিবতের দিন আরশের নিচে ছায়া দিও এবং জান্নাতে সর্বোচ্চ সম্মান দান করিও। এ মোর ঐকান্তিক কামনা। আমিন। ছুম্মা আমিন।

লেখক : অধ্যক্ষ, শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, ফেনী।

একগুচ্ছ মানবীয় গুণাবলী মকবুল আহমাদকে অনন্য সাধারণ মর্যাদায় সমাসীন করেছে

তাঁর অত্যন্ত সহজ-সরল জীবন যাপন ও দাওয়াতী চরিত্র মানুষকে বিমোহিত করতো। তিনি সারাজীবন মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। তিনি সবসময় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন এবং যখনই কোথাও কোনো অসহায় মানুষের খবর পেতেন তখনই তাদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য-সহযোগিতা করার চেষ্টা করতেন।

মোহাম্মদ জাফর ইকবাল

মকবুল আহমাদ। দেশ-বিদেশের জনগণ যাকে এক নামেই চিনেন, জানেন। দেশের প্রধান ও সর্ববৃহৎ ইসলামী দল 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র দীর্ঘদিন নেতৃত্ব (তৃতীয় আমীর) দিয়েছেন যিনি। জীবনের অধিকাংশ সময় রাজনীতিতে ব্যয় করলেও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও সমান সমাদৃত তিনি। ছাত্রজীবন থেকেই সমাজসেবামূলক কাজের সাথেও নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন। এলাকার রাস্তাঘাট, পুল ও সাঁকো সংস্কার নির্মাণে এবং দরিদ্র লোকদের সাহায্য-সহযোগিতাকল্পে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সামাজিক, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দায়িত্বও পালন করেন। কেবল রাজনৈতিক কারণে, জীবনের শেষ সময়ে খুবই প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলা করতে হয়েছে তাঁকে।

নিজ জেলার মানুষ হিসেবে তাঁর সাথে আমার পরিচয় ঘটে পেশাগত কারণেই। তাঁর অত্যন্ত সহজ-সরল জীবন যাপন ও দাওয়াতী চরিত্র মানুষকে

বিমোহিত করতো। তিনি সারাজীবন মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। তিনি সবসময় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন এবং যখনই কোথাও কোনো অসহায় মানুষের খবর পেতেন তখনই তাদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য-সহযোগিতা করার চেষ্টা করতেন। দেশের বৈরি রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি একজন যোগ্য, দক্ষ ও প্রজ্ঞাবান অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছেন। জামায়াতের দুর্দিনে তিনি কঠিন জিম্মাদারি আঞ্জাম দিয়েছেন। যা তাঁকে যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় করে রাখবে।

খুবই ছোট বেলায় তাঁর নামটি একাধিকবার শুনেছি আমার মরহুম বাবার কাছ থেকে। আমি তখন ক্লাস ফাইভ বা সিক্সে পড়ি। ফেনী শহরের তাকিয়া রোডে (বড় মসজিদের ঠিক পেছনে) আমাদের দোকান ছিল। বাবা আর আমার বড় ভাই তখন দোকানে বসতেন। নিজের অসুস্থতাসহ বেশ কয়েকটি কারণে ফেনীর দোকান ছেড়ে এলাকায় ব্যবসা শুরু করেন বাবা। একদিন জামায়াতে ইসলামীর কিছু ভাই দোকানে এসে বাবাকে একটি প্রোগ্রামের দাওয়াত দিচ্ছেন। তখন প্রসঙ্গক্রমে মুহ্তারাম মকবুল আহমাদের কথা উঠে আসে। আমার খুবই স্পষ্ট মনে আছে সেদিনের কথা। বাবা বলছিলেন, জামায়াতের একটি অনুষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছিল। ফেনীতে বাবার পাশের দোকানদার ছিলেন জামায়াতের সমর্থক। তিনিই মকবুল আহমাদকে সাথে নিয়ে বাবার কাছে আসেন। প্রথমে দাওয়াত দেন, পরে সংগঠনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে আর্থিক সহযোগিতা চান। প্রথম দেখাতেই বাবা মকবুল আহমাদের ভক্ত হয়ে যান। যতটুকু সময় তিনি দোকানে ছিলেন বাবা শুধু তাঁর কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিলেন। এমন সহজ সরল মানুষ কীভাবে এতো বড় নেতা হন, এই প্রশ্ন জাগে বাবার মনে। দেশের রাজনীতি, সমসাময়িক বিষয় ও জামায়াতে ইসলামীর চিন্তাধারা এমন সাবলীল ভাষায় তুলে ধরলেন, যার কারণে বাবা মকবুল আহমাদের ভক্ত হয়ে গেলেন। পাশে বসে বাবার কথা গুলো আমি শুনছিলাম। এখনো যেন কথাগুলো কানে বাজছে।

ঢাকায় এসে পেশাগত কারণে তাঁর সাথে আমার পরিচয় ঘটে। পরিচয়ের পর থেকেই আমার মরহুম বাবার দেয়া সেই বর্ণনা মিলাতে থাকি। কী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব! চালচলন, কথাবার্তা এমন সরলতা পাওয়া যেন দুষ্কর। সবার আগে সালাম দেওয়া, হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে কেমন আছি জানতে চাওয়া। সময় যতো গড়াতে থাকে মুহতারাম মকবুল আহমাদের সাথে আমার সম্পর্কটাও দৃঢ় হতে থাকে। এক পর্যায়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়াদি নিয়েও আমাদের মাঝে আলোচনা হতো। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও কুশলাদি বিনিময় করতে ভুলতেন না। আজীবনের এই দা'ঈ ইলাল্লাহ জামায়াতে ইসলামীর কঠিনতম সময়ের কাণ্ডারী আমাদের জন্য রেখে গেলেন অনেক শিক্ষা এবং উদাহরণ। রাব্বুল আলামীন তাঁর এই গোলামের তামাম জিন্দেগীর সমস্ত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে নেকিতে পরিণত করে দিন। তাঁর নেক আমলগুলো কবুল করুন,

শহিদের মর্যাদায় তাঁকে সম্মানিত করুন। মহান রবের কাছে আবেগ ও বুকভরা এ আকুতি।

চলতি বছরের ১৩ এপ্রিল আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর, বিশিষ্ট ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ মকবুল আহমাদ। তিনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তাঁর মৃত্যুতে দেশে বিদেশে শোকের ছায়া নেমে আসে। দলের নেতাকর্মীই নয়, তাঁর মৃত্যুতে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গভীর শোক জানিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছেন, মকবুল আহমাদ বর্তমান দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জনঅধিকার, গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুণঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। ২০১২ সালের এপ্রিলে ১৮ দলীয় জোট গঠনের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন মরহুম মকবুল আহমাদ।

তার আইনজীবীর দেওয়া তথ্য মতে, মরহুম মকবুল আহমাদের বিরুদ্ধে ২৪টি হয়রানিমূলক মামলা ছিল। কয়েক দফা গ্রেফতার হয়ে পুলিশী রিমান্ডেও কাটিয়েছেন এই প্রবীন রাজনীতিবিদ। জামায়াতে ইসলামীর কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে যে কয়জন তাদের মেধা ও শ্রম সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করেছেন মকবুল আহমাদ তাদের অন্যতম। জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে মকবুল আহমাদের ভূমিকা উল্লেখ করার মত। সংগঠনকে তৃণমূল পর্যন্ত পৌঁছানো ও সুস্থ সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি অবিশ্রান্তভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

গত ১৩ এপ্রিল দুপুর একটায় রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে মকবুল আহমাদের ইন্তিকালের খবর শুনে মনটা খুবই খারাপ হয়ে যায়। আমার সহকর্মী (যিনি জামায়াত বিট করেন) সামছুল আরেফীন ভাইকে সাথে সাথে ফোন দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম তাঁর জানাযার নামাযের বিষয়ে। তিনি বললেন, নামাযে জানাযার বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। হলে জানাবেন। আমার মতো অনেকেই অপেক্ষায় ছিল নামাযে জানাযার সিদ্ধান্তের জন্য। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ঢাকায় জানাযার নামাজের আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। হলে হয়ত জাতি আরেকটি লাখো জনতার উপস্থিতি দেখতে পেত। তবে মকবুল আহমাদ যে কত জনপ্রিয় ছিলেন সেটি তার জন্মস্থান ফেনীতে অনুষ্ঠিত জানাযার নামাজেই প্রমাণিত হয়েছে। মকবুল আহমাদের ইন্তিকালের পর সেদিন দুপুরে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান তার ভেরিফাইড ফেসবুক পোস্টে বলেন, 'চলে গেলেন ইসলামী আন্দোলনের এক বর্ণালী মুজাহিদ সাবেক আমীরে জামায়াত জনাব মকবুল আহমাদ। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন............।'

করোনার কারণে ঈদুল আযহার ছুটিতে বাড়ীতেই ছিলাম। অফিস থেকে বাড়তি কয়েকদিনের অন ডিউটি ছুটিও নিয়েছিলাম! তখন মাত্র দুইদিন অফিসে আসা লাগত। বাসা থেকে নিউজ পাঠাতে হতো। বাড়ী থেকে ঢাকায় ফেরার একদিন আগে সম্ভবত ২৬ জুলাই আমাকে ফোন দিলেন শ্রদ্ধেয় মাওলানা মাহমুদুল হক (নায়েবে আমীর, ফেনী জেলা জামায়াত) ভাই। তিনি আমার শিক্ষকও। ফোন দিয়েই বললেন, জাফর ইকবাল বলছেন? আমি মাহমুদুল হক বলছি। নামটি বলার সাথে সাথেই আমি চিনে ফেলি। আমাকে বললেন, আমরা মরহুম মকবুল আহমাদকে নিয়ে একটি বিশেষ ম্যাগাজিন বের করছি। তাঁকে নিয়ে একটি লেখা দেওয়া যাবে? মাহমুদ ভাইয়ের এমন কথায় বলেছি, ভাই দেওয়া যাবে। এও জানালাম, আমি ঈদের ছুটিতে বাড়িতে আছি। ঢাকা ফিরেই লেখাটি পাঠিয়ে দেব ইনশা-আল্লাহ। মাহমুদ ভাই ই-মেইল আইডিটাও সাথে সাথে ম্যাসেঞ্জারে পাঠিয়ে দেন। এর দুদিন পর আমি ঢাকা ফিরে এসেছি ঠিকই, কিন্তু লেখাটি আমি দিতে পারিনি।

আমি ভাবতেও পারিনি যে, একজনকে নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক লেখার আগেই আমার কাছ থেকে স্মৃতি হয়ে যাবেন আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আল্লাহর সিদ্ধান্তের বাইরে তো যাওয়ার সাধ্য নেই। আমি যেদিন ঢাকায় আসি তার পরদিন রাতেই বাবার মৃত্যুর পাঁচ বছরের মাথায় আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আমার মমতাময়ী আম্মাকে চিরদিনের তরে হারিয়ে ফেলি। আম্মার মৃত্যুর পর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। কিছুতেই আম্মাকে ভুলতে পারছিলাম না। খাওয়া-দাওয়া, অফিস সব কিছুই যেন এলোমেলো। এর মধ্যে যোগ হয়েছে নিজের শারীরিক অসুস্থতা। কোমর থেকে ডান পায়ে অসহ্য ব্যথা নিয়ে অর্ধ মাস বাসাতেই ছিলাম। এভাবে কিছুদিন কেটে গেল। মকবুল আহমাদকে নিয়ে লেখার বিষয়টি আমার মনে ছিল কিন্তু আমি ধরেই নিয়েছিলাম, যেহেতু আম্মার মৃত্যুসংবাদটি গণমাধ্যমে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সবাই জেনেছেন, তাই হয়ত লেখাটি আর আমাকে দিতে হবে না বা আয়োজকরাও চাইবেন না। তাই একরকম লেখার কথাটি বাদই দিলাম। হঠাৎ অপরিচিত একটি নাম্বার থেকে ফোন আসে। বললো, ভাইয়া, মকবুল আহমাদকে নিয়ে আপনার একটি লেখা দেয়ার কথা ছিল। লেখাটি কবে পাওয়া যাবে। তাকে আমার সার্বিক অবস্থা জানালাম। ভদ্রলোক কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললো, আপনি ফ্রি হয়েই দিয়েন। এরপর আরও একাধিকবার ফোন দিয়েছেন। তারপর মনস্থির করলাম, যাই হোক একটা কিছু লিখি। যদিও এখনো আমি সেভাবে স্বাভাবিক হতে পারিনি। চোখের সামনে শুধু আমার আম্মার ছবি, ঈদে আম্মার সান্নিধ্যে ৭/৮ দিন কাটানো এবং আসার সময়ে বারবার আম্মার বুকে জড়িয়ে বিদায় দেয়ার দৃশ্যগুলো ভাসছিল। এক বসাতেই আমাকে লিখাটি সম্পন্ন করতে হয়েছে। ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে ২০০৭ সালে ঢাকায় আসি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ থেকেই সাংবাদিকতায় জড়িয়ে পড়ি। লেখালেখির নেশাকে পেশায় পরিণত করে রাজধানীতে সাংবাদিকতা শুরু আমার। বিট হিসেবে আমার দায়িত্ব হলো বিএনপি ও চার দলীয় জোটের নিউজ কভার করা। যেই জোট পরবর্তীতে ১৮ ও বর্তমানে ২০ দলীয় জোটে পরিণত হয়েছে। অচেনা এই শহরে আমার প্রেরণা ছিলেন ক্যাম্পাস, হল ও নিজ জেলার বড় ভাই দিদারুল আলম মজুমদার ভাইসহ কয়েকজন। আমাকে সাংবাদিকতায় এনেছেনও তিনি। সেই আরেক ইতিহাস। নয়াপল্টনে তার অফিসে প্রায়শ যেতাম। সেখানে দিদার ভাই আমাকে বললেন ফেনী ফোরাম ঢাকার সদস্য হতে। এর সুবিধা হলো, এলাকার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে পরিচয় ঘটবে। তার কথা মতো সদস্য হলাম। ফোরামের কর্মসূচিতে যাই। একসময় এই ফোরামের প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক করা হয় আমাকে। আমার যতদূর মনে পড়ে, ফোরামের প্রথম বৈঠকে আমার সাথে আনুষ্ঠানিক পরিচয় হয় মকবুল আহমাদ সাহেবের। যেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল মতিঝিলে অ্যাডভোকেট কামাল ভাইয়ের (বর্তমানে ঢাকা বারের সহ-সভাপতি) চেম্বারে। সেখানে আরও অনেক গুনী মানুষের আগমন ঘটেছিল। উনাদের পাশে বসে কাজ করতে পারাটাকে আমার কাছে খুবই গর্বের মনে হতো। এরপর সম্পর্কটা আরও সুদৃঢ় হতে থাকে। উনি আমাকে আমার নাম ধরে 'ইকবাল' এবং 'তুমি' বলেই সম্বোধন করতেন। পরবর্তীতে 'সাংবাদিক' বলে ডাকতেন। এর বাইরে আমি প্রায়শ জামায়াত অফিসে উনার সাথে দেখা করতে যেতাম। আমার কাজ, অফিসের অবস্থা জানতে চাইতেন। কথা বলার সুযোগে আমি আমার বেতন বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করার কথা বলতাম। তিনি বলতেন, 'বউ-বাচ্চা নেই, বেতন বাড়িয়ে কী হবে'? জবাবে আমি বলতাম, 'এই বেতনে আমাকে মেয়ে দেবে কে? এভাবে কথাবার্তা হতো।'

তারিখটা মনে নেই। সম্ভবত ২০১০ সালের মার্চ-এপ্রিল হবে। একদিন তিনি জামায়াত অফিস থেকে পিয়ন পাঠিয়ে আমাকে তার সাথে জরুরি দেখা করতে বললেন। আমি পরেরদিন তাঁর সাথে দেখা করলাম। বললেন, 'তোমার জন্য আমি ঘটকালি করতে চাই। একটি মেয়ে ঠিক করেছি। তার বাবার সাথে কথা হয়েছে। বাড়ি আমাদের ফেনীতেই। এইসব কথা বলে আমাকে একটি চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার পছন্দ হলেই ফাইনাল। টাকা-পয়সা নিয়ে ভাবতে হবেনা। এই বেতনেই চলবে। আমি কোন কথা না বলে চিরকুটটা হাতে নিলাম। বের হবার সময় বললো, আমাকে জানাবে কিন্তু! কাগজে শুধু লিখা ছিল মেয়ের নাম, বিশ্ববিদ্যালয় আর সেমিস্টারের কথা। আমি বিষয়টি নিয়ে আমার সহকর্মী এইচ এম আকতারের সাথে কথা বলি। সে বলে, সমস্যা নেই। সেখানে সহকর্মী-বন্ধু গাজী আনোয়ারের (নিউ নেশনের সিনিয়র রিপোর্টার) ছোট বোন পড়ে, একই ডিপার্টমেন্টে। তার

সাথে কথা বললেই হবে। সপ্তাহখানেক পরে গাজী আনোয়ারকে সাথে নিয়ে তার ছোট বোনের সাথে দেখা করি। আমরা কথা বলতে বলতেই মকবুল আহমাদের দেয়া পাত্রী ক্যাম্পাস থেকে বের হচ্ছিল। গাজী আনোয়ারের বোন বললো, ভাইয়া- এই যে মেয়েটি! যাক, মেয়েটি ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে বাসে উঠে গেল। মেয়ে দেখার ঝটিকা পর্ব শেষ!

এরপর প্রায় এক-দেড় মাস কেটে গেল। মকবুল আহমাদ সাহেবের সাথেও দেখা হয়নি। আমার ফ্যামিলির সাথেও বিষয়টি নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। এর মধ্যে ২৯ জুন গ্রেফতার হন জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, নায়েবে আমীর আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ। গ্রেফতারের প্রতিবাদে তাৎক্ষণিক প্রেস ব্রিফিং আহবান করে জামায়াত। ঐদিন বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া নেওয়ার দায়িত্ব ছিল আমার। একইসাথে প্রেস ব্রিফিং কভারেরও দায়িত্ব পড়ে আমার উপর। ব্রিফিং শুরু হবার প্রায় আধ ঘন্টা আগেই আমি জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিসে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি ব্রিফিং করবেন তৎকালীন নায়েবে আমীর মকবুল আহমাদ। তিনি তার চেয়ারে বসা। পাশে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল কাদের মোল্লা, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, ডা. শফিকুর রহমান, প্রচার সেক্রেটারি অধ্যাপক তাসনীম আলম, ঢাকা মহানগরী সেক্রেটারি হামিদুর রহমান আযাদ, সাবেক এমপি আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা এটিএম মাসুম, ঢাকা মহানগরীর সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল হালিম, শিবির সভাপতি মুহাম্মদ রেজাউল করিম। আমাকে দেখেই মকবুল সাহেব ‘সাংবাদিক’ ডাকলেন। স্বাভাবিকভাবে আমার ধারণা ছিল তিনি আমাকে জামায়াত নেতাদের গ্রেফতারসহ রাজনৈতিক বিষয়াদি জানার জন্য বা কোনো তথ্য দেয়ার জন্য ডেকেছেন। কাছে গিয়ে দেখি ভিন্ন আলাপ। প্রথমেই আমি কেমন আছি জানতে চান। পরে খুব আস্তে করে বললেন, মেয়ে দেখতে গেছো? আমাকে তো কিছু জানাওনি। তাঁর প্রশ্ন শুনে আমি হতবিহবল। এক কথায় অবাক হয়ে যাই। যেখানে সবাই জামায়াত নেতাদের গ্রেফতার নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে, সেখানে তিনি কী বললেন? মনে মনে বললাম, এতটা চাপের পরও তিনি খুবই স্বাভাবিক। চোখে মুখে বা আলাপচারিতায় ভীতির কোনো লক্ষণ নেই। এতদিন পরও তিনি আমার কথা মনে রেখেছেন। বিশেষ করে বিয়ের জন্য পাত্রী দেখা! আমি বললাম, মেয়ের ক্যাম্পাসে গিয়েছিলাম। মেয়ে দেখেছি। আপনার সাথে এ নিয়ে পরে কথা বলবো। অবশ্য পারিবারিক একটা সমস্যার কারণে ওই মেয়ের বিষয়ে আর অগ্রগতি হয়নি। পরবর্তীতে দেখা হলেই প্রথমে বিয়ে করেছি কি-না জানতে চাইতেন। আমি পারিবারিক সমস্যার কথা জানিয়ে এড়িয়ে যেতাম। একইসাথে বেতনাদি নিয়ে কথা বলতাম।

২০ দলীয় জোটের নিউজ কভার করার কারণে অনেক স্থানে মরহুম মকবুল আহমাদের সাথে আমার দেখা হতো। 'সাংবাদিক' বা কখনো 'ইকবাল' বলে আমাকে কাছে ডাকতেন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খবরাখবরের পাশাপাশি রাজনৈতিক বিষয়াদিও জানতে চাইতেন। ঢাকায় জোটের একাধিক সভায় তিনি বক্তব্য রেখেছেন। ঢাকার বাইরেও অনেক কর্মসূচিতে উনার সাথে দেখা হতো। সর্বশেষ চাঁপাইনবাবগঞ্জে জোটের একটি সমাবেশে তাঁর বক্তব্য কভার করি। দেখেই কোথায় উঠেছি, খাওয়া-দাওয়ায় সমস্যা হচ্ছে কি-না জানতে চাইলেন। বিনয়, নম্রতা ও চরিত্রমাধুর্য, সর্বোপরি একগুচ্ছ মানবীয় গুনাবলী তাঁকে অনন্য সাধারণ মর্যাদায় সমাসীন করেছে।

লেখক :
দপ্তর সম্পাদক :- ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (২০২০, ২০২১),
সাবেক সভাপতি :- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি,
স্টাফ রিপোর্টার : দৈনিক সংগ্রাম।
ই-মেইল : jafar224cu@gmail.com

দিনে সংগ্রামী রাতে দরবেশ

এম. সাখাওয়াত হোসাইন

১৯৮৬ সাল, আমি তখন ফেনী আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া মাদরাসার ছাত্র। এরশাদের শাসনামল। আন্দোলনের চাপে সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা হলো। জনাব মকবুল আহমাদ স্যার নির্বাচন করতে ফেনীতে চলে এলেন। তখন জামায়াতের ফেনী অফিসে রাত্রি যাপনের মত কোন ব্যবস্থা ছিলোনা। অগত্যা স্যারকে থাকতে দেয়া হলো ফালাহিয়া মাদরাসার দোতলার ছাত্রাবাসে। স্যার এবং ছাত্রদের মাঝে কোন প্রকার পর্দা বা পার্টিশনের ব্যবস্থা ছিলোনা। ফলে সাধারণ ছাত্রদের মতই একটি চকিতে থাকতেন তিনি। আমার সিটটি ছিলো স্যারের কাছাকাছি।

> আখেরাতমুখী মুসাফিরী জিন্দেগীর মূর্ত প্রতিক মুহতারাম মকবুল আহমাদ স্যারের প্রতিটি কথা ছিলো চিরন্তন সত্য বাণীর মত দার্শনিক সুলভ বাস্তব নসিহত। শুধু কথায় নয় বাস্তবেও ছিলেন এক জীবন্ত মুসাফির। পৈত্রিক বাড়ি ব্যতিত কোথাও নিজের একটি বাড়ি ছিলোনা, ব্যাংকে কোন একাউন্ট ছিলোনা। এই মহা মনিষী ছিলেন উন্নত চরিত্রের একজন শ্রেষ্ঠ দা'য়ী ও শ্রেষ্ঠ সংগঠক।

এই প্রথম এত নিকট থেকে স্যারকে দেখার সৌভাগ্য হলো। আমি ছিলাম আওয়ামী পরিবারের সন্তান। আমার বাবা মরহুম হাফিজ আহমদ মোল্লা ছিলেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের অন্যতম সংগঠক। স্বাভাবিক কারণেই ছোট বেলা থেকেই মকবুল আহমাদ সাহেব ও জামায়াতের ব্যাপারে অত্যন্ত খারাপ ধারণা নিয়ে বেড়ে উঠি। ফলে কাছে পেয়ে তাঁর জীবন চরিতকে অবজার্ভ করার আগ্রহ বেড়ে যায়। তিনি যতক্ষণ হোস্টেলে থাকতেন আমি ততক্ষণ লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর কাজকর্ম ও চালচলন পর্যবেক্ষণ করতে চেষ্টা করতাম।

মাদরাসার রুটিন মোতাবেক রাত ১০/১১ টার পর ছাত্রদের জাগ্রত থাকার সুযোগ ছিলোনা। আবার ভোরে ঘন্টা বাজার সাথে সাথে উঠে যাওয়া ছিলো বাধ্যতামুলক। কিন্তু কথিত ভয়ংকর খারাপ!! এই মানুষটির ব্যাপারে জানার অতি উৎসাহের কারণে তখন আমার রাতের ঘুম হয়ে গিয়েছিলো খুবই হালকা। জনাব মকবুল আহমাদ

সাহেব সকালের নাস্তা সেরে সুন্দর পায়জামা পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে পড়তেন জনসংযোগ ও নির্বাচনের প্রস্তুতিমূলক সভা সমাবেশের কাজে। রাত ১২টা, ১টা বা ২টার আগে কখনো ফিরতেন না। অতি উৎসাহের কারণে আমার ঘুম আসলেও কান খাড়া থাকতো। ফলে উনি ঢুকা মাত্রই আমি টের পেয়ে যেতাম। তিনি হোস্টেলে ঢুকে চুপে চুপে উনার সিটের পাশের একটি লাইট জ্বালাতেন। এবং কাপড় পরিবর্তন শেষে অযু করে প্রথমে কয়েক রাকাত নামাজ পড়তেন তারপর পাঞ্জাবি-টুপি পরা অবস্থায় মশারীর ভিতরে বালিশের উপর কোরআনের তাফসির রেখে চুপি চুপি পড়তে থাকতেন। এরপর কখন যে আমার ঘুম এসে যেত টের পেতামনা।

মাদরাসার রুটিন মোতাবেক ভোরে ঘন্টা বাজার সাথে সাথে জেগে উঠে দেখতাম তিনি তখনো মশারীর ভিতর পাঞ্জাবি-টুপি পরিহিত অবস্থায় রাতের মতই বালিশের উপর কোরআন বা হাদীস রেখে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বিস্ময়কর ব্যাপার! কখন তিনি ঘুমালেন? আবার কখন উঠে পরিপাটি হয়ে সেই আগের মত অধ্যয়নে মগ্ন হলেন? একদিন দুই দিন নয়, একাধারে ১৫/২০ দিন এভাবেই তাঁকে দেখতে পেলাম। সারা দিন বীর পুরুষের মত মাঠঘাট চষে বেড়িয়ে রাতে এসে প্রভূর সান্নিধ্যে নির্ঘুম দরবেশী জীবন, একি মানুষ নাকি ফেরেস্তা? অথচ এই মানুষটার ব্যাপারে ছোট বেলা থেকে কত ভয়ংকর খারাপ চরিত্রের গল্প শুনেছি আওয়ামী নেতা কর্মীদের মুখে। এই মকবুল আহমাদ আর সেই মকবুল আহমাদের মাঝে তো কোন মিল দেখছিনা। তাহলে কি আমি ভুল দেখছি? নাকি কোন স্বর্গীয় পুরুষকে স্বপ্নে দেখছি? না না আমি কোন স্বপ দেখিনি। মাত্র অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছোট মানুষ আমি। হিসাব মিলাতে পারছিনা। মনের ভেতর তোলপাড় শুরু হয়েছে। আমাকে এর রহস্য জানতেই হবে। সিদ্ধান্ত নিলাম বাবার কাছ থেকে মকবুল সাহেবের চরিত্রের সার্টিফিকেট নিয়ে এর রহস্য বুঝার চেষ্টা করবো। আমার বাবা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হলেও কারো প্রতি অপবাদমূলক মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিলোনা।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। চলে গেলাম বাড়ীতে। আব্বাজান তখন বাড়ীতে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। আব্বার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে কখনো অভ্যস্থ ছিলাম না। কিন্তু সেদিন ছিলাম খুব আবেগতাড়িত, উত্তেজিত। শুধুমাত্র রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে ফেরেস্তার মত একজন মানুষের বিরুদ্ধে এত মিথ্যা প্রপাগান্ডা কিভাবে মেনে নেয়া যায়? তাই দুপুরে খেতে খেতে সাহস করে বাবাকে বললাম, আজ আপনি আমাকে একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। আর তাহল- জামায়াত নেতা মকবুল আহমাদ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি? তাঁর ব্যাপারে কেউ কেউ খুব আপত্তিকর কথা বলে থাকে। আজ আপনার কাছ থেকে সত্যটা শুনতে চাই। হঠাৎ ছোট্ট ছেলের মুখে এমন সাহসী প্রশ্ন শুনে বাবার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। আমার বাবা পাকিস্তানের ঊষালগ্নের

মেট্রিক পাশ উঁচুমানের ব্যক্তিত্বশীল একজন বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। আমার প্রশ্নে কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরক্ষণেই বলতে লাগলেন- জনাব মকবুল আহমাদ সাহেব বয়সে আমার ছোট হলেও এত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁর ব্যাপারে কোন প্রকার মন্তব্য করার যোগ্যতা আমি রাখিনা। এমন সৎ ও সজ্জন ব্যক্তি আমার জীবনে খুব কমই দেখেছি। বাবার সদুত্তরে সেদিন থেকে জামায়াত শিবিরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। যদিও এর আগেই শিবিরের কাছ থেকে দাওয়াত পেয়েছি কিন্তু মনে প্রাণে ভালোবাসা শুরু হয়েছে মকবুল আহমাদ স্যারের চরিত্রের মাঝে আল্লাহর ওলীদের বৈশিষ্ট্য স্বচক্ষে দেখা আর আব্বাজানের উপরোক্ত মন্তব্য শুনার পর থেকে। বলা যায় ইসলামী আন্দোলনে আমার সম্পৃক্ততা ও সক্রিয় হওয়ার পেছনের গল্প মরহুম মকবুল আহমাদ স্যার। তিনি ছিলেন আমার মত অসংখ্য মানুষের মুর্শিদ, রাহবার ও প্রেরণার বাতিঘর। কথা ও কাজের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উত্তম আদর্শ। তাঁর সাথে কথপোকথন বা চলাফেরার প্রতিটি পর্বই ছিলো শিক্ষণীয়।

দার্শনিক মকবুল আহমাদ

(তোমরা অনুসরণ করো তাদের, যারা তোমাদের নিকট কোন বিনিময় আশা করে না, অথচ তারা সুপথ প্রাপ্ত)

১৯৯৯ সাল সৌদি আরব থেকে প্রথম ছুটিতে দেশে আসলাম। ফেনী থেকে আমার বাড়িতে খবর পাঠানো হলো আমি যেন জনাব মকবুল আহমাদ স্যারের সাথে যোগাযোগ করি। আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে, আমার মত অধমের খোঁজ খবর রাখার ক্ষেত্রেও তিনি কত তৎপর! কত যত্নবান! না হয় আমি দেশে আসার সাথে সাথে তিনি কিভাবে জানলেন?

যাইহোক জেলা জামায়াত অফিসে গিয়ে স্যারকে ফোন দিলাম। কুশল বিনিময় শেষে বললেন, 'তুমি ঢাকায় আসলে আমার সাথে একটু দেখা করিও।' কয়েক দিন পর ঢাকা গিয়ে কেন্দ্রীয় অফিসে স্যারের সাথে দেখা করলাম। মুড়ি-কলা দিয়ে আপ্যায়ন করালেন। আর আমার প্রবাস জীবন ও পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি জানার চেষ্টা করলেন। জানতে চাইলেন বিদেশে আর না গেলে চলেনা? বললাম, 'আর কয়েক বছর পর একবারে চলে আসবো ইনশাআল্লাহ।' জানতে চাইলেন, 'কোন সুনির্দিষ্ট টার্গেট কি ঠিক করেছ যে, এই পরিমাণ অর্জিত হলে একবারে দেশে চলে আসবে?' আমি বললাম, 'দেশে এসে ছোটখাটো কিছু একটা করার মত পুঁজি হলে চলে আসবো স্যার।' তিনি বললেন, 'ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়া হলো আখেরাতের শষ্য ক্ষেত্র, মুসাফিরের জিন্দেগী। এখানে প্রত্যেকটা কাজের পরিকল্পনা ও টার্গেট হতে হবে সুনির্দিষ্ট।'

মানুষের চাহিদার শেষ থাকেনা। যেমন- গ্রামে তোমার কাঁচা ঘরের একটি বাড়ি আছে, আর মনে মনে স্থির করলে একটি পাকা ঘরের ব্যবস্থা হলে

বিদেশ থেকে একবারে চলে আসবে। পাকা ঘর হলো, এবার মন চায় জেলা শহরে একটি বাড়ি। তাও হলো, এবার মন চায় ঢাকা শহরে একটি বাড়ি। তাও হলো, এবার মন চায় ইউরোপ আমেরিকায় একটি ঠিকানা। এভাবে যুগের পর যুগ শেষ হয়ে বার্ধক্য চলে আসে, তখন আর দেশের মাটি, মানুষ ও ইসলামী আন্দোলনের জন্য কিছু করার সুযোগ থাকেনা।

অতএব কি পরিমাণ আর্থিক উন্নতি হলে, কবে, কখন, কতদিনের মধ্যে দেশে ফিরবে এবং দেশের মাটি, মানুষ ও ইসলামী আন্দোলনের জন্য কি খেদমত করবে তার সুনির্দিষ্ট টার্গেট ও পরিকল্পনা করে নাও। না হয় গন্তব্যহীন জীবন কখনো সফল হবেনা।

আখেরাতমুখী মুসাফিরী জিন্দেগীর মূর্ত প্রতিক মুহতারাম মকবুল আহমাদ স্যারের প্রতিটি কথা ছিলো চিরন্তন সত্য বাণীর মত দার্শনিক সুলভ বাস্তব নসিহত। শুধু কথায় নয় বাস্তবেও ছিলেন এক জীবন্ত মুসাফির। পৈত্রিক বাড়ি ব্যতিত কোথাও নিজের একটি বাড়ি ছিলোনা, ব্যাংকে কোন একাউন্ট ছিলোনা। এই মহা মনিষী ছিলেন উন্নত চরিত্রের একজন শ্রেষ্ঠ দা'য়ী ও শ্রেষ্ঠ সংগঠক। আল্লাহ পাক তাঁকে ক্ষমা ও রহম দিয়ে জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন। আর আমাদেরকে দান করুন তাঁর রেখে যাওয়া নসিহত ও চরিত্রকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করার যোগ্যতা। আমিন, ছুম্মা আমিন।

প্রাকটিক্যাল মুসলিম

মরহুম মকবুল আহমাদ স্যারের প্রতিটি কথার মাঝে লুকিয়ে থাকতো খুব ওয়েটফুল লজিক আর পজিটিভ মোটিভেশান। একদিন মেয়ের বিয়ে সম্পর্কে স্যার বললেন- পাত্রটা শিক্ষিত ও কর্মঠ মুসলিম হলে চলবে। ধন দৌলত ও বংশ মূখ্য বিষয় নয়। আমি বললাম স্যার এটা কেমন কথা বললেন? আপনার মেয়ের জন্য আবার অমুসলিম পাত্রের প্রস্তাব আসবে নাকি? মৃদু হেসে বললেন জন্মসূত্রের মুসলিম নয় কর্মসূত্রের প্র্যাকটিকেল মুসলিম খুঁজতেছি। নাগরিক সনদের মুসলিম তো বেসুমার কিন্তু কোরআন সুন্নাহর সনদ অনুযায়ী মুসলিম খুঁজলে বুঝতে পারবে এই সমাজে প্রকৃত মুসলমান কয়জন?

আরেকদিন এই মহান সংগঠক আমার নিকট কয়েকজন ভাই সম্পর্কে জানতে চাইলেন অমুক অমুক রুকন হয়েছে কিনা? আমি বললাম স্যার ওরা এই মুহূর্তে রুকন হওয়াটাকে ঝামেলা মনে করছে, কিছুদিন পর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। হেসে উঠে বললেন মুসলিম ব্যক্তির জন্য রুকন হওয়া ঝামেলার হবে কেন? আমি বিস্ময় নয়নে তাকাতেই আবার বলতে শুরু করলেন, 'যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে পরে একজন মানুষকে মুসলিম বলা হয় সেসব বৈশিষ্ট্যকেই তো রুকন হওয়ার শর্ত করেছে জামায়াত। সুতরাং প্রকৃত মুসলিমের জন্য জামায়াতের রুকন হওয়াটা জটিল নয় বরং সহজ। কেউ যদি দুনিয়ার শান্তি আর পরকালের মুক্তি পেতে চায় তাকে অবশ্যই আল্লাহকে

রব আর মহানবী (সঃ) কে উত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং নির্ধারিত ফরজ ওয়াজিব এবাদতসমূহ পালন করা ও হালাল হারাম বেঁচে চলা বাধ্যতামূলক। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে অর্থ, সময় ও জীবন উৎসর্গ করাটা তো আল্লাহ পাক কর্তৃক ফরজ নির্দেশ। এসবই তো মুসলিম হওয়ার শর্ত। আর জামায়াতের গঠনতন্ত্রে এই কাজগুলোকেই রুকন হওয়ার শর্ত করা হয়েছে। অতএব রুকন আর মুসলমান তো এক জিনিস। কি চমৎকার যুক্তিসঙ্গত মোটিভেশান।'

তিনি যে কত বাস্তব ভিত্তিক ও রসিক যুক্তিবাদী ছিলেন তার একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। গল্পটি শুনেছি স্যারের ভগ্নিপতি আমার প্রতিবেশী দাদা মরহুম আবদুল গোফরান মিয়ার (মাইজ্জা মিয়া) নিকট থেকে। তিনি বল্লেন একদা মকবুল আহমাদ সাহেব বোনের বাড়ীতে এলে উনার বোন চা বিস্কুট পরিবেশন করলেন। কিন্তু তিনি চা খেলেননা। তখন উনার বোন বললেন তুমি আধুনিক যুগের ডিগ্রিতে পড়ুয়া একজন ছাত্র। অথচ চা খাওনা আবার এত অল্প বয়সে দাঁড়ি রেখে দিয়েছ। কি সব উল্টো কাজ কারবার!

তখন মকবুল আহমাদ সাহেব মুসকি হেসে বললেন আপু! আমি ডিগ্রি পর্যন্ত কোনো বই পুস্তকে চা খাওয়ার কথা পাইনি আর দাঁড়ি তো উঠার পরে রেখেছি, উঠার আগে তো রাখিনি তাহলে আমি আবার কিভাবে উল্টো কাজ করলাম? বাহ্ কি চমৎকার যুক্তি। বোন তখন অসহায় দৃষ্টিতে বলল নাহ্ তোর সাথে কখনো পেরে উঠিনা।

লেখক : বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাবেক ফেনী জেলা সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

মকবুল আহমদ (রাহি.) : সাহস ও প্রেরণার সুউচ্চ মিনার

রাশেদুল হাসান রানা

স্যার ছিলেন আমাদের জন্য সর্বদাই এক বটবৃক্ষসম। তাঁর কাছে গেলে মনে হতো প্রশান্তির এক নীড়ে এসেছি। যতোবার তাঁর সাথে দেখা হতো, ততোবারই তিনি আন্তরিকতা আর দরদমাখা হৃদ্যতায় হৃদয়াকাশ তারা ঝলমলে করে তুলতেন। দূর হয়ে যেতো মনের সকল অস্থিরতা, দুঃখ-ব্যথা।

টিক টিক টিক- বয়ে চলেছে সময়। দার্শনিক মহলে বিতর্ক আছে, 'বর্তমান' বলতে আদতে কিছু নেই। 'বর্তমান' শব্দটি উচ্চারণ করতে করতেই তা নিজেও অতীতের গর্ভে হারিয়ে যায়। সে হিসেবে এক মুহূর্ত পূর্বে ঘটে যাওয়া যে কোনো ঘটনাই আমাদের জন্য স্মৃতি। এমন অজস্র স্মৃতির খাঁচায় বন্দী ছোট্ট এ জীবন। কিন্তু কিছু কিছু স্মৃতি থাকে অমলিন, অবিনশ্বর। কখনও মোছা যায় না। বয়ে বেড়াতে হয় জীবনভর, সকল সংকট এবং সম্ভাবনার পরতে পরতে। সাবেক আমীরে জামায়াত মরহুম মকবুল আহমদ (রাহি.) আমাদের জীবনে তেমনই এক স্মৃতিময় নাম। প্রেরণায় চির ভাস্বর এক কিংবদন্তি।

মরহুম মকবুল আহমদ (রাহি.) ছিলেন এক বিস্ময়কর ভারসাম্যপূর্ণ জীবনাচরণের অধিকারী আপাদমস্তক আল্লাহপ্রেমিক মানুষ। পৃথিবীতে মানুষের মনে দাগ কাটা অথবা ইতিহাসে নামটি রেখে যাওয়া সহজ কাজ নয়। এটা আসলেই বেশ কঠিন। কঠিন বলেই সব মানুষ নিদাগী হয়ে মিশে যায় মাটির সাথে। খুব অল্প কিছু মানুষ কাল থেকে কালান্তরে বেঁচে থাকেন মানুষের হৃদয়ে। স্যার তাঁর কর্ম ও সাধনার দ্বারা আল্লাহর ভালোবাসা জিতে নেয়ার পাশাপাশি জিতে নিয়েছেন লক্ষ-কোটি মানুষের অন্তর। অনাগত সময় তাঁকে স্মরণ করবে গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায়। তাঁর জন্য দোয়ায় অশ্রুসিক্ত করবে জায়নামাজ।

ব্যক্তিগত জীবনে স্যারের কাছাকাছি আসার সৌভাগ্য হয়েছে বহুবার। সেই হিসেবে স্মৃতিও অনেক। একটি সদস্য শিক্ষাশিবিরের কথা মনে পড়ছে। সেই প্রোগ্রামে স্যার আলোচনা রেখেছিলেন 'মুমিন জীবনের লক্ষ্য' তথা 'Aim in Life' টপিকের উপরে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। 'Aim in Life' এর উপরে তাঁর দেয়া ব্যাখ্যাটা হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিলো। পরবর্তীতে জীবনে যতো জায়গায় আলোচনা করেছি, এই টপিকের উপরে স্যারের দেয়া সেই ব্যাখ্যাটা বলতে ভুলিনি। সেদিন আলোচনার শুরুতেই স্যার আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন- 'Aim in Life' বলতে আমরা আসলে কি বুঝি? আমরা সারাজীবন ধরে শিখে আসা সেই ধারণাটাই বললাম। স্যার সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি বললেন- "এ ধারণা ছাত্র এবং শিক্ষক, উভয় অবস্থাতেই আমারও ছিলো। কিন্তু দ্বীনি আন্দোলন আমার সে ধারণা পাল্টে দিয়েছে।" আমরা স্যারের দিকে বিস্ময়মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। আমাদের ভাবনার সমুদ্র থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন তিনিই। বললেন- "ইংরেজি ডিকশনারীতে 'Aim in Life' এর সংজ্ঞা দেয়া আছে এভাবে- 'Aim in life is an unattainable subject.' তার মানে হলো- এটি এমন একটি উদ্দেশ্য, যা কখনও এই দুনিয়াতে অর্জন করা সম্ভব নয়। তিনি ব্যাখ্যার আরও গভীরে প্রবেশ করলেন- "Aim in life সাময়িক কোনো লক্ষ্য হাসিল নয়। আমরা যারা দ্বীনি আন্দোলন করি, তাদের মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতে যাওয়া। এগুলো কি এই দুনিয়াতে পাওয়া যাবে? না পাওয়া যাবেনা। তবে এই ক্ষমা এবং জান্নাত লাভের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের দুনিয়ার সার্বিক কাজ পরিচালিত করতে হবে। তাহলে দুটি লাভ- একটি দুনিয়াতে সঠিক পথে থাকার সুযোগ এবং দ্বিতীয়টি মৃত্যুর পর আখেরাতে আল্লাহর ক্ষমা এবং জান্নাত লাভ। আর এটাই হচ্ছে সত্যিকারের Aim in life." স্যারের সেদিনের ব্যাখ্যা আমার ভাবনার জগতকে নাড়িয়ে দিয়েছিলো ভীষণ।

স্যার ছিলেন আমাদের জন্য সর্বদাই এক বটবৃক্ষসম। তাঁর কাছে গেলে মনে হতো প্রশান্তির এক নীড়ে এসেছি। যতোবার তাঁর সাথে দেখা হতো, ততোবারই তিনি আন্তরিকতা আর দরদমাখা হৃদ্যতায়

হৃদয়াকাশ তারা ঝলমলে করে তুলতেন। দূর হয়ে যেতো মনের সকল অস্থিরতা, দুঃখ-ব্যথা। তিনি এমন ভাবে ছোট-বড় সবার সাথে কথা বলতেন যেন কেউ তাঁর কথায় সামান্যতম কষ্টও না পায়। বিশেষত, তিনি আন্দোলনের পুরনো সাথীদের ভুলে যেতেন না কখনও। একবারের স্মৃতি মনে পড়ছে। আমি তখন ফেনী জেলা শিবিরের সেক্রেটারি। পাঁচ দিনের একটি শিক্ষাশিবিরে ঢাকায় গিয়েছিলাম। স্যার টিসি শেষে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেতে বললেন। টিসি শেষ করে গেলাম স্যারের সঙ্গে দেখা করতে। স্যার ফেনীর তাঁর দুই পুরনো সাথীর জন্য দুটি চাদর আমার হাতে তুলে দিয়ে পৌঁছানোর দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং আন্দোলনে তাঁদের অবদানের কথা তুলে ধরলেন, পাশাপাশি তাঁদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে বললেন। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, দূরে থেকেও স্যার তাঁর পুরনো সাথীদের ভুলে যাননি।

এমনকি যখন ২০১১ সালের পর পরিস্থিতি খুবই খারাপ হতে লাগলো তখনো তিনি নিয়ম করে তাঁর পুরোনো সাথীদের সাথে মোবাইলে কথা বলতেন। তাদের সুবিধা অসুবিধার খোঁজ নিতেন। তার সাথে দেখা করতে গিয়ে কেউ মনে হয় খালি হাতে ফিরেননি। কোন উপহার না হলে একটা বই অথবা পত্রিকায় প্রকাশিত কোন কলামের ফটোকপি অন্তত স্যার দিতেন। আমি নিজেও বিভিন্ন সময় স্যারের কাছ থেকে বই হাদিয়া পেয়েছি।

বীর চট্টলার সিংহ পুরুষ অধ্যাপক মফিজুর রহমান বলতেন-

"ডায়াবেটিকের আদর্শ মডেল রোগী হলেন মকবুল আহমদ সাহেব।" এর কারণ ছিলো তাঁর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা। মেপে মেপে জীবন পরিচালনা করা। একদিন সে প্রমাণ পেলাম হাতেনাতেই। প্রবল বৃষ্টিমুখর সকাল। ফজরের পরপর রেইনকোট গায়ে চাপিয়ে মোটরসাইকেলের পিছনে একজনকে বসিয়ে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছি। পথিমধ্যে দূর থেকে হালকা আবছায়া দেখতে পেলাম এক ব্যক্তির। মাথায় ছাতা। কাছাকাছি যেতেই দেখলাম মকবুল স্যার শরীরের নিচের অংশ ভিজে জবজবে। সঙ্গে সঙ্গে মোটরসাইকেল থামিয়ে কাছে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম- "স্যার, আপনি এই প্রবল বৃষ্টিতে একা একা হাঁটতে বেরিয়েছেন"। স্যার একটু হেসে জবাব দিলেন- "কি করবো বলো! ডায়াবেটিস তো আর বৃষ্টি-বাদল বুঝবে না। এছাড়া অন্য কাউকে সঙ্গে

নিয়ে তার কষ্ট বাড়ানো সঠিক মনে করলাম না।" আমি আমার সঙ্গীকে মোটরসাইকেল দিয়ে স্যারের হাঁটার সঙ্গী হয়ে গেলাম।

আর একটি ঘটনা। একবার বর্তমান জেলা আমীর (তৎকালীন জেলা নায়েবে আমীর) জনাব এ.কে.এম শামছুদ্দিন সাহেবের বাসায় সকালের নাস্তায় স্যারকে দেখলাম মাত্র ২/৩ (সর্বোচ্চ) পিস আম নিয়েছেন। তখন আমার প্লেট থেকে কিছু আমের পিস স্যারকে তুলে দিতে চাইলে তিনি বললেন- "তুমি এটা আমাকে ভালোবেসে দিচ্ছো তো? কিন্তু মিষ্টার রাশেদ সাহেব! তোমার এ ভালোবাসা আমার শরীর বহন করতে পারবে না।"

স্যারকে এক কঠিন সময়ে সংগঠনের জিম্মাদারী নিতে হয়েছিলো। তখন দেশের রাজনৈতিক আকাশে মেঘের ঘনঘটা। চারদিকে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। চলছে বিরোধী জোটের তীব্র আন্দোলন-সংগ্রাম।

২০১৩ সাল, আমি তখন ঢাকা মহানগরী পূর্ব ছাত্রশিবিরের সভাপতি। ১৮ দলীয় জোটের এক মহাসমাবেশ হচ্ছে পল্টনে। স্যার তখন ভারপ্রাপ্ত আমীরে জামায়াত। তাঁকে মঞ্চে নিয়ে আসার দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপলো। সেদিন আমাদের উপর পুলিশ-প্রশাসনের অতিরিক্ত নজরদারি চোখে পড়ছিলো। সমাবেশস্থলে প্রবেশ করতে গিয়ে আমাদের ভাইয়েরা বিভিন্ন জায়গায় বাধার সম্মুক্ষীণ হচ্ছিলেন। সংগত কারণেই ভারপ্রাপ্ত আমীরে জামায়াতের ব্যাপারে আমাদের নেতৃবৃন্দ কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিলেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ, বর্তমান ঢাকা সিটি দক্ষিণের আমীর (তৎকালীন অবিভক্ত মহানগরীর সেক্রেটারী) নুরুল ইসলাম বুলবুল ভাই, মহানগরী উত্তরের আমীর সেলিম উদ্দিন ভাই, দক্ষিণের বর্তমান সেক্রেটারী ড.শফিকুল ইসলাম মাসুদ ভাই বারবার আমাকে ফোন করছেন আর বলছেন, "ভালো করে পরিস্থিতি বুঝার চেষ্টা করো। কোন রিস্ক নেয়া যাবেনা।" আমিও কি করবো বা আমার কি করা উচিৎ, ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছিলাম না! অগত্যা স্যারকে পরিস্থিতির বিস্তারিত জানালাম। স্যার সব শুনলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন- "তোমাদের পরিকল্পনা কি?" বললাম- "স্যার, আপনাকে মোটরসাইকেলে করে ভাসানী গলি হয়ে মঞ্চে নিয়ে যাবো। মঞ্চের মুখে আমাদের প্রস্তুতি আছে মানে অবস্থান আছে" স্যার বললেন- "ঠিক আছে। আমাদের দায়িত্ব হলো সর্বোচ্চ পরিকল্পনামাফিক কাজ

করে যাওয়া। বাকিটা দেখার দায়িত্ব আল্লাহর। চলো আল্লাহ ভরসা।"

সেদিন আমি ইসলামী আন্দোলনের এ জিন্দাদিল মর্দে মুজাহিদের কণ্ঠে যেন প্রতিধ্বনিত হতে দেখলাম এ আন্দোলনের আরেক সিপাহসালার মাওলানা মওদূদী (রহ.) এর সেই কথাটি- প্রচন্ড গুলিবর্ষণের মধ্যেও তিনি সেদিন তাঁর সাথীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন "আমি যদি বসে পড়ি, তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?"

মকবুল আহমদ (রাহি.) থাকবেন আমাদের হৃদয়ের মনিকোঠায়। থাকবেন ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ লক্ষ নেতা, কর্মীদের কাছে সাহস ও দৃঢ়তার এক দেদীপ্যমান আলোকবর্তিকা হয়ে। কালের নকীব হয়ে আমাদের হেঁকে যাবেন সত্য ও সুন্দরের পথে প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত। ফেনীর ছায়া সুনিবিড় গ্রাম-গঞ্জ ছাড়িয়ে, ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের সীমানা পেরিয়ে যিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, আপোষহীন রাহবার। যিনি ছিলেন একজন সার্বক্ষণিক দ্বায়ী ইল্লাল্লাহ। দাওয়াত ছিলো যাঁর জীবনের মিশন। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দার কবরটিকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উদ্যানে পরিণত করে দিন। আর আমাদেরকেও তাঁর রেখে যাওয়া পথে আমৃত্যু চলার তাওফিক দান করুন। আমীন।।

লেখকঃ সাবেক কেন্দ্রীয় কলেজ কার্যক্রম সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

যে স্মৃতি অম্লান

মোহাম্মদ ইলিয়াস

মকবুল আহমাদ স্যার একজন কিংবদন্তিতুল্য দায়িত্বশীল ছিলেন। তিনি এত সহজে মানুষের আসল নাম ধরে ডাকতে পারতেন, যা অন্য অনেকেই পারতোনা। স্যারের কথা বার্তা আচার-আচরণের মাঝে সহনশীলতা, উদারতা, একনিষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া যেত।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের এক মহান সাধক মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.)। এই মহান মানুষটি আমার নিজ জেলা ফেনীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। ফেনীর মাটি ও মানুষের সাথে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সারা জীবন কাটিয়েছেন একথা ভেবেই আমার মনে প্রচন্ড রকম পুলক অনুভব হয় এজন্য যে, আমিও এই মাটির সন্তান হিসেবে গর্বিত। এই মহান মানুষটির জন্যে আমি ও আমার মাটি সৌভাগ্যবান।

দ্বীনের এই পতাকাবাহীর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৯৫ সালে। আমি তখন ইসলামী ছাত্রশিবিরের একজন সাধারণ কর্মী মাত্র। স্যার তখন ছাগলনাইয়াতে জামায়াতের একটি কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আমি সে সময় শিবিরের মহামায়া ইউনিয়ন সভাপতি হিসেবে জামায়াতের কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত হই। স্যারের সাথে প্রথম দেখায় তিনি অতি আদর-স্নেহ করে মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন- তুমি শিবিরের কি? আমি যখন বললাম "কর্মী" তখন স্যার আমাকে খুব স্নেহের পরশ বুলিয়ে বললেন, তোমাকে সাথী হতে হবে। সে স্যারের একটি কথা আমার উপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। পরবর্তীতে স্যারের দোয়ার বরকতে আমি ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য শপথ থেকে শুরু করে জেলা সভাপতি পর্যন্ত হই।

আমাকে যখন মহান আল্লাহ তা'য়ালা শিবিরের ফেনী জেলা সভাপতি হিসেবে কবুল করেন তখন সালটা ২০০৪। আমি ২০০৪ সালের জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় ফেনীতে একটি সিরাতুন্নবী (স.) এর আয়োজন করতে বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসিরে কোরআন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবকে প্রধান মুফাসসির হিসেবে দাওয়াত করতে বহু চেষ্টা করি। বিভিন্ন দায়িত্বশীলের কাছে ধরনা দিয়ে যখন ব্যর্থ হই তখন এক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলের পরামর্শে মকবুল স্যারের শরনাপন্ন হই। স্যারকে

বললাম, আল্লামা সাঈদী সাহেবকে কোন ভাবেই দাওয়াত কবুল করাতে পারছিনা। হযরতের কোন সিডিউল নাই। আপনি যদি দয়া করে একটু বলেন, সাথে সাথে স্যার আমার সামনেই আল্লামা সাঈদী (হাফে.) কে ল্যান্ড ফোনে কল দিলেন এবং বললেন, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৪ ফেনীতে একটু সময় দেয়া যাবে কিনা? অপরদিক থেকে সাঈদী সাহেব সাথে সাথে ওকে করে দিলেন। স্যার যখন বলেছেন, সাঈদী সাহেব অবশ্যই আসবেন বলে সিডিউল নিলেন। পরবর্তীতে আমি দাওয়াতনামা নিয়ে সরাসরি সাঈদী হুজুরের শহীদবাগের বাসায় দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি এমন একজন মহান দায়িত্বশীলের ফোন আমাকে ধরিয়ে দিয়েছো যার কোন কথায় না বলার সাহস আমার নেই। এই ছিলো আমাদের মকবুল স্যারের ব্যক্তিত্ব। যার ব্যক্তিত্বের কাছে পরাজয় বরণ করেছেন আমাদের মাথার মুকুট আল্লামা সাঈদীও।

২০০৪ সালে একই বছরের স্যার থেকে আরেকটি শিক্ষা পেলাম সময়ের আনুগত্যের ব্যাপারে। ২০০৪ সালের কোন এক সময় স্যার ফেনী এসেছিলেন শাহীন একাডেমীর ট্রাস্টের মিটিংয়ে জয়েন করতে। আমার দায়িত্ব ছিলো জামায়াত অফিস থেকে স্যারকে শাহীন একাডেমী পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। সাথে আরেকজন দায়িত্বশীল ভাইও আমাদের সঙ্গী হওয়ার কথা। আমি স্যারকে নিতে আসলে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সাথে স্যার আমাকে বললেন, চলো আমরা রওয়ানা হই। তখন আমি বললাম স্যার, আপনার সফরসঙ্গী আরেক দায়িত্বশীল ভাই যিনি আসার কথা তিনিতো এখনো পৌঁছাননি। স্যার বললেন, সময় হয়ে গিয়েছে কারো জন্য অপেক্ষা করার সুযোগ নেই। পথিমধ্যে শান্তি মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছালে ঐ দায়িত্বশীল ভাই আমাদের সাথে যোগ দেন। সেদিন সে দায়িত্বশীল ভাই মাত্র ২ মিনিট লেট করেছিলেন। স্যারের কাছে সে ২ মিনিট সময়েরও এতটা ছিলো যে, তিনি সেদিন ২ মিনিটও বিলম্ব করেননি।

স্যারের সাথে আমার পরিবারের একটি স্মৃতি জড়িত। ২০০৮ সালে আমার প্রথম মেয়ের যখন জন্ম হয়। তখন স্যার নিজেই আমার বাসায় গিয়ে নিজে আমার মেয়ের নাম রাখলেন "সামিয়া বিনতে ইলিয়াস"। এটি আমার জন্য ছিলো এক পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

২০০৯ সালে আমি যখন আমার অসুস্থ আম্মাকে নিয়ে ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করাই তখন হাসপাতালের বিশাল অংকের বিল এসেছিলো। স্যারের শরনাপন্ন হই। স্যার সাথে সাথে যথাযথ কর্তপক্ষকে ফোন করে সহযোগিতা করেন। তিনি যে কতটা মহানুভব দয়া পরবশ মানুষ ছিলেন এই ঘটনাগুলো তার একেকটি প্রমাণ বহন করে। শুধু আমি নই, ফেনীর যে কোন মানুষ কোন সমস্যা কিংবা বিপদে পড়ে ঢাকায় স্যারের শরনাপন্ন হয়েছেন

কিন্তু সহযোগিতা পাননি এমন কেউ বলতে পারবেননা।

২০১১ সালে স্যারের সাথে আমার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি কবির আহম্মদ মজুমদারের প্রথম স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ছাগলনাইয়ার মনুরহাট বাজারে, আমি তখন শ্রমিক কল্যাণের ফেনী শহর সভাপতি। স্মরণসভা শেষে আমাদের গ্রামের বাড়ীতে ক্ষুদ্র একটি খাবার আয়োজন ছিলো। স্যারকে খাওয়ার টেবিলে বসালাম আমাদের উঠানে। স্যার আসবেন বলে অনেক আয়োজন করেছিলাম। কিন্তু স্যার এত আয়োজন দেখে আমাকে মৃদু ধমকালেন, কেন এত আয়োজন করেছি? আবার আমাকে দরদ মাখা কণ্ঠে বললেন, "ওই শাকের বাটিটা দাওতো" তিনি এমনিতেই শাক-সবজি বেশী পছন্দ করতেন। সেই দিনও শাক-সবজিই গ্রহণ করলেন পরিমিত মাত্রায়। মকবুল আহমাদ স্যার একজন কিংবদন্তিতূল্য দায়িত্বশীল ছিলেন। তিনি এত সহজে মানুষের আসল নাম ধরে ডাকতে পারতেন, যা অন্য অনেকেই পারতোনা। স্যারের কথা বার্তা আচার আচরণের মাঝে সহনশীলতা, উদারতা, একনিষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া যেত।

এই মহান নেতার সাথে আমার সর্বশেষ সাক্ষাতের সুযোগ হয় ২০১৯ সালের বিদায়ী কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সভা উপলক্ষে। সেদিন স্যারকেসহ মেহমানদের আপ্যায়নের খেদমত করি। খেদমতের সুযোগে স্যারের প্রিয় পাবদা মাছ দিয়েছিলাম। স্যার দুইটা পাবদা মাছ খেয়েছিলেন। আমি যখন দেখলাম স্যার পাবদা মাছ তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছেন তখন আমি আরও একটা মাছ খাওয়ার জন্য স্যারকে অনুরোধ করলাম। স্যার আমার অনুরোধের প্রেক্ষিতে নিজের স্বাভাবিক স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে ৩টা পাবদা মাছ সেদিন খেয়েছিলেন।

স্যারের সাথে শেষ সাক্ষাতে মনে হয়েছিল এই মায়াবী স্মৃতি সারা জীবন অম্লান থাকবে। যে স্মৃতির প্রহর কখনো শেষ হওয়ার নয়। সে মায়াবী মুখের আদুরে ডাকুনি কখনো সমাপ্ত হওয়ার নয়। কিন্তু মহান আল্লাহর ফায়সালা আমাদের রাহবার, আমাদের নেতা, আমাদের মুরুব্বী আমাদেরকে ছেড়ে মহান মনিবের ডাকে ঠিকই সাড়া দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের দায়িত্বশীলকে দুনিয়াতে সম্মানিত করেছেন, যেন আখেরাতে সম্মানের সুউচ্চ স্থানে অবস্থানের সুযোগ করে দেন। আমীন॥

লেখক : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ফেনী জেলার সাবেক সভাপতি, বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী ফেনী শহর শাখার আমীর।

পেয়ে হারানোর হাহাকার

ইন্তেকালের প্রায় এক মাস হতে চললো। এখনো মনে হয় আব্বা যেনো তাঁর চেয়ারে বসে আছেন। অপেক্ষায় আছেন কখন নামাজের জন্য ডাক দিবো। প্রতি শুক্রবারে আব্বার নখ আর মাসে একদিন মাথার চুল কেটে দিতাম। আহ কত যে স্মৃতি আব্বাকে ঘিরে। ভরাট কণ্ঠে আব্বা নোমান, নোমান ডেকে ঘুম ভাঙাতেন নামাজের জন্য। উঠতে দেরী হলেও বিরক্তি প্রকাশ করতেন খুব কমই। কিভাবে এসব ভুলি।

মোহাম্মদ নোমান

আরেকটা রমজান চলে যাচ্ছে। সাধারণত প্রতি বছরেই রমজানের শেষ ১০ দিন আব্বা ইতিকাফ করতেন। আর চাঁদ রাতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বসতেন, আমাদের ব্যক্তিগত আমলের খোঁজ-খবর নিতেন। ২০১১ পর্যন্ত আমাদের ঈদগুলো ছিল আর দশটা সাধারণ পরিবারের মতই আনন্দের। ঈদের দিন আব্বাসহ আমরা ৩ ভাই একত্রে ঈদের নামাযে যেতাম। আর ফেরার পথে আত্মীয়দের বাসা হয়ে ফিরতাম।

২০১০ এ আব্বা ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ২০১১ এর ১৯ সেপ্টেম্বর পল্টনে জামায়াতের মিছিলে পুলিশি হামলাকে কেন্দ্র করে রাতে খবর পাই আব্বাকে গ্রেফতার করতে বাসায় পুলিশ আসছে। সেই রাতেই আমি আব্বাকে নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে যাই। কোনো প্রকার ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ পুরো বাসা তল্লাশি করে। আব্বাকে না পেয়ে আমার ভাইদের শাসিয়ে যায়। শুরু হয় ৭৩ বছরের বয়োঃবৃদ্ধ মানুষটার নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার সংগ্রাম।

পুলিশের হয়রানি থেকে বাঁচতে আব্বাকে বারবার নিজের অবস্থান বদলাতে হত। আব্বার নিরাপত্তার খাতিরে যোগাযোগ হতো কম। এই বয়সে আব্বা

আরেকটা রমজান চলে যাচ্ছে। সাধারণত প্রতি বছরেই রমজানের শেষ ১০ দিন আব্বা ইতিকাফ করতেন। আর চাঁদ রাতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বসতেন, আমাদের ব্যক্তিগত আমলের খোঁজ-খবর নিতেন। ২০১১ পর্যন্ত আমাদের ঈদগুলো ছিল আর দশটা সাধারণ পরিবারের মতই আনন্দের। ঈদের দিন আব্বাসহ আমরা ৩ ভাই একত্রে ঈদের নামাযে যেতাম। আর ফেরার পথে আত্মীয়দের বাসা হয়ে ফিরতাম।

২০১০ এ আব্বা ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ২০১১ এর ১৯ সেপ্টেম্বর পল্টনে জামায়াতের মিছিলে পুলিশি হামলাকে কেন্দ্র করে রাতে খবর পাই আব্বাকে গ্রেফতার করতে বাসায় পুলিশ আসছে। সেই রাতেই আমি আব্বাকে নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে যাই। কোনো প্রকার ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ পুরো বাসা তল্লাশি করে। আব্বাকে না পেয়ে আমার ভাইদের শাসিয়ে যায়। শুরু হয় ৭৩ বছরের বয়োঃবৃদ্ধ মানুষটার নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার সংগ্রাম।

পুলিশের হয়রানি থেকে বাঁচতে আব্বাকে বারবার নিজের অবস্থান বদলাতে হত। আব্বার নিরাপত্তার খাতিরে যোগাযোগ হতো কম। এই বয়সে আব্বা একা কোথায় কিভাবে আছেন সেই দুশ্চিন্তায় প্রথমদিকে প্রচন্ড মানসিক কষ্টে দিন কাটতো আমাদের। তার শরীর ও নিরাপত্তার কথা ভেবে আমরা যতটা শংকিত ছিলাম, তিনি ছিলেন ততটাই নিঃশঙ্ক, আল্লাহর ফায়সালার উপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট।

এরই মাঝে পুলিশের ক্রমাগত চাপের মুখে এবং কিছু পরোক্ষ হয়রানির কারণে মাত্র এক রাতের সিদ্ধান্তে আমরা ভাড়া বাসা ছাড়তে বাধ্য হই। পরিবারের একেক সদস্য একেক আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় নেই। মাস দেড়েক এভাবে চলে। পরে উত্তরাতে বাসা নিয়ে আবারো আম্মাসহ আমরা ৩ ভাই একত্র হলাম।

এভাবে চলে এলো ২০১১ এর কুরবানীর ঈদ। প্রথমবারের মতো আব্বাকে ছাড়া আমরা ৩ ভাই ঈদের নামাজ পড়ে কুরবানী করলাম। আব্বার ঠিকানা যোগাড় করে কুরবানীর গোশত নিয়ে দেখা করতে গেলাম। কিন্তু এই বয়সে পরিবারকে ছেড়ে থাকার যে কষ্ট তার কোনো ছাপ পেলাম না আব্বার কথায়। আমাদেরকে বরং শান্তনা দিয়ে ধৈর্য্য ধরার উপদেশ দিলেন। আহ! মনে হচ্ছে যেনো এইতো সেদিনের কথা।

এর কিছুদিন পরেই মাস্টার্সের জন্য আমার স্টুডেন্ট ভিসা কনফার্ম হয়ে যায়। কানাডা যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকলাম। ফ্লাইটের এক দিন আগে আব্বার সাথে দেখা করতে যাই। খুব শান্ত ভাবেই উপদেশ দিলেন। বারবার মনে করিয়ে দিলেন, দুনিয়াবি সাফল্যের জন্য যেন পেরেশান না হই, দুনিয়ার যেখানেই থাকিনা কেনো সর্বদা যেনো আখিরাতের চিন্তাকেই প্রাধান্য দিই। শরীরচর্চার জন্য পরামর্শ দিলেন। কানাডা যাওয়ার পরে যতবারই আব্বার

সাথে কথা হতো, প্রতিবারই কুরআন, হাদীস আর ইসলামী বইপুস্তক অধ্যয়নের পাশাপাশি শরীরচর্চা আর অমুসলিম ছাত্রদের মাঝে দাওয়াতী কাজের উপদেশ দিতেন। মাস্টার্স সম্পন্ন করে ২০১৪ তে রমজানের কদিন আগে আমি দেশে ফিরে আসি।

২০১১ এর সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী দীর্ঘ ৬ বছর যাদের যাদের বাসায় আব্বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়াদে অবস্থান করেছিলেন, তাঁদের আন্তরিকতার কথা স্মরণ করলে তাঁদের জন্য অন্তর থেকে দোয়া আসে। আব্বার সাথে আমাদের যোগাযোগ হতো ওয়াটসঅ্যাপ বা স্কাইপে। আর মাসে এক বা দু'বার দেখা করতে যেতে পারতাম। তাঁর শারীরিক কষ্টের কথা ভেবে আমরা উদ্বিগ্ন হলেও সাক্ষাতে তিনি এ নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা করতে মানা করতেন। আলহামদুলিল্লাহ, সব সময়ে সর্বাবস্থায় আমরা আব্বাকে আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্টই পেয়েছি। তিনি বরং তাঁর চেয়েও বয়োঃবৃদ্ধ সাবেক আমীরে জামায়াত গোলাম আযম চাচা, মাওলানা এ কে এম ইউসুফ চাচা, মাওলানা আব্দুস সুবহান চাচার জেলবন্দি জীবনের কথা ভেবে কষ্ট পেতেন।

২০১৬ এর রমজানে আব্বা মাইল্ড স্ট্রোক করেন। আমরা সেটা একদিন পরে জানতে পারি। আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বো ভেবে আব্বাই আমাদেরকে খবরটা পৌঁছাতে নিষেধ করেছিলেন। হাসপাতাল থেকে সেহরির পর আব্বা নিজেই আমাকে ফোন দিয়ে সামান্য অসুস্থতার কথা জানালেন। সকালে হাসপাতালে গিয়ে শুনি স্ট্রোক। দীর্ঘ ৫ বছর পর আব্বার সাথে কয়টাদিন একসাথে থাকার সুযোগ পাই হাসপাতালে। সেখানে আব্বা, আম্মাসহ একত্রে ইফতার করি। কিন্তু হাসপাতালে নিজের রাজনৈতিক পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লে নিরাপত্তার স্বার্থে চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রেখেই আব্বাকে হাসপাতাল ত্যাগ করতে হয়।

৩০/৩২ বছর বয়স থেকেই আব্বা ছিলেন ডায়াবেটিক রোগী। তাই খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কঠোরভাবে বিধিনিষেধ মেনে চলতেন। প্রতিদিন ফজরের পরে ১ ঘন্টা হাঁটতেন। চেষ্টা করতেন অফিসেও হেঁটে যেতে। কিন্তু ২০১১ থেকে এক প্রকার আত্মগোপনে থাকায় বাহিরে হাঁটাচলা পুরোটাই বন্ধ হয়ে যায়। এর প্রভাব পড়ে আব্বার শরীরে।

২০১৭ এর ০৯ অক্টোবর জামায়াতের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল (বর্তমান আমীরে জামায়াত) ড: শফিকুর রহমান চাচা, সাবেক এমপি (বর্তমান সেক্রেটারি জেনারেল) মিয়া গোলাম পরোয়ার চাচা ও আরো বেশ কয়েকজন নেতৃবৃন্দসহ আব্বা সাংগঠনিক একটা ঘরোয়া মিটিং থেকে গ্রেফতার হন। এর মাসখানেক পর কাশিমপুর কারাগারে আব্বার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি পাই। প্রতি দু'সপ্তাহ অন্তর জেলগেটে দেখা করতে পারতাম আমরা। সাক্ষাতের সময় আব্বা বেশ পরিপাটি হয়ে আসতেন। এসে নিজের পকেট থেকে আতর বের করে আমাদেরকে লাগিয়ে দিতেন। সবার কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। সাক্ষাতের ৩০ মিনিট যেনো নিমিষেই শেষ হয়ে যেত। ২০/২২ টা মিথ্যা

মামলায় প্রায় ৯ মাস জেল খাটার পর ২০১৮ এর ২০ জুলাই আব্বা জামিনে মুক্ত হন। আব্বাকে সেইবার বাসাতেই নিয়ে আসি। এত বছর পর আব্বার পরিবারের কাছে ফেরা হলো। ৭ বছর পর সেই কুরবানীর ঈদে আমরা তিন ভাই আবার আব্বাকে নিয়ে ঈদের জামায়াতে গেলাম।

২০১৮ এর শেষ দিকে আব্বার বেশ কিছু মেডিকেল ডায়াগনোসিস করা হয়। শারীরিক অনেক জটিলতা ধরা পড়ে। বার্ধক্যও যেনো আব্বার উপর জেঁকে বসে। সাহায্য ছাড়া একা হাঁটাচলা আব্বার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়তে লাগলো।

ছোটবেলায় প্রায়ই ফজরের পরে আব্বার হাত ধরে হাঁটতে যেতাম। এই বেলায় এসে আল্লাহ আমাকে তাউফিক দিলেন আব্বাকে হাত ধরে হাঁটতে নিয়ে যাওয়ার। weekend এর দুইদিন খুব সকালে আফতাবনগরের শেষ মাথায় আব্বাকে নিয়ে হাঁটতে যেতাম। এক হাতে আব্বাকে ধরতাম, আরেক হাতে আব্বার বিশ্রাম নেয়ার টুল। স্মৃতিগুলো এত জীবন্ত!

আমার বহুদিনের স্বপ্ন ছিল আব্বা-আম্মাকে নিয়ে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার। ২০১৯ এ সেই স্বপ্ন পূরণ হয় আলহামদুলিল্লাহ। আব্বাকে wheelchair এ বসিয়ে আম্মাসহ কাবাঘর তাওয়াফের যে সৌভাগ্য আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন সেজন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা সম্ভব নয়।

২০২০ এ করোনার কারণে আমি আর আব্বা ঘরেই ঈদের সালাত আদায় করলাম। মনে আছে, দুজনেই নামাজের মাঝে আর শেষে খুব কেঁদেছিলাম। এখন আরেক রমজান চলছে। আজ বাদে কাল ঈদ। কিন্তু আব্বা নেই। ৭টা বছর বিচ্ছিন্ন থাকার পর আবারো ফিরে পেয়েছিলাম আব্বাকে। কিন্তু তার ৩ বছরের মধ্যেই চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেললাম। কোভিডে আক্রান্ত হয়ে আব্বার যাবতীয় শারীরিক সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। ইন্তেকালের প্রায় এক মাস হতে চললো। এখনো মনে হয় আব্বা যেনো তাঁর চেয়ারে বসে আছেন। অপেক্ষায় আছেন কখন নামাজের জন্য ডাক দিবো। প্রতি শুক্রবারে আব্বার নখ আর মাসে একদিন মাথার চুল কেটে দিতাম। আহ কত যে স্মৃতি আব্বাকে ঘিরে। ভরাট কন্ঠে আব্বা নোমান, নোমান ডেকে ঘুম ভাঙাতেন নামাজের জন্য। উঠতে দেরী হলেও বিরক্তি প্রকাশ করতেন খুব কমই। কিভাবে এসব ভুলি!

আমি জায়নামাজ বিছিয়ে ডাকতাম, আব্বা আসেন। আমার দুই বছরের বাচ্চা মেয়েটাও দৌড়ে গিয়ে বলতো - দাদা মানাজ (নামাজ) পড়তে আসেন । সারাদিন দাদার কাছে আতর দেন, বাদাম দেন - এমন কত আবদার সে করতো। আব্বাও বিরক্ত না হয়ে সব পূরণ করতেন। সবই এখন স্মৃতি!

রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বাইয়ানী সগীরা।

লেখক- মরহুমের ছোট ছেলে।

আমার অনুপ্রেরণা

মোঃ আবুল কালাম

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন, ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু আলা রসুলিহিল আমীন। মরহুম মকবুল আহমদ সাহেব আমার দেখা আদর্শবান মানুষদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ একজন অনুকরণীয় আদর্শ মানুষ। যার চরিত্রে আমি দেখতে পেয়েছিলাম কোমলতা, সরলতা, পরোপকারীতা, মহানুভবতা ও অন্যের দুঃখে ব্যকুল হওয়ার মতো মহান গুনাবলি।

একবার তিনি আমাদের বাসায় এলেন, আমার ছেলে তখন খুব ছোট, তিনি তাকে সালাম দিলেন। এটাই ছিল তার জন্য প্রথম সালাম পাওয়া। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, এতো ছোট বাচ্চাকেও সালাম দিতে হয়? মনে একটা বড় দাগ কাটলো ইসলাম কী শিখায় আর আমরা কোথায় আছি? এ সকল মহান মানুষজন যদি সমাজে না থাকতো তাহলে আমরা ইসলামের সঠিক রূপ খুঁজে পেতাম না। এ ঘটনাটি প্রায় আমার মনে পড়ে।

আরেকবার আমাদের বাসায় খাবার টেবিলে উনার সামনে ড্রাইভারকে বসালেন, তার পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন 'উনার পরিচয় হলো অমুক (তার নাম বললেন), আমি যে গাড়িটা দিয়ে এসেছি উনি ঐ গাড়িটা চালিয়ে এনেছেন।'কীভাবে অধঃস্তনদের সম্মান দিতে হয় ঐ দিন আমি উনার কাছ থেকে শিখেছি।

আরেকবার আমাদের এক ভাইয়ের চাকুরীতে সমস্যা হয়ে গেল। উনি খোঁজ খবর নিয়ে দেখলেন ভাইটি নির্দোষ।তখনই আমাকে ডেকে জোরালোভাবে দায়িত্ব দিলেন আমি যেন যেভাবেই হোক ঐ ভাইয়ের চাকুরীটা রক্ষার ব্যবস্থা করি। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, নিজের জন্যও মানুষ এতো পেরেশান হয়না যা তিনি অন্যের জন্য হয়েছেন।

প্রায় সময়ই দেখতাম কেউ মারা গেলে তার সন্তানেরা কীভাবে চলবে এজন্য তিনি খুব খোঁজ-খবর রাখতেন। বিশেষ করে কারো ছেলে-মেয়ে বড় হলে তাদের বিয়ে ও চাকুরির বিষয় নিয়ে খুব ভাবতেন। এগুলোকে তিনি নিজের দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করতেন।

প্রায় সময়ই তিনি বলতেন সংগঠনের সাথে থাকলেই কাউকে যাচাই-বাছাই ছাড়া বিশ্বাস করতে নেই, যতক্ষণ না তার সাথে লেনদেন বা সফর না করা হয়।এ রকম অসংখ্য স্মৃতি উনার সাথে আমার রয়েছে যার প্রত্যেকটাই শিক্ষণীয়। আমরা একজন মানব দরদী, সকলের অতি আপন আল্লাহর মুখলিছ বান্দাকে হারালাম।

আল্লাহ উনাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন এবং আমাদেরকে উনাদের সুযোগ্য উত্তরসূরী বানিয়ে দ্বীন কায়েমের কাজে অটল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মকবুল আহমাদ ঃ
অনুপম জীবন, অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত

শহীদ উল্লাহ কাইছার

উনার এলাকার কয়েকজন হিন্দু উনার কাছে একটা শালিসে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করলে মকবুল সাহেব বললেন,'আমি ব্যস্ত থাকি আপনারা অন্য কাউকে দিয়ে সমস্যার সমাধান করে নেন।' হিন্দুরা বললেন, 'আপনি থাকতে হবে। এক বছর হলেও আমরা অপেক্ষা করবো।' অবশেষে তিনি সময় দিলেন। বিচারে হিন্দুদের পক্ষে রায় যায়। তিনি যাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন তারা ছিলেন মকবুল সাহেবের পক্ষের লোক। এই হিন্দুরা মকবুল সাহেবের জন্য আজও কেঁদে কেঁদে বুক বাসাচ্ছেন।

মৃত্যু চিরন্তন সত্য জেনেও কারো কারো মৃত্যু আমাদেরকে কষ্ট দেয়। বুকের ভেতরটা যেন কেমন হু হু করে উঠে। হৃদয়ের নিভৃত কোণে এক ধরনের ব্যথা জাগে, আহা! বাংলাদেশের জন্য লোকটির আরো বেঁচে থাকা উচিত ছিল। আমার রাজনৈতিক অভিভাবক মরহুম মকবুল আহমাদ সাহেবের স্মৃতি স্মরণিকার জন্য লিখা পাঠাবার অনুরোধ যখন এসেছে, তখন থেকেই চিন্তা করছিলাম যে, কি লিখা যায়, মকবুল আহমাদ এক নিরলস আদর্শের নাম, এক অনুগত বিপ্লবীর নাম, এক দরদী দায়িত্বশীলের নাম, এক কর্মচঞ্চল নেতার নাম, এক পেরেশান সমাজসেবীর নাম।

আল্লাহর এমন মকবুল বান্দাহর সাথে আমার মেলামেশা বা উঠা বসার তেমন সুযোগ হয়নি। তবুও যে কয়েকটি বিষয় আমার হৃদয়মনে প্রায়ই দাগ কাটে তা লিখবার প্রস্তুতি নিলাম। আমি স্থানীয় আতার্তুক হাইস্কুলের এস.এস.সি পরীক্ষার্থী (১৯৭৪)। মরহুম মকবুল সাহেব আমাকে মক্কা শরীফ থেকে একটি চিঠি লিখলেন, তিনি তখন হজ্জ্ব রত ছিলেন। হজ্জ্বের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন- শহীদ হজ্জ্বে আরো আগে আসা উচিত ছিল। তখন থেকে আমার মাঝে হজ্জ্ব করার একটা আগ্রহ এসে যায়।

তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ এবং ধৈর্যশীল। তৎকালীন ফেনী জেলা আওয়ামীলীগের নেতা জনাব জয়নাল হাজারীর সাথে তিনি জাতীয় সংসদে ভোটের দিন মকবুল সাহেবের বাড়ীর দরজার কেন্দ্রে উনি যখন পৌঁছলেন তখন হাজারী সাহেবের সমর্থকরা উনার গাড়ীতে অতর্কিত হামলা করে গাড়ী ভাংচুর করে। মকবুল সাহেবের সমর্থকরা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উনার অনুমতি চাইলে উনি উত্তরে বলেন, আমি রক্তের উপর দাঁড়িয়ে জাতীয় সংসদে যেতে চাইনা, উনার কত বড় ধৈর্য্য। এ থেকে প্রমাণ হয় উনি কত ধৈর্য্যশীল ছিলেন।

আমি একবার মরহুমকে প্রশ্ন করেছিলাম, জামায়াতে ইসলামী অন্যান্য ইসলামী দলগুলির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়না কেন? উত্তরে তিনি বললেন, জামায়াত অন্য দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করে চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু উনারা ঐক্যে আসেন না, উনারা যা বলেন তা করেন না। আন্দোলনের মাঝখানে সরকারের সাথে আঁতাত করে ফেলেন। আজকের এই সময় উনার কথাই দেশের জনগণ সত্য বলে প্রমাণ পেলেন।

উনি ছিলেন একজন ন্যায় বিচারক। একবার ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ীতে এসেছিলেন। উনার এলাকার কয়েকজন হিন্দু উনার কাছে একটা শালিসে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করলে মকবুল সাহেব বললেন,'আমি ব্যস্ত থাকি আপনারা অন্য কাউকে দিয়ে সমস্যার সমাধান করে নেন।' হিন্দুরা বললেন, 'আপনি থাকতে হবে। এক বছর হলেও আমরা অপেক্ষা করবো।' অবশেষে তিনি সময় দিলেন। বিচারে হিন্দুদের পক্ষে রায় যায়। তিনি যাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন তারা ছিলেন মকবুল সাহেবের পক্ষের লোক। এই হিন্দুরা মকবুল সাহেবের জন্য আজও কেঁদে কেঁদে বুক বাসাচ্ছেন।

আমি ফেনী পলিটেকনিক থেকে ক্লাস শেষ করে মেসে এসেই খবর পেলাম শহর অফিসে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি অফিসে গিয়ে দেখি জনাব মকবুল সাহেব, আনোয়ার ভাই এবং সামছু ভাই সেখানে বসা। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি সিলেট যেতে পারবে? আমি যদিও নতুন সাহস করে বলে ফেললাম,'ইন্‌শাআল্লাহ পারবো।' উনি বললেন, 'সিলেটে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবের মাহফিলের পোস্টার নিয়ে যেতে হবে। সেখানে অধ্যাপক ফজলুর রহমান সাহেব তোমার থেকে এগুলি বুঝে নিবেন।' ঠিকমত ঠিক সময় সিলেট দরগা গেইটে পৌঁছে গেলাম। ফজলুর রহমান সাহেব আগে থেকে অপেক্ষা করছেন, পোস্টার বুঝিয়ে দিয়ে উনার বাসায় খেয়ে আবার ট্রেনে চলে এলাম ফেনীতে।

সময় সাল মনে নেই একবার মরহুম মকবুল আহমাদ সাহেব উনার শ্বশুর বাড়ী লক্ষ্মীপুর যাবেন আমাকেও সাথে নিয়ে গেলেন। আসা যাওয়ার পথে সংগঠন, ইসলাম, দাওয়াত, সম-সাময়িক অবস্থা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। শশুর বাড়ীর খাওয়া দাওয়া, এলাকার মানুষের সাথে সাক্ষাত, উনার মিষ্টি হাসি আজও স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে।

আমরা ঢাকাতে বাসা নিয়ে স্বপরিবারে চলে গেলাম। জনাব মকবুল সাহেব

আমাদের অভিবাবক হিসেবে কাজ করেছেন। বিশেষ করে ছেলে মেয়েদেরকে সংগঠনে অন্তর্ভূক্তির জন্য স্থানীয় ভাই বোনদেরকে উৎসাহিত করেছেন। আমার সহধর্মীনিকে রোকন করার বিষয়ে বোনদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন। আল্লাহর রহমতে অল্প সময়ে রোকন হয়ে ঢাকা শহরে দায়িত্বও পালন করেছেন। আমি একবার নিউইয়র্ক থেকে দেশে গিয়েছিলাম জনাব মকবুল সাহেবকে দাওয়াত দিয়েছিলাম ঢাকার ইষ্টার্ণ পয়েন্ট এর বাসায়। সাথে ছিলেন শিবিরের সাবেক ৪জন কেন্দ্রীয় সভাপতি। দুই ঘন্টাব্যাপী উনার সাথে থেকে কত যে আনন্দ পেয়েছি তা বুঝানো যাবে না।

আমাদের এলাকায় কে কোন দল করে উনার কাছে এই পরিচয় ছিলনা। উনি সাধ্যানুযায়ী সকলকে সহযোগিতা করতেন। আমি জাসদ ছাত্রলীগ করতাম, তখন ফেনীতে ছিলাম পত্রিকা পড়ার অভ্যাস ছিল বেশী। কাজী জাফর সাহেব উনার পত্রিকায় মকবুল সাহেবের বিরুদ্ধে লিখেছেন উনি স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন, মকবুল সাহেব সাথে সাথে ১০ কোটি টাকার মানহানী মামলা করে দিলেন। পরের সপ্তাহ পত্রিকার সম্পাদক ক্ষমা চেয়ে নিউজ করলেন। ঠিক এ রকমই উনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপরাধ মামলা করলেও স্বাক্ষীর অভাবে এর তদন্ত কর্মকর্তার এলাকা ঘুরে তেমন কিছু না পেয়ে হতাশ হয়ে চলে গেলেন, সরকারও উনাকে জামীন দিতে বাধ্য হলেন।

মকবুল সাহেবের বর্ণাঢ্য জীবন থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে, উনার মত আমাদেরকেও জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে হবে। আমাদের মধ্যেও আমরা যারা সংগঠনের আদর্শ বিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত আছি তা পরিহার করে সংগঠনের আদর্শ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে। আর একটা কথা না লিখলে নয়, মরহুম মকবুল আহমাদ সাদাসিদা জীবন কাটাতেন। দলের আমির অথচ ঢাকাতে বাড়ী নেই। উনার আমানতদারী একটা দলিল হিসেবে সংগঠনের সকল স্তরের ভাইদের নিকট স্মৃতি হয়ে থাকবে। মকবুল সাহেবের জানাযায় লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতি প্রমাণ করে উনি যে কত জনপ্রিয় নেতা এবং দেশ প্রেমিক ছিলেন। উনার জানাযায় সকল রাজনৈতিক দলের নেতারা যে বক্তব্য রেখেছেন তা প্রমাণ করে। আল্লাহ আমাদের সকলের এই প্রিয় নেতাকে আখেরাতে সুন্দর একটা ঘর বানিয়ে দিও, আমীন।

শহীদ উল্লাহ কাইছার (সাংবাদিক), সাবেক সভাপতি, দাগনভূঁঞা সমিতি, নিউইয়র্ক। সাংবাদিক, বাংলাদেশ প্রতিদিন, নিউইয়র্ক সংস্করণ।

একজন সফল রাহবার

মরহুম মকবুল আহমাদ স্যার এমনই একজন আদর্শ রাহবার ছিলেন যার ইচ্ছাশক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি, প্রবল বাসনা, উচ্চাশা ও নির্ভিক সাহস সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা, বীরত্ব সহনশীলতা, পরিশ্রম প্রিয়তা, সতর্কতা, দূরদৃষ্টি ও অন্তরদৃষ্টি, বোধশক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং তদানুযায়ী ব্যক্তি ও দলকে ঢেলে সাজানো বা গঠন ও অনুকূল কর্মনীতি গ্রহণ করার যোগ্যতাসম্পন্ন এক অনন্য আঁধার। হৃদয়াবেগ ইচ্ছাবাসনা, স্বপ্নসাধ ও উত্তেজনায় সংযমশক্তি এবং সর্বশ্রেণীর মানুষকে আকৃষ্ট করা, তাদের হৃদয়মনে প্রভাব বিস্তার করা ও তাদেরকে সঠিক পন্থায় পরিচালিত করার দুর্বার বিচক্ষনতা যার মধ্যে সর্বদা বিরাজমান ছিলো।

কেফায়েত উল্লাহ ভূঁঞা

আদর্শের মাধ্যমে সমাজে ও জগতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন এমন ক্ষণজন্মা লোক পৃথিবীতে খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়, যারা নিজের কর্মের মাধ্যমে অনুপ্রেরণার উৎস হন। মরহুম মকবুল আহমাদ স্যার তাদেরই একজন, যিনি সবার সর্বত্র ও সর্বক্ষেত্রে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

মরহুম মকবুল স্যার ছিলেন প্রাণবন্ত, উজ্জীবিত এক ব্যক্তিসত্ত্বা যার চেহারায় ও আচরণে পরিলক্ষিত হয়নি মলিনতা, বিষাদ ও নিরাশার ছায়া। আন্দোলনের ক্ষেত্রে উত্থান-পতন, শহীদি মিছিলের সারি, হাজারো নির্যাতনের স্টীমরোলার যখন চলমান, অত্যাচার জুলুম শোষণ ও নিপীড়ন নিষ্পেষণের সয়লাব যখন কানায় কানায়, তখনও তিনি ছিলেন অটল এক পাহাড়ের মত। সব কিছুরই মোকাবেলা করেছেন সাহস, হিম্মত, হিকমাহ ও প্রজ্ঞা আর সম্পূর্ণভাবে মহান আল্লাহর উপর আস্থাশীল থেকে।

কর্মজীবন, আন্দোলন জীবনের সবকটি অধ্যায়ে তাঁর ছিল এক দূর্বার গতি। আলস্য বা কর্মহীনতা কখনো তাঁকে হার মানাতে পারেনি। কর্মের দূর্বার গতি ও গতিশীল নেতৃত্ব তাঁকে করে তুলেছিলো মহীয়ান। ব্যক্তিগতভাবে মানুষের বিপদে এগিয়ে যাওয়া, খোঁজ-খবর নেয়ার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন এক অবিরল

ব্যক্তিত্ব। গভীর আন্তরিকতা নিয়ে অন্য ভাইদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান জানা ও সংকট নিরসনে চালিয়েছেন অগ্রণী প্রচেষ্টা, দিয়েছেন বাস্তব উপযোগী পরামর্শ।

মরহুম মকবুল আহমাদ স্যার ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের একজন বড়মাপের অনুসরণীয় অনুকরণীয় রাহবার, তিনি ছিলেন প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী খোলা মনের মানুষ, যিনি অতি সহজেই মানুষেকে কাজে টেনে আপন করতে পারতেন। তাঁর সহজ সরল জীবন ছিলো অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

মোবাইল না থাকলেও ব্যক্তিগত ডায়রীতে লিখে রাখতেন তৃণমূল পর্যায়ের সেই সংগ্রামী জীবনের সহকর্মী, বন্ধু ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের মোবাইল নাম্বার। মাঝে মাঝে খবরা-খবর নিতেন। যার তুলনা বিরল। সত্যই তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন হৃদয় দিয়ে, উপকার করতেন মনের গভীরতা দিয়ে।

বহুবার মরহুমের সাথে আমার সাক্ষৎ করায় অনেক বিষয় বলার সুযোগ হয়েছে। বিশেষ করে আশি দশকের শেষের দিকে একবার গিয়ে উনার সাথে দেখা করলাম ফালাহ-ই-আম ট্রাস্টের অফিসে। উনি দেখেই কেমন আছো, কখন এসেছ কিভাবে এসেছ, কি কাজ কর, তোমার ছেলে মেয়ে পরিবার কে কেমন আছে? ছেলে মেয়েরা কি সংগঠন করে? অমুক অমুক কেমন আছে? তাদের খবরা-খবর রাখো কিনা? তাদের পরিবারের কি অবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি খবরা-খবর মনে হলো যেনো এক ঝলকে বিশাল এক তথ্যের ভাণ্ডার নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ। তারপর মসজিদে যোহরের সালাত আদায় করে হেঁটে যেতে লাগলেন বাসার দিকে। পথে ভ্যানগাড়ি দেখে ডেকে ১০০ গ্রাম আমলকি ক্রয় করে আমাকে দিলেন ৩টা আর বললেন, তুমি ৩টা খাও আমি ৩টা খাই, নিয়ে গেলেন বাসায় দুপুরের খাওয়া শেষে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে আমাকে বিদায় দিলেন হাসিমুখে হৃদয়ভরা দোয়া দিয়ে।

পরে একবার গেলাম ব্যক্তিগতভাবে আমার চাকুরির জন্য। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি কি টাঙ্গাইল যাইবা?" আমি রাজী হওয়ার পর আমাকে পাঠালেন বাংলাবাজার জনাব বদলে আলম স্যারের কাছে। সেখানে গিয়ে জনাব বদরে আলম স্যারের সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাকে পাঠালেন ফার্ম গেইটে রাইস রিসার্স ইন্সটিটিউটে (ধান গবেষণা)। সেখানে তারা ২দিন ট্রেনিং দিয়ে ১০জনের টিম পাঠিয়ে দিলেন টাঙ্গাইল। সেখানে ৩মাস বিভিন্ন রকমের ধান উৎপাদন সার্বে করেছি। তারপর যোগদান করলাম শাহীন একাডেমীতে। আন্তরিক ভালোবাসা পরোপকারের মানবিকতা থাকার কারণেই তিনি সবার কাছে একান্ত আপনজন কল্যাণকামী।

মরহুম মকবুল আহমাদ স্যার ১৯৭০সালে, ১৯৮৬ সালে এবং ১৯৯১ সালে ফেনী ২নং আসনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯৭১ সালে মরহুম মকবুল আহমাদ স্যার কারো কোন ক্ষতি করেছেন এমন কোন তথ্য সার্চ কমিটি গঠন করেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বরং তথ্য রয়েছে তিনি যথাসাধ্য মানুষের উপকার করেছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন হাজারী সাহেব লাইভে বলেছেন "তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে কোন অভিযোগ রয়েছে বলে এমন কোন তথ্য নেই বরং তিনি মানুষের উপকার করেছেন মর্মে তথ্য রয়েছে" রাজনৈতিক শিষ্টাচার আচার আচরণে কথা বার্তায় অভদ্র অশালীন ছিলেন এমন কোন কথাও কেহ বলতে পারেননি। যাদের সাথে উনার রাজনৈতিক মত পার্থক্য রয়েছে তারাও স্বীকার করেছেন যে মরহুম মকবুল আহমাদ স্যার একজন ভদ্র, নম্র, সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর নিজ গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলায় সর্বমহলে খবর নিয়ে জানা গেলো ১৯৭১ সালে উনি কারো কোন ক্ষতি করেছেন এমন কোন তথ্য নেই। যার কারণে সকলের কাছেই তিনি ছিলেন অতিপ্রিয় ভদ্র, নম্র, মিশুক ও পরোপকারী একজন মহৎ মানুষ। লকডাউনের মধ্যেও তাঁর জানাযায় লাখো মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, তিনি নির্দোষ, সৎ, মানবদরদী একজন মহৎ মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে একজন আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করবেন এমনটাই সকলের তামান্না।

"দুনিয়ার জীবনের সুখ-সুবিধাকে যারা আখিরাতের বিনিময় বিক্রি করে দিতে পারে, শুধু তারাই দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করার যোগ্য" সূরা নিসার ৭৪ নং আয়াতের আলোকে মরহুম মকবুল আহমাদ স্যার দুনিয়ার যাবতীয় সুখ-সুবিধা, ভোগবিলাস, বাড়ী-গাড়ীকে প্রাধান্য না দিয়ে শুধুমাত্র আখিরাতের জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। উনার ছিলনা বাড়ী-গাড়ী, অট্টালিকা প্রাসাদ, ছিলোনা ব্যাংক ব্যালেন্স। ছিল শুধু নেক কর্মের বিশাল খতিয়ান আর আখিরাতের পুঁজি। তাই তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের দায়ী ইলাল্লাহ। তিনি ছিলেন একজন সংগ্রামী ত্যাগী নেতা এবং একজন আদর্শ রাহবার। "যে ব্যক্তি নিজের নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান" উক্ত হাদীসের আলোকে মরহুম মকবুল আহমাদ স্যার ছিলেন সত্যিকারের বুদ্ধিমান যিনি সর্বদা কাজ করেছেন আখিরাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে। যিনি পুরো জীবন অতিবাহিত করেছেন একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার রেজামন্দি তথা সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, আখিরাতের মুক্তি এবং জান্নাত অর্জনের জন্য।

"তুমি রবের পথে হিকমাহ ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করো" সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে উল্লেখিত একজন দা'য়ী ইলাল্লাহর গুণাবলীগুলো মরহুম মকবুল আহমাদ স্যারের আন্দোলন ও সংগ্রামী জীবনে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। দ্বীন প্রচারের মূলনীতি হিকমাহ। সদুপদেশ ও নম্রতার উপর ভিত্তিশীল স্থান-কাল পাত্রভেদে যে পদ্ধতি অবলম্বন করলে মানুষ বুঝতে সহজ হবে, উপযোগী

হবে, মানুষ গ্রহণ করবে সেই পন্থায় তিনি দাওয়াত দিয়ে গেছেন নিয়মিত। তাই তিনি সত্যিকারের একজন দা'য়ী ইলাল্লাহ। মহান আল্লাহ তাঁর খেদমত কবুল করুন। তিনি ছিলেন সদালাপী, মিষ্টিভাষী, উপদেশদাতা, হিতাকাংখী ও সকলের যেন আপনজন।

"অত:পর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়তো"- সূরা আল ইমরানের ১৫৯ নং আয়াতের গুনাবলীগুলো মরহুম মকবুল আহমাদ স্যারের আচার-আচরণে স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হয়েছে। তিনি ছিলেন ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষার এক অতল মহাসাগর। দু:খ-কষ্ট, বিপদ, মুসিবতের মুখোমুখী হয়েও তাঁর মোকাবেলা করে স্থিতিলাভের এক অনন্য শক্তির উদাহরণ আমাদের প্রিয় মরহুম মকবুল আহমাদ স্যার।

মরহুম মকবুল আহমাদ স্যার এমনই একজন আদর্শ রাহবার ছিলেন যার ইচ্ছাশক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি, প্রবল বাসনা, উচ্চাশা ও নির্ভিক সাহস সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা, বীরত্ব সহনশীলতা, পরিশ্রম প্রিয়তা, সতর্কতা, দূরদৃষ্টি ও অন্তরদৃষ্টি, বোধশক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং তদানুযায়ী ব্যক্তি ও দলকে ঢেলে সাজানো বা গঠন ও অনুকূল কর্মনীতি গ্রহণ করার যোগ্যতাসম্পন্ন এক অনন্য আধার। হৃদয়াবেগ ইচ্ছাবাসনা, স্বপ্নসাধ ও উত্তেজনায় সংযমশক্তি এবং সর্বশ্রেণীর মানুষকে আকৃষ্ট করা, তাদের হৃদয়মনে প্রভাব বিস্তার করা ও তাদেরকে সঠিক পন্থায় পরিচালিত করার দুর্বার বিচক্ষনতা যার মধ্যে সর্বদা বিরাজমান ছিলো। তিনি আমাদের মরহুম মকবুল আহমাদ স্যার।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা উনার সকল নেক আমলগুলো কবুল করে উনাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুক। আমীন॥

লেখক : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ফেনী মহকুমার সাবেক সভাপতি, বর্তমানে শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজের সিনিয়র শিক্ষক এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ফেনী জেলার সহ. সভাপতি।

একজন দায়ী ইলাল্লাহ

গাজী ছানেহ উদ্দীন

তিনি বক্তৃতার চাইতে বাস্তব আমলের মাধ্যমে মানুষদেরকে দ্বীনের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতেন। তিনি কথা শুনতেন আগ্রহের সাথে। একেবারে সাধারণ মানুষও উনার সামনে কথা বলতে পারতেন সাবলীলভাবে। মানুষের কথা শুনার ব্যাপারে উনার অভাবনীয় ধৈর্য আমাদেরকে মুগ্ধ করতো। এরপর সহজ কথ য়য় সুন্দর সমাধান করে দিতেন। কেউ কোন আবেদন জানালে সাধ্যমত চেষ্টা করতেন। উপস্থিত সমাধান দেয়া সম্ভব না হলে পরবর্তীতে মনে রাখতেন, উপেক্ষা করতেন না।

মরহুম মকবুল আহমাদ ছিলেন একজন অনুকরণীয় ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন সংগঠক একজন দায়িত্বশীল একজন রাজনীতিক। তাঁর আরেকটা বড় পরিচয় হলো তিনি ছিলেন একজন দায়ী ইলাল্লাহ। তিনি অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় ইসলামের সুমহান আদর্শ মানুষের কাছে তুলে ধরতেন।

এলাকায় সফরে এলে নিকটাত্মীয় এমনকি দূরবর্তী আত্মীয়দের বাড়িতেও যেতেন। সকলের খোঁজ খবর নিতেন। তাঁর গাড়ির পেছনে ছোট ছোট ফলের প্যাকেট থাকতো। এগুলো তিনি আত্মীয় পরিজনদের বাড়িতে সাধ্যমত বিতরণ করার চেষ্টা করতেন। তাঁর গাড়িতে বিতরণযোগ্য অনেকগুলো দাওয়াতি বই থাকতো। এসকল বই তিনি সাধারণ মানুষসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মধ্যে বিতরণ করতেন। উনার ডায়েরিতে পরিচিতদের মোবাইল নাম্বার লেখা থাকতো। বাই রোটেশন তিনি অনেকের সাথে যোগাযোগ করতেন এবং বিস্তারিত খোঁজ খবর নিতেন। সাংগঠনিক মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে কার কি সমস্যা তা বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করতেন এবং সমস্যা সমাধানে কার্যকর পরামর্শ দিতেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও অনেকবার উনার ফোন পেয়েছিলাম। বিশেষ করে আমার ওয়াইফ রুকন হওয়ার ব্যাপারে উনার পরোক্ষ অবদান ছিল। সেই সময়ে তিনি আমার চাচাতো ভাই মানসুরের মাধ্যমে

আমার ওয়াইফের জন্যে সিলেবাসের কিছু বইও পাঠিয়েছিলেন যা ছিল আমাদের জন্যে বিরাট পাওনা। উল্লেখ্য মানসুর ছিলেন উনার দূর সম্পর্কের নাতি - সেই সুবাদে তিনি আমাদের বাড়িতে কয়েকবার গিয়েছিলেন। মানসুরের বাবা মারা যাবার পর তাদের দুই ভাইয়ের জন্য চাকরির ব্যবস্থাও করেছিলেন। আমার জানা মতো এরকম অনেকেরই জন্য উনি সাধ্যমত ছোট খাট কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

নোয়াখালী লক্ষীপুর সফরের প্রাক্কালে প্রায়শই উনি দাগনভূঞাতে যাত্রা বিরতি করতেন। সাথে স্থানীয় সংগঠনের সাথে সমন্বয় করে দাওয়াতি প্রোগ্রাম হাতে নিতেন। কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর থাকাকালীন সময়ে দাগনভূঞাতে তিনি এরকম

অনেকগুলো প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন- যা আমাদের জন্য ছিল সৌভাগ্যের ব্যপার। একশ দুশো জনের উপস্থিতি এমনকি বিশ পঞ্চাশজনের উপস্থিতিতেও উনি আমাদের প্রোগ্রামে মেহমান থাকতেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। উপস্থিতি কম বা বেশি হওয়ার ব্যপারে উনি কোন কিছু বলতেন না।

বিয়ে শাদী বা স্থানীয় সামাজিক অনুষ্ঠানে উনি যোগ দেয়ার চেষ্টা করতেন। ব্যস্ততার কারণে কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দিতে না পারলে তিনি যথাসম্ভব খোঁজ খবর নিতেন এবং ছোট খাট উপহার সামগ্রী পৌঁছে দিতেন। উপহারের মাঝে বই থাকতো অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে।

সহজ সরল ভাষা :

তার বক্তৃতার ভাষা ছিল সহজ সরল। তাঁর বক্তব্যে কোন তত্ত্বকথার কচকচানি ছিলো না, ছিলো না কোটেশনের হৃদ্ধতা। তবুও তাঁর বক্তব্য শুনে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তিনি যেন পৌঁছে যেতেন শ্রোতাদের মনের গভীরে। তাঁর বক্তৃতা শুনে কারো কারো জীবনে আমূল পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। তিনি খুব আন্তরিকভাবে ব্যক্তি জীবনের খুটিনাটি সমস্যাগুলো তুলে ধরতেন এবং সেসবের একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান দিতেন। উনার কথার শব্দমালা ছিল মণিমুক্তার মতো - শ্রোতারা প্রতিটি শব্দ আলাদা করে নিতে পারতো। বক্তৃতাকালে তিনি খুব সাদামাটা ভাবে কথা বলতেন। তিনি কথা বলতেন ধীরে ধীরে সাবলীলভাবে। সহজ কথাগুলো মনের গভীরে রেখাপাত করতো। সহজ সরল ভাষার ভেতর অনেক ব্যপক অর্থ ধারণ করতো।

সাধাসিধা জীবন যাপন :

তাঁর খাওয়া দাওয়া পোষাক-আশাক চাল-চলন ছিলো অত্যন্ত সাদামাটা। তিনি জাঁক-যমক পছন্দ করতেন না। তিনি ঢাকা শহরে একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন এবং সেই বাসায় প্রয়োজনাতিরিক্ত তেমন কিছুই ছিলো না। তাঁর গ্রামের বাড়ি আরো সাধারণ সেখানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। এছাড়াও কেন্দ্রীয়

অফিসে মুড়ি টোস্ট এবং রং চায়ের আপ্যায়নের কথা অনেকের মুখেই শুনেছি। বড় কোন সমাবেশে উনাকে সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করা যেত না। বাস্তবিকই উনাকে দেখলে সাহাবায়ে কিরামের কথা মনে পড়ে যেত।

তিনি শুনতেন বেশি বলতেন কম :

বক্তৃতার মঞ্চে তিনি শ্রোতাদের কথা শুনার চেষ্টা করতেন। তাঁর প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল খুবই আকর্ষনীয়। অল্প কথায় এত সুন্দর সমাধান করে দিতেন যাতে করে শ্রোতাদের মন ভরে যেতো। তিনি শ্রোতাদের মনের গভীরে পৌঁছে যেতেন। সময়ের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত যত্নশীল। যথাসময়ে শুরু এবং যথাসময়ে শেষ করার ব্যপারে তিনি খুবই আন্তরিক ছিলেন।

তিনি বক্তৃতার চাইতে বাস্তব আমলের মাধ্যমে মানুষদেরকে দীনের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতেন। তিনি কথা শুনতেন আগ্রহের সাথে। একেবারে সাধারণ মানুষও উনার সামনে কথা বলতে পারতেন সাবলীলভাবে। মানুষের কথা শুনার ব্যাপারে উনার অভাবনীয় ধৈর্য আমাদেরকে মুগ্ধ করতো। এরপর সহজ কথায় সুন্দর সমাধান করে দিতেন। কেউ কোন আবেদন জানালে সাধ্যমত চেষ্টা করতেন। উপস্থিত সমাধান দেয়া সম্ভব না হলে পরবর্তীতে মনে রাখতেন, উপেক্ষা করতেন না।

কাজের তদারকি :

তিনি কাউকে কোন দায়িত্ব দিয়ে তদারক করতেন। স্মরণ করিয়ে দিতেন আন্তরিকতার সাথে। ছোট খাট কোন বিষয়ও তাঁর দৃষ্টি এড়াতো না। উনি নির্দেশ দিতেন না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উনি অনুরোধের সুরে কথা বলতেন। উনার অনুরোধও সহকর্মীদের কাছে নির্দেশ বলে মনে হতো।

নিরলস কর্মী :

তিনি সবসময় কর্মে নিমগ্ন থাকতেন। তিনি ছিলেন ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের একজন নিরলস কর্মী। তিনি একটানা কাজ করতেন। ঘুরে বেড়িয়েছেন সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। কাজে কোন অনিহা দেখিনি উনার। এ মহান ব্যক্তির চির বিদায়ে সংগঠন হারালো একজন নিরলস নির্মোহ কর্মবীরকে- যার অভাব অতি সহজে পূর্ণ হবার নয়।

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে উনার জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বাস্তব জীবনে কাজে লাগানোর তাওফিক দান করুন আমীন।

লেখক- আমীর, দাগনভূঞা উপজেলা, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

আমার প্রিয় নানা ভাই

আমি সম্ভবত তার খেদমত যথাযথ ভাবে করতে পারিনি। আমার সাথে তার কোন লেনদেনের সম্পর্ক ছিল না। যতটুকু দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি আমাকে দিতেন তা পালন করার চেষ্টা করতাম। আমি জানিনা আমার সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছি কিনা? আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন এবং মরহুম মকবুল আহমাদ নানা ভাইকে ক্ষমা করুন।

মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন

শুধু একজনকে সবচেয়ে কাছের মানুষ হিসেবে দেখেছি তিনি মরহুম মকবুল আহমদ। তাঁর মৃত্যু পহেলা রমজান- ১৪৪২ হিজরী। তাঁর সাথে প্রথম পরিচয় হয় ১৯৯১ইং সালে। তখন তিনি সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক। চট্টগ্রাম মহানগরী আমীর মরহুম মাওলানা আবু তাহের ভাই জানালেন যে, কেন্দ্র থেকে দায়িত্বশীল আপনার সাথে দেখা করবেন রুকনীয়তের জন্য প্রশ্ন করবেন। এর আগে তৎকালীন চট্টগ্রাম মহানগরীর রুকনীয়াত বিভাগের দায়িত্বশীল বিআইএ মসজিদের খতীব আব্দুল হালীম ভাই সাক্ষাৎকার নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে সন্তুষ্ট হওয়ার পর, মাওলানা তাহের ভাই (ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি) সাক্ষাৎকার নেন। তিনিও সন্তুষ্ট হওয়ার পর কেন্দ্রীয় যোগাযোগের জন্য ব্যবস্থা করেন। এ সূত্রেই তাঁর সাথে সাক্ষাত ও পরিচয়।

সেদিন একজন নূরানী চেহারার খুবই আকর্ষণীয় মানুষকে দেখে খুবই ভালো লাগল। তিনি প্রথমেই ব্যক্তিগত তথ্যাদি জানলেন, হালাল-হারাম, আয়-ব্যয়, ইসলামের বিভিন্ন প্রশ্ন করার পর, জানতে চাইলেন বিয়ে করেছি কিনা? আমি বললাম,'না'। তিনি বললেন,'কেন?' আমি বললাম আমার বড় ভাই বিয়ে করেনি এবং আমার ছোট বোনের বিয়েও বাকী। তিনি বললেন,'তোমার বিয়ের ক্ষেত্রে এগুলো কোন শর্ত?' আমি বললাম,'না', তবে সামাজিক বিষয়।' আমি বললাম, 'আপনি উপযুক্ত পাত্রী দেখুন।' এরপরে আল হামদুলিল্লাহ আমার রুকুনিয়াত মঞ্জুর করা হয়।

এই সূত্র ধরে তাঁর সাথে মগবাজার কেন্দ্রীয় অফিসে মাঝে মাঝে সময়

সুযোগ থাকলেই দেখা করতাম। তারপর ছোট বোনের বিয়ে দিলাম। মেঝ ভাইয়ের বিয়ে করালাম।

এরপর আমার পালা। আম্মা ও বোনেরা পাত্রী দেখা শুরু করলেন। তখন মতিউর রহমান আকন্দ ভাই (শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি), বুলবুল ভাই (শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি) তাদেরও বিয়ের কথা চলছে। আম্মাকে আমি শুধু একটি শর্ত দিলাম- মেয়ে হিজাব পরতে হবে এবং ইসলামের পাবন্দ হতে হবে। এই শর্তে সবাই আটকে গেলেন। বুয়েটের ছাত্রী, ঢাকা বাড়ি গাড়ী, সুন্দরী ইত্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু আমার শর্তের কারণে আম্মা হাল ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'তোমার বিয়ে তুমিই দেখ। আমরা পেলাম না।'

তারপর আবারো মকবুল সাহেবের সাথে বিয়ের বিষয়ে দেখা করলাম। ঘটনাক্রমে দেখা হলে মরহুম মুজাহিদ (সেক্রেটারী জেনারেল) ভাইয়ের সাথে কথা হয়। তিনি বললেন, 'আমার একটি শর্ত আছে। তোমার বিয়ের ব্যাপারে কোন শর্ত থাকবে না। আমি তোমাকে যা বলব সেটাতেই রাজী হতে হবে। তাহলে আমি দেখতে পারি।' কিন্তু আমি বিষয়টি খুব একটা বুঝতে পারিনি? তার সাথে পরিচয় হয় সিংঙ্গাপুরে যাওয়ার সময়। তিনি যাচ্ছিলেন জাপানে এবং আমি যাচ্ছিলাম সিংঙ্গাপুরে।

তারপর কথা মকবুল আহমাদ সাহেবের সাথে। তিনি আমাকে তিনটি প্রস্তাব দিলেন। প্রথম জনের বায়োডাটা দেখে হিসাব করলাম তার থেকে আমি মাত্র এক বছরের বড়, তাই সেটা বাদ দেয়া হলো। দ্বিতীয়টি আমাদের পছন্দ হলো। বায়োডাটা দেখা, ছেলে ও মেয়েদের আলোচনার পর পরবর্তীতে এটাই ঠিক হলো। আমার বিয়ের পর একটি নতুন পরিচয় হলো যিনি আমার বিয়ের ঘটক তিনি মেয়ের সম্পর্কে নানা। আমার শ্বশুর বাড়ী এবং নানা ভাই (মকবুল আহমদ) এর বাড়ী পাশাপাশি। সে সুবাধে আমি পেলাম একজন নানা (মুরব্বী) এবং পথ প্রদর্শক। সাংগঠনিক সম্পর্কের সাথে সাথে আত্মীয়তার সুযোগ হওয়ায় তার সাথে যোগাযোগ এবং বন্ধুত্ব দিনে দিনে অনেক বাড়তে থাকলো। এই সুযোগ আমার জীবনের একটি বড় পাওনা।

এই সুযোগ আরো বাড়লো যখন আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ভাই গ্রেফতার হলেন। সরকারের নজরদারী ও হয়রানীর কারণে যখন দায়িত্বশীলদের বাড়ীতে অবস্থান করা সম্ভব হচ্ছিল না। তখন নানা ভাই আমার সাথে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি তখন ছিলেন আমার মেহমান, তিনি ছিলেন একাধারে আমার গাইডারও। আর আমি তখন তার একান্ত সহচর। প্রায় দশ বছর পর্যন্ত তিনি আমার সাথে ছিলেন। যখন যেখানে যেতে হতো তখন প্রায় সব সময় আমার সাথে তিনি ছিলেন। আমার ছেলে মেয়েও তাকে খুব আদর করতেন। সম্ভবত তাঁর কারণে ছেলে মেয়েরা তাদের আত্মীয় স্বজনের অভাবটা কিছুটা পূরণ করতে পারল। অনেক সময় আমার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে তাঁর সাথে বিভিন্ন জায়গায় যেতেন। নানা ভাই আমাকে,

আমার ছেলে মেয়েদেরকে সব সময় বিভিন্ন ধরনের জামা কাপড়, টুপি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি হাদিয়া দিতেন। কিন্তু আমি তাকে খুব কমই দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আমি দিলেও প্রায় সময় বলতেন দেখ আমার কাছে এতগুলো জামা, এটা দিয়ে কি করব? আমি তাঁকে সম্ভবত তিনটি পাঞ্জাবি দিতে পেরেছি। কিন্তু তিনি আমাকে প্রায় সকল ঈদে জামা দিতেন। আর আমার ছেলে মেয়েদের কতকিছু যে দিয়েছেন তার কোন হিসেব নেই। ব্যস্ততার কারণে যদি কিনতে না পারতেন আমাকে বলতেন, 'মোতাহার তুমি এইগুলো কিনে নিয়ে আস। এগুলো আমার পক্ষ থেকে উপহার।' আমার ঈদের টুপি সবগুলোই সম্ভবত তাঁর দেয়া। তিনি দুটা কিনলে আমাকেও একটা দিতেন।

আমাদের বাসায় খাবার, যাওয়া আসা ও মেহমানদের আপ্যায়ন করার দায়িত্ব ছিল শিপুর উপর। কে কখন আসতে পারেন বা অপ্যায়ন করতে হবে হালীম ভাই আগেই বলে দিতেন। আজকে কয়জন আসতে পারে। আমি শুধু তাদেরকে আনা নেয়ার দায়িত্ব নিতাম। তিনি বাইরে যেতে হলে আমাকে একটু ড্রাইভ ইত্যাদি কাজে সময় দিতে হতো। কিন্তু মেহমানদের জন্য শিপুকেই বেশি সময় দিতে হতো। নানা ভাই এর খাওয়া দাওয়া ছিল খুবই পরিমিত। ফল-ব্রেড ইত্যাদিও প্রয়োজনীয় এবং পরিমিত ছিল। যেহেতু তাঁর ডায়াবেটিস ছিল খুবই বেশী। তাঁর প্রায় ৩৫ বছর ডায়াবেটিস ছিল। তিনি নিজেই ইনসুলিন নিতেন। তিনি কখনো যে কাজ করতে পারতেন তা অন্য কাউকে দিতে চাইতেন না। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁকে সব সময় দেখতাম তার নিজের মশারী, বিছানা সব সময় নিজেই পরিপাটি করে রাখতেন। আমাকে বা কাউকে করতে দিতেন না।

আমি সম্ভবত তার খেদমত যথাযথ ভাবে করতে পারিনি। আমার সাথে তার কোন লেনলেনের সম্পর্ক ছিল না। যতটুকু দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি আমাকে দিতেন তা পালন করার চেষ্টা করতাম। আমি জানিনা আমার সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছি কিনা? আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন এবং মরহুম মকবুল আহমাদ নানা ভাইকে ক্ষমা করুন। আমিন।

জনাব মকবুল আহমাদ কালজয়ী এক ইতিহাসের নাম

আবু নাসের মুজাহিদ

অনেক দিন থেকে মকবুল আহমাদ স্যারকে নিয়ে লিখবো লিখবো করে লিখা হচ্ছে না। আসলে রমজানে ফেসবুক ব্যবহার করার নিয়্যাত খুব বেশী ছিলোনা। তার পরও মনে হচ্ছে এ মহান মানুষকে নিয়ে কিছু না লিখে নিজের প্রতি কোন জুলুম করছিনাতো? আমার দেখা ও স্মরণীয় ঘটনা অবলম্বনে কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশায়াল্লাহ।

সংগঠনের ৬০ এর দশকে কয়েকজনের মধ্যে অন্যতম :

আমি ইসলামী ছাত্রশিবির ফেনী জেলা সভাপতি থাকাকালিন কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত ১০ দিনের এক শিক্ষাশিবিরে অংশ গ্রহণ করি। তাতে "উপমহাদেশে ইসলামি আন্দোলন ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত" বিষয়ের উপর তিন দিন আলোচনা করেছেন সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম (রহ.)। ওনার শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমরা টিসির চব্বিশ জন সদস্য ওনার মগবাজারস্থ বাসায় অংশ গ্রহণ করতাম। মরহুম সাবেক আমীরে জামায়াত প্রতিদিন সকাল ১০.৩০-১.০০ পর্যন্ত আলোচনা করতেন। উপমহাদেশে ইসলামের আগমন, ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন মুসলিম শাসকদের ইতিহাস, তাদের সফলতা ও ব্যর্থতার চিত্র, পলাশি যুদ্ধের মধ্যদিয়ে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ, ব্রিটিশ বিনিয়াদের আগমন ও শাসন, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সুত্রপাত,

যে কয়েকজনের হাত ধরে এক পা, দু-পা করে জামায়াতে ইসলামী আজকের এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তাঁদের মধ্যে মকবুল স্যার উল্লেখযোগ্য। জামায়াতে ইসলামী যদি একটি গাছ হয়, সেই গাছের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত যার হাতের ছোঁয়া লেগেছে তিনি হলেন মকবুল আহমদ।

খন্ড খন্ড বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগঠনের জন্য, জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি আদর্শবাদি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা, জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, ভারত পাকিস্তানের সেফারেশন, বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাস, বাংলাদেশে জামায়াতের কার্যক্রম, দেশ বিভক্তির পর বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন, স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন, কেয়ার টেকার সরকার পদ্ধতির উপস্থাপন, চারদলীয় ঐক্যজোট গঠন, বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন। আমার কাছে মনে হতো অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব এক জীবন্ত ইতিহাস। এমন মহান পুরুষ সত্যি আল্লাহ যুগে যুগে খুব বেশী প্রেরণ করেন না। সেটার যদি সুযোগ পাই অন্য কোন একদিন আলোচনা করবো ইনশায়াল্লাহ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এসে তিনি বলেছিলেন ৬০ এর দশকে মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন এ সংগঠনের ছায়াতলে এসে ঐক্যবদ্ধ হন তাদের মধ্যে মাওলানা আব্দুর রহীম, আব্বাস আলী খান, মকবুল আহমদ অন্যতম। তিনি বলেছেন চট্টগ্রাম বিভাগে মরহুম সাবেক আমীরে জামায়াত মকবুল আহমদকে দাওয়াত দেয়ার পর কিভাবে এ সংগঠনে আসেন। তিনি সংগঠনকে নিজের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁর জীবিত অবস্থায় ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, তথা চট্টগ্রাম বিভাগে সংগঠনের প্রাথমিক দিনগুলোতে দাওয়াতী কাজ, সংগঠনকে সম্প্রসারণ বিষয়ে মকবুল স্যারের অবদান আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন। আমি অবাক হয়েছিলাম অধ্যাপক গোলাম আজম সাহেবের কথায় তিনি যেভাবে সন্মানের সহিত মকবুল স্যারকে সম্বোধন, ওনার নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, ত্যাগ-কুরবানি, আনুগত্য, সময় দান ইত্যাদির কথা অকপটে স্বীকার করে গেছেন। তিনি আমাদেরকে বলছিলেন- তোমরা যদি সত্যিকার কোন মোখলেস ব্যক্তিকে দেখতে চাও তাহলে মকবুল আহমদকে দেখতে পারো। জামায়াতে ইসলামীর একেবারে প্রথম সম-সাময়িক কিছু ব্যক্তিদের মধ্যে জনাব মুকবুল আহমাদ স্যার ছিলেন অন্যতম।

আমরা প্রশ্ন করেছিলাম আপনার নিকট এখন কেমন অনুভব হয়, মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন লোক ছিলেন আর এখন কয়েক কোটি জামায়াত শিবিরের কর্মী, সমর্থক ও সদস্য রয়েছেন। ২ জন মন্ত্রী, বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য। অধ্যাপক আজম সাহেব বলেছিলেন- একটা গাছের বীজ যখন জমিনে লাগানোর পর আস্তে আস্তে বড় হয়, গাছে শাখা প্রশাখার বিস্তার ঘটে তখন কৃষকের মনে আনন্দ আসে, যে কিছুদিনের মধ্যে ফুল আর ফল গাছে ধরবে, যখন প্রথম দিকে দু-চারটা ফল ধরে তখন কৃষকের মন প্রফুল্লে ভরে যায়। আমার কাছেও তেমনি মনে হচ্ছে তবে গাছের শাখা প্রশাখা প্রচন্ড ঘুর্ণিঝড়ে নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে, সেটা নিয়ে আমার সব চেয়ে বেশী ভয়! বাতিলরা জামায়াতের অগ্রযাত্রাকে বাধা প্রদান করার চেষ্টা অতিতেও করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। একথা গুলো তিনি বলেছেন ২০০৫ সালের দিকে।

যে কয়েকজনের হাত ধরে এক পা, দু-পা করে জামায়াতে ইসলামী আজকের এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তাঁদের মধ্যে মকবুল স্যার উল্লেখযোগ্য। জামায়াতে ইসলামী যদি একটি গাছ হয়, সেই গাছের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত যার হাতের ছোঁয়া লেগেছে তিনি হলেন মকবুল আহমদ।

মকবুল আহমাদ স্যারের টাইম ম্যানেজমেন্ট :

মকবুল আহমাদ স্যারের টাইম ম্যানেজমেন্ট ছিলো অবাক করার মতো। নোয়াখালী কলেজে ইসলামিক স্টাডিজ, ও ইসলামি হিস্টোরি সাবজেক্ট আনার ব্যাপারে সাবেক আমিরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামি সাহেবকে নোয়াখালী সফরের সময় স্মারক লিপি প্রধান করি, তখন তিনি কৃষিমন্ত্রী ছিলেন। যাতে নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে এই দু'টি সাবজেক্টের জন্য তদবির করে ব্যবস্থা করেন। কারণ মাদরাসাতে পড়ুয়া অনেক দায়িত্বশীল এ সাবজেক্টগুলো পড়ার জন্য কুমিল্লা, ঢাকা, চট্টগ্রামে চলে যান। সে ক্ষেত্রে নোয়াখালী অঞ্চলে দায়িত্বশীলের একটা শূণ্যতা মাঝে মাঝে দেখা যেতো। তখন তিনি আমাকে বললেন তুমি মকবুল সাহেবের সাথে যোগাযোগ করবা। আমি কয়েকদিন পরে ঢাকা গিয়ে মকবুল স্যারের সাথে মগবাজার জামায়াত অফিসে সাক্ষাত করলাম। সদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারার মানুষটি আমাকে যেভাবে রিসিভ করলেন আমিতো কল্পনাও করতে পারিনি। তিনি আমার পরিচয়, বাড়ীর নাম, দাদার নাম, বাবার নাম জিজ্ঞেস করলেন। জানার পর বললেন আমি তোমাদের বাড়ীতে অর্থ্যাৎ মাওলানা আকতারুজ্জামান সাহেব ও দুধমুখা পীর সাহেবদের বাড়ীতে একাধিক বার গিয়েছি। তিনি মাওলানা আক্তারুজ্জমান সাহেবের খুব প্রশংসা করলেন এবং বললেন- "তিনি তো অনেক বড় আলেম। তুমি কি জানো তিনিই চট্টগ্রাম বিভাগে বড় ওয়ায়েজিন। রাসুল (সা:) এর সিরাত অনেক সুন্দর ভাবে আলোচনা করতেন।" আমি উত্তর দিলাম, "জি জানি। আমি আরো বললাম, আমরা তখন ছোট ছিলাম, কিন্তু টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে উনার ওয়াজ অনেক শুনেছি।" জামায়াত অফিসে আপ্যায়নের মুড়ি চায়ের সাথে স্যার আমার জন্য পেয়ারা আর আপেলের ব্যবস্থা করেছিলেন।

সেইদিন স্যার বললেন- পরের সপ্তাহ সোমবারে ১১ টায় ফোন দেয়ার জন্য। আমি সোমবারে ১১ টা বাজার পর অপেক্ষা করছিলাম, ফোন দিচ্ছি, দিবো করে দিতে দেরী হয়ে গেলো। ১১.০৩ মিনিটে স্যারের ফোন, আমি তো হতবাক!

স্যার আমাকে বললেন নেতা এতো ব্যস্ত হলে হবে? ১১ টায় ফোন দেয়ার কথা ছিলো তোমার। আমি খুবই লজ্জা ফেলাম। আমি বললাম জ্বি স্যার। সেই দিন থেকে স্যারের সাথে যতবার কথা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের আগে মোবাইল হাতে নিয়ে বসে থাকতাম। আজকে নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়

কলেজে ইসলামিক ষ্টাডিজ ও ইসলামি হিস্টোরি সাবজেক্ট আসার পেছনে মকবুল স্যারের অবদান ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান, জামায়াতের নির্বাহি পরিষদের সদস্য, সাবেক বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক আবু নাসের মুহাম্মদ আব্দুজ জাহের সাহেব বলতেন- মকবুল আহমাদ সাহেবের আগে কখনো প্রোগ্রামে আসতে পারিনি। তিনি সময়ের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন।

আরেকবারের একটা ঘটনা মনে পড়ছে, স্যার আমাকে সময় দিয়েছিলেন একটা বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে আমি আল ফালাহ মিলায়তনে প্রোগ্রামে ছিলাম। কেন্দ্রীয় সভাপতির সামনে থেকে যেতে আমার ২০ মিনিটের মতো লেইট হয়ে গেলো। স্যার আমার জন্য বসে বসে অপেক্ষা করছেন। আমি তো ঘেমে শরীরের জামা কাপড় একেবারে জবজবে অবস্থা। স্যার বললেন- সময়ের ব্যাপারে আরো সতর্ক এবং সচেতন হওয়া জরুরী। যেই সময় ব্যবহারে ক্ষেত্রে সফল সেই সব ক্ষেত্রে সফল।

ঈদ উপলক্ষে স্যার গ্রামের বাড়ীতে সব সময় বেড়াতে আসতেন। আমরা স্যারের আগমনকে উপলক্ষ করে ফেনীতে সদস্যদের এক মত বিনিময় প্রোগ্রামের আয়োজন করি। সেই প্রোগ্রামে ডাক্তার আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের ভাইও ছিলেন। মকবুল স্যার আমাকে বললেন- সময় কতক্ষণ, আমি বললাম- ৪৫ মিনিট স্যার। ৪৫ মিনিটের আগেই স্যার আলোচনা শেষ করলেন। আমি ১০ দিনের কেন্দ্রীয় টি.সিতেও দেখেছি স্যারকে নির্দিষ্ট সময়ের আগে আলোচনা শেষ করতে। সময় ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে স্যার ছিলেন আমার দেখা এক অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

লেখক : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ফেনী জেলার সাবেক সভাপতি, ইটালী প্রবাসী। তাঁর ফেইসবুক ওয়াল থেকে নেয়া দুই কিস্তির অসম্পূর্ণ স্মৃতিচারণ।

আমি মকবুল আহমাদ সাহেব (রহ.) কে যেভাবে দেখেছি

কাজী আবু তাহের

তিনি বাল্যকাল থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একজন খাঁটি মোমেন হিসেবে তার যে যে গুণগুলো থাকা দরকার তিনি সকল গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.) একজন সৎ, যোগ্য, নীতিবান এবং খোদাভীরু লোক ছিলেন। ছোট বেলা থেকে তিনি ধার্মিক, নম্র ও একজন আদর্শবান মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেন।

তাঁর কর্মজীবনের শুরুতে ফেনীর অদূরে শরিষাদী হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। তারপর তিনি ফেনী সেন্ট্রাল হাইস্কুলে সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেন। সেই সময় থেকে তিনি আমাদের পাঠানবাড়ী রোডস্থ মজুমদার বাড়ীতে ৫/৬ বছর লজিং মাস্টার ছিলেন। সেই সময় যাতায়াত ছিল রেল গাড়ীতে। তিনি একদিন রেল গাড়ীতে স্কুলে যাওয়ার সময় স্টেশনে এসে দেখেন যে তার অজান্তে পকেটে টাকা নেই। তখন স্টেশনের একজন দোকানদার থেকে কিছু টাকা ধার নিলেন এবং সময় নিলেন ঐ দিনের বিকাল পর্যন্ত। তিনি ফিরে এসে সেই টাকা নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে দোকানীকে টাকা বুঝিয়ে দিলেন। দোকানী টাকা পেয়ে বললেন, স্যার আপনি আগামীকাল যাওয়ার পথেতো টাকা দিতে পারতেন। এতো কষ্ট করে কেন আবার আসলেন। মকবুল সাহেব বললেন, আপনার সাথে তো আজকেই টাকা দেয়ার কথা ছিল। তাই আমি আমার ওয়াদা পূরণ করলাম। দোকানী তাঁর প্রতি মুগ্ধ হলেন এবং বললেন আপনি কোন দল করেন তিনি বললেন, আমি জামায়াতে ইসলামী করি। দোকানী তাঁর সততা ও ওয়াদা পালনে মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিলেন।

১৯৭২ সালে মকবুল আহমাদ সাহেবের সাথে আমি গভীর রাতে এক সফরে যাওয়ার পথে ফেনী মিজান রোডে এক দূর্বৃত্তের কবলে পড়ি। আমি

চিন্তিত হয়ে পড়ি এবং মৃত্যুর আশংকা করি। সেই সময় তিনি আমার এই অবস্থা দেখে বললেন, আল্লাহ ভরসা, শত্রু আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। এই ছিল আল্লাহর প্রতি তাঁর অবিচল বিশ্বাস।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে ফেনীর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাবীব ব্রাদার্সের মালিক জনাব সৈয়দের রহমান সাহেব একদিন জামায়াত অফিসে আসেন। সালাম কুশল বিনিময়ের পর তিনি মকবুল আহমাদ সাহেবকে বললেন, এখন দেশে যুদ্ধকালীন সময়, আপনার সংগঠনের অনেক টাকার প্রয়োজন। তাই আমি আপনার জন্য কিছু টাকা নিয়ে এসেছি। মকবুল সাহেব টাকার কোন লোভ করলেন না এবং অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে বললেন আমাদের ভাইদের টাকা দিয়ে সংগঠন চলছে। আপনার টাকা লাগবে না। এরপর থেকে হাজী সৈয়দের রহমান মকবুল আহমাদ সাহেবের এই নি:স্বার্থ, নির্লোভ ও ন্যায় পরায়নার কথা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিলেন।

তিনি বাল্যকাল থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একজন খাঁটি মোমেন হিসেবে তার যে যে গুণগুলো থাকা দরকার তিনি সকল গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি তিনি যেন তাঁর জীবনের সকল নেক আমল সমূহ কবুল করেন এবং জান্নাতের সু-উচ্চ মাকাম দান করেন। আমীন॥

ফেনীর মাটি ও মানুষের সাথে মিশে যাওয়া একটি নাম

কতটা নির্মোহ দুনিয়া বিমুখ অসাধারণ চরিত্রের মানুষ ছিলেন তিনি কাছ থেকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি। জামায়াতে ইসলামীর মত এত বিশাল একটা সংগঠনের আমীর ছিলেন তিনি যে সংগঠনের চেয়ারে থেকে তিনি ইচ্ছা করলে বাড়ি-গাড়ি, দুনিয়াদারী অনেক কিছুই করতে পারতেন। কিন্তু কিছুই করেননি। উল্টো সংগঠনের সম্পদ রক্ষায় উনার আমানতদারীতা ছিলো আকাশচুম্বি।

সফি উল্লাহ ভূঁইয়া

ফেনীর মাটি ও মানুষের সাথে মিশে যাওয়া একটি নাম মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.)। এই মানুষটির সাথে আমার পরিচয় ছাত্র জীবনে স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে। ১৯৬৭ সালে আমি যখন ফেনী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে পড়ি, তখন তিনি ফেনী সেন্ট্রাল হাইস্কুলে শিক্ষকতা করছিলেন। আমি তৎকালীন ইসলামী ছাত্র সংঘের রফিক (সাথী) ছিলাম। তিনি তখন ফেনী মহকুমা জামায়াতের আমীর ছিলেন! আমরা ছাত্র জীবনে বিভিন্ন টিসি, টিএস এ উনার বক্তব্য শুনতাম। তিনি অত্যন্ত নির্মল সহজ ভাষায় কথা বলতেন। বিশেষত: ফেনী অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেন। যাতে সহজে তিনি ফেনীর মাটি ও মানুষকে আপন করে নিয়েছিলেন।

তিনি কতটা সহজ সরল ও সাধামাটা জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। প্রায় ১ যুগ আগে তিনি ফেনী সফরে আসলে আমি দেখলাম তিনি নিজের একটি গেঞ্জি নিজ হাতে ধৌত করছেন। তখন আমি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি সফরে কেন গেঞ্জী ধৌত করছেন? ড্রাইভার বলল উনার

সফরে দুইটা মাত্র গেঞ্জি থাকে। তাই পথে যাত্রা বিরতীতে ১টি গেঞ্জি পরিধান করেন আরেকটি ধৌত করেন সর্বদা। কি অনুপম সহজ সরল জীবন যাপনে তিনি অভ্যস্থ ছিলেন! তার আরও একটি উদাহরণ আমার মনে পড়ে যায়, একবার উনাকে আমার বাসায় দাওয়াত করেছিলাম রাতে খাওয়ার জন্য। তিনি খাবেন সেজন্য আমি হরেক রকমের মাছ, মাংস, সবজী, ডাল, ভর্তা সবকিছুর আয়োজন করেছিলাম। তিনি যদি ভাত না খেয়ে রুটি খান সেজন্য রুটির ব্যবস্থাও করেছিলাম। এ আয়োজনের পর রাতে তিনি যখন খাওয়ার গ্রহণ করতে আসলেন। হরেক রকমের খাওয়ার দেখে তিনি স্বাভাবিকভাবেই বললেন আমি রাতে ২টা রুটি আর হালকা ভাজি ছাড়া আর কিছুই খাইনা। সুতরাং তুমি আমাকে ২টা রুটি আর হালকা ভাজি দাও। পরবর্তীতে তিনি আমার অনেক চাপাচাপিতে ভাজির সাথে এক টুকরা গোশত নিয়েছিলেন। কিন্তু রুটি ২টা থেকে কোন ভাবেই আর বেশী নিলেন না। ২টা মাত্র রুটি খেয়ে আমার বাসা থেকে বিদায় নিলেন।

কতটা নির্মোহ দুনিয়া বিমুখ অসাধারণ চরিত্রের মানুষ ছিলেন তিনি কাছ থেকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি। জামায়াতে ইসলামীর মত এত বিশাল একটা সংগঠনের আমীর ছিলেন তিনি যে সংগঠনের চেয়ারে থেকে তিনি ইচ্ছা করলে বাড়ি-গাড়ি, দুনিয়াদারী অনেক কিছুই করতে পারতেন। কিন্তু কিছুই করেননি। উল্টো সংগঠনের সম্পদ রক্ষায় উনার আমানতদারীতা ছিলো আকাশচুম্বি। একবার তিনি সাংগঠনিক সফরে ফেনী জামায়াত অফিস পর্যন্ত আসেন। জামায়াত অফিসে সাংগঠনিক কাজ শেষ করে দাগনভূঁএা নিজ গ্রামের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য বের হচ্ছিলেন আমি তখন সামনে দাঁড়ানো ছিলাম। তিনি গাড়ীর ড্রাইভারকে বলছিলেন, গাড়ীর তেল বর্তমানে কি পরিমাণে আছে চেক করে নাও। ড্রাইভার বললেন, স্যার গাড়ীতে তেল পর্যাপ্ত আছে আমাদের যাতায়াত অসুবিধা হবে না। মকবুল সাহেব অবাক করে দিয়ে বললেন, আমি আসা যাওয়ার সুবিধার জন্য তেলের পরিমাণের প্রশ্ন করিনি। আমি প্রশ্ন করেছি বর্তমানে কত লিটার তেল আছে তার তথ্য যথাযথভাবে জানার জন্য। আমি আমার বাড়ীতে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সফরে যাচ্ছি। আমার বাড়ীতে আসা-যাওয়ার তেলের খরচটা সংগঠনের ফান্ড থেকে নেওয়া বৈধ হবে না। তেলের খরচের যথাযথ তথ্যের কারণ হলো ফেনী থেকে দাগনভূঁএা যাতায়াতের খরচ আমি ব্যক্তিগতভাবে বহন করবো। এটি আমার ব্যক্তিগত খরচ। আমি মকুবল সাহেবের এমন কান্ড দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। একজন মানুষ কতটা আমানতদারী ও জবাবদিহীর অনুভূতি সম্পন্ন ছিলেন তা এ ঘটনা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

শুধু তাই নয়, উনার নিষ্কলুষ আমানতদারীতার আরেকটি বড় উদাহরণ হলো তিনি সর্বদা পকেটে দুইটা কলম রাখতেন। একটা সংগঠনের পয়সায় কেনা কলম যেটা দিয়ে তিনি সাংগঠনিক লিখা লিখতেন। অপরটি ব্যক্তিগত

পয়সায় কেনা কলম। যেটা দিয়ে তিনি কাউকে ব্যক্তিগত চিরকুট লিখতেন বা ব্যক্তিগত কাজ সারতেন। একটি ক্ষুদ্র ৫ টাকার কলমেও উনার এমন আমানতদারীতার আশ্চর্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ মহান মানুষটি আমার সর্বদা খোঁজ-খবর রাখতেন। ঢাকা থেকে প্রায়ই মাঝে মাঝে আমাকে ফোন করে আমার ব্যক্তিগত মানউন্নয়নসহ পারিবারিক খোঁজ-খবর নিতেন। সর্বশেষ কয়েক বছর আগে জেলা আমীরের ফোনে উনার সাথে আমার কথা হয়। সর্বশেষ বারও তিনি আমার ব্যক্তিগত মান উন্নয়ন নিয়ে নসীহত করেন। যে নসীহতগুলো আমার সারাজীবনের পাথেয় হিসেবে কাজ করবে। মহান আল্লাহ যেন দ্বীনের এই মহান দা'য়ীকে বেহেশতের সুমহান স্থানে আসীন করেন। আমীন॥

কিছু স্মৃতি ও মরহুম মকবুল আহমাদ

মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল আবছার

> তিনি ছিলেন শান্ত মনের অধিকারী এবং ন্যায়পরায়ণ প্রকৃতির ও তাকওয়াবান লোক।

মরহুম মকবুল আহমাদ ফেনী জেলার দাগনভূঁইয়া উপজেলার ৩নং পূর্বচন্দ্রপুর ইউনিয়নের ওমরাবাদ গ্রামের কৃতি সন্তান। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের ইসলামি আন্দোলনের জন্য অনুপ্রেরণা ও অভিভাবক। ১৯৮০ইং সালের আগস্ট মাসের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম শহরের এক ডাক্তার সাহেবের চেম্বারে উনার সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে ফেনীতে আসার পরামর্শ দেন। আমি সে মাসে ফেনীতে চলে আসি। জনাব মরহুম নুরুল ইসলাম বিএসসি সাহেবের বাসায় থাকার পরামর্শ দেন। আমি তখন বি.কম ফলপ্রার্থী ছিলাম।

১৯৮৪ইং পর্যন্ত ফেনীতে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করি। ১৯৮৪ইং হতে দাগনভূঁইয়া থানার সংগঠনিক দায়িত্ব পালন করি। এ সুবাদে ১৯৮৬ইং ও ১৯৯১ইং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উনার সাথে বেশী সময় দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর সকল আত্মীয়ের বাড়ী এবং সংগঠনিক সফর করার সুযোগ হয়েছিল। সকল আত্মীয় তাঁকে অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। সকলের নিকট তিনি ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। বর্তমান জালিম ও বিনা ভোটের সরকার মিথ্যা ও বানোয়াট অপবাদ দিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে, নানা চক্রান্ত ও কুট কৌশল করে জেল হাজাতে রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মিথ্যা ও বানেয়াট চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। তিনি বীরের বেশে নির্দোষ হিসাবে মুক্তি লাভ করেন।

ফেনী জেলার জামায়াত পরিচালিত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর অবদান রয়েছে। তিনি ফেনী জেলার কয়েকটি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এবং ঢাকাস্থ ফালাহ আম ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন শান্ত মনের অধিকারী এবং ন্যায়পরায়ণ প্রকৃতির ও তাকওয়াবান লোক। এ পৃথিবী সকল জীবের জন্য অস্থায়ী। দুনিয়ার কোনো মানুষ স্থায়ীভাবে টিকে থাকতে পারবে না। হাজারো মানুষ তাকে এ পৃথিবীতে রাখার চেষ্টা করলেও তা বৃথা যাবে। তাকে ইহকালে রাখা অসম্ভব। সে হিসেবে মকবুল আহমাদ সাহেব আজ আমাদের মাঝে নেই। আছে তাঁর কর্মময় জীবন। যা আমাদেরকে অনুপ্রেরণা যোগাবে ইসলামী আন্দোলনের কাজে। রাসূল (সা.) বলেছেন, ইহকাল ত্যাগকালে ৩টি জিনিস রেখে গেলে পরকালে উহার জাযা পাওয়া যাবে। ১. ছাদকায়ে জারিয়াহ ২. দ্বীনি শিক্ষা ৩. নেক সন্তান। মরহুম মকবুল আহমাদ এমন মহান ব্যক্তিত্ব যিনি ৩টি জিনিসই ১০০% সফলতার সাথে এ পৃথিবীতে রেখে গিয়েছেন।

আল্লাহ্ পাক তাঁকে জান্নাতের আ'লা দরজা জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। তাঁর সাথে সাথে যাবতীয় নেক আমল গ্রহণ করে আমাদেরকেও জান্নাতে প্রবেশের তৌফিক দিন। আমিন॥

লেখক : সাবেক অধ্যক্ষ, লক্ষীয়ারা আলিম মাদরাসা, ফেনী এবং সাবেক জেলা শূরা ও কর্মপরিষদ সদস্য, ফেনী জেলা জামায়াতে ইসলামী।

সাবেক আমীরে জামায়াত, এক অনুকরনীয় আদর্শ

শিরিনা আক্তার

২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ফেনী- ০২ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী জনাব মকবুল আহমাদ স্যার। সত্তরের দশকে সরিষাদী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালীন সময় থেকেই সাবেক আমীরে জামায়াত মরহুম মকবুল আহমাদ সাহেবকে আমরা স্যার বলে সম্বোধন করি। নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য স্যারের ফেনীতে অবস্থান করার প্রয়োজন পড়ে। কাজেই আমাদের নির্মাণ কাজ চলমান থাকা বাড়িটিতেই স্যারের জন্য জরুরী ভিত্তিতে একটি কক্ষ প্রস্তুত করি। আমাদের সেই নতুন বাসাতেই প্রায় তিন মাস কাল অবস্থান করেন তিনি। এই সময় খুব কাছে থেকে উনাকে জানার ও জীবনাচরণ লক্ষ্য করার সুযোগ হয়। যা আজ কেবলই স্মৃতি।

আপোষহীন সংগ্রামের এই অবিসংবাদিত নেতার ব্যক্তিগত জীবন ও চারিত্রিক মাধুর্যতায় মানুষ মাত্রই আকর্ষিত হবে। একজন উন্নত চরিত্রের স্বপ্নবাজ ব্যক্তিত্বের নাম জনাব মকবুল আহমাদ। তার পুরাটা জীবন তিনি উৎসর্গ করেছেন মুসলিম উম্মাহ, বাংলাদেশ ও বিশ্বমানবতার কল্যাণ চিন্তায়। উনার চিন্তায়, পরিকল্পনায় তিনি ছিলেন অনেক উন্নত। এই শান্তিকোম্পানী মসজিদের পাশে ফেরিওয়ালাদের বস্তি ছিল আবর্জনার পরিবেশ। উনার পরামর্শে ঐ বস্তির জায়গায় শান্তিনিকেতন স্কুল, সিটি গার্লস স্কুল হয়ে দুষণমুক্ত উন্নত মানের হয়েছে। এই এলাকায় ছিল বন জঙ্গলে ভরা। উনার অসাধারণ চিন্তা ও পরিকল্পনার ফসল, এখানকার স্থানীয় আলেমে দ্বীন মাওলানা আবদুস সাত্তার সাহেবসহ মরহুম জনাব মাকছুদের রহমান সাহেবের সহযোগীতা স্থানীয় গণ্যমান্য লোকের পরামর্শে আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয়ে বন-জঙ্গলে ভরা এলাকা বাংলাদেশের সেরা এলাকায় পরিণত হয়েছে।

আমাদের বাসায় অবস্থানকালেও তিনি একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনচরণ মেনে চলতেন। সকাল ভোরে এক গ্লাস চিরতা পাতার পানি খেতেন। পছন্দের খাবার ছিল শাক-সবজি, মাছ, গোশত তবে মাছের মাথা খেতে বেশ পছন্দ

করতেন। আমি সব সময় মাছের মাথা উনার জন্য দিতাম।

আরো কয়েক বছর আগের ঘটনা ১৯৮৮ সালের ১৮ আগষ্ট জন্মগ্রহণ করে আমাদের ছোট ছেলে। ওর নামও স্যার রেখেছেন। উনি বললেন, ওর মা কি নাম পছন্দ করেছে? আমি বললাম আবদুল্লাহ আল ফাহাদুল আমিন। উনি নাম পরিবর্তন করে মুনাজাত করলেন ফুয়াদুল আমিন। ফুয়াদ অর্থ হৃদয়, কলিজা। উনি বললেন, এ নামে যেন আমরা তাকে ডাকি। ফুয়াদের আব্বুর সাথে দীর্ঘ দিনের সুসম্পর্ক থাকায় আমাদের বাসায় প্রায়ই আসতেন। আমার ছেলে, মেয়ে কে কোথায় আছে, কে কিসে পড়ে? সাংগঠনিক মান কার কি? নাম ধরে ধরে জিজ্ঞাসা করতেন।

স্যার আমাকে অসংখ্য ইসলামী সাহিত্য উপহার দিয়েছেন। উনার নাম, সনটা লিখে দিতেন বইয়ের ভিতরের পাতায়। আর উনার দেওয়া সূরা ইয়াসিনের আয়াত সংবলিত সুদৃশ্য ওয়ালমেট আজও সংরক্ষিত রয়েছে আমার বাসায়। আমাদের বাসায় অবস্থানকালে ফুয়াদের আব্বুকে উনি বলেন, বান্দরবান জেলা আমীর মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব উনার মেয়ের বাসায় থাকতেন উনাকে এবং মাওলানা আবদুস সাত্তার সাহেবকে আমাদের বাসায় দুপুরে খাওয়ার দাওয়াত দিতে। উনি তাই করলেন। খাওয়ার পর তাদের ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক মান উন্নয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন স্যার। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই নেতা ছিলেন নিরহংকারী, হাস্যোজ্জ্বল ও নুরানী চেহারার অধিকারী ব্যক্তিত্ব।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত সকলের জন্য মরহুম মকবুল আহমাদ স্যারের বিপ্লবী জীবন ও কর্ম স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকুক সারা জীবন। আল্লাহ মরহুমের সকল কর্মতৎপরতা কবুল করুন এবং তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন করুন। আমীন॥

লেখিকা : প্রবীন মহিলা রুকন, মজলিশে শূরা সদস্য, ফেনী শহর জামায়াতে ইসলামী।

হৃদয়ের রাজপুত্র মকবুল আহমাদ : বড়ো নেতার ছোটো ঘটনা

আবু সুফিয়ান

আমি অভিভূত হয়ে সেই নেতার কথা চিন্তা করেছি, যিনি কয়েক মুহূর্তের পরিচয়ের কর্মীর কথা মনে রাখেন কয়েক বছর পর খানায়ে কাবায় মুনাজাতের সময়, তার আরজুর ফরিয়াদ করেন রবের কাছে একান্ত মুহূর্তে। এই দরদের চেয়ে বড়ো কারামত আর কী হতে পারে! অলৌকিক কারামতের চেয়ে এই দরদ আর ভালোবাসার কারামত কোনো অংশে কম নয়; বরং অনুসরণীয়।

কারামত আল্লাহ তায়ালার কুদরতেরই অংশ। কারামত বান্দার ক্ষমতার অংশ নয়, আবার কারও মকবুলিয়াতের চূড়ান্ত সার্টিফিকেটও নয়; বরং তা প্রিয় বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমতের নিদর্শন মাত্র। এমনকি অনেক সময় আল্লাহ সুবহানাহু তায়া'লা বদকার বান্দাকেও অলৌকিক সহযোগিতা দিয়ে থাকেন। সুতরাং কোনো ব্যক্তির অনুসরণীয় দিক হচ্ছে তার সদগুণাবলি, ইখলাস আর আমলে সালেহ; কারামত নয়। হ্যাঁ, আল্লাহর জন্য কাজ করলে যে আল্লাহর খাস রহমত পাওয়া যায়- সেই এতমিনানের মজবুতির জন্য হলে কারামত আলোচনা ঠিক আছে। কিন্তু কারামত আলোচনা দ্বারা ব্যক্তি কত বড়ো মকবুল আর আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন তা বুঝানো হলে- সেই আলোচনা উপকারের চেয়ে অপকার বয়ে আনতে পারে।

এতটুকু ভূমিকা বলার উদ্দেশ্য হলো, আজ এক মহান ব্যক্তিকে স্মরণ করতে চাই, তাঁর একটি অনুসরণীয় অসাধারণ গুণকে আলোচ্যে এনে, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে সেখানে তাঁর একটি কারামতও প্রকাশিত হয়েছে। এতদিন এই ঘটনাটি আলাপে না আনার কারণ হলো, আমাদের অতি সরল ও আবেগপ্রবণ বন্ধুরা ঘটনার মূল ও শিক্ষণীয় দিককে ফোকাস না করে কারামতকে ফোকাস

ধরার আশঙ্কা! এবং কতিপয় বক্তা সেটাকে আরও তেল চকচকে করে বয়ান করার সমূহ আতঙ্ক থেকে হেফাজতে থাকা।

অসুস্থতা, পারিবারিক জটিলতা, লকডাউনের ব্যবসায়িক ক্ষতিসহ বেশ কঠিন পরীক্ষার সময় পার করছি; অনলাইনে না থাকায় মকবুল চাচার ইন্তেকালের খবর পেয়েছি অনেক দেরিতে, এইমাত্র। আমাদের হৃদয়ের রাজপুত্র মকবুল আহমাদকে আল্লাহ সুবহানাহু তায়া'লা জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন।

কঠিন এক মুহূর্তে নিভৃতচারী, জটিলতাহীন সহজ এ মানুষটি কঠিনতর দায়িত্ব পালন করেছেন। মাত্র একবার সরাসরি দেখেছি মুর্শিদ মকবুল আহমাদকে, পল্টনে এক জনসভায়। আর তাঁর গ্রেফতারে অঝোর অশ্রুধারায় একটি কবিতা লিখেছিলাম। এটুকুই হৃদয়ে জাগরুক তাঁর স্মৃতি।

২০১৮'র কোনো একদিন। বায়তুল মুকাররমে সাতকানিয়ার এক ব্যবসায়ীর সাথে ঘটনাচক্রে দেখা। বায়তুল মুকাররমের নিচতলায় তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সেখানেই আমাদের চারজনের দীর্ঘ গল্পসল্প। সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার কুখ্যাত নির্বাচন থেকে ঢাকা-চট্টগ্রামের সংগঠন, পরিবার-পরিজন থেকে ব্যবসায় ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে আলাপের ডালপালা বিস্তৃত হলো। সেই ডালপালা একসময় মকবুল চাচায় গিয়ে ঠেকল। তাঁর বয়স, দক্ষতা, ইখলাস, সামর্থ্য, সীমাবদ্ধতা, পরিস্থিতির কাঠিন্যতা ইত্যাদি নিয়ে নানা মুনি নানা মত দিলাম। ব্যবসায়ী ভাইটি বললেন, আমি মতামতের বাইরে একটা ব্যক্তিগত ঘটনা বলি, খুব কম মানুষকেই এটি আমি বলেছি। তিনি শুরু করলেন...

নব্বইয়ের দশক (তিনি সাল বলেছেন, আমার মনে নেই)। আমার বাসার পাশে একটি প্রোগ্রাম। মোটামুটি বড়সড় আয়োজন। মেহমান মকবুল আহমদ। আমার বাসার সন্নিকটে হওয়ায় মেহমানের আপ্যায়ন ও বিশ্রামের ব্যবস্থার দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। যথাসময়ে তিনি এলেন। মেহমানদারির শুকরিয়া জানালেন। পরিবারের খোঁজ নিতে গিয়ে বললেন, ছেলেমেয়ে ক'জন?

--- এখনও আল্লাহ পাক দেননি।

--- কত বছর হলো বিয়ের?

--- আট বছর। (সম্ভবত আট বলেছেন, অথবা ছয়)

--- বাচ্চা কি আল্লাহ পাক দেননি, নাকি আপনারা নেননি? (মুচকি হেসে, এ হাসি অনন্য, যে এ হাসির সৌন্দর্য দেখে নাই, তার কল্পনাশক্তি এ হাসিকে অনুভব করা কঠিন আছে)।

--- না, আল্লাহ পাকই দেননি।

তিনি দুআ করলেন। নির্ধারিত সময়ে বিদায় নিলেন।

এরপর কয়েক বছর কেটে গেল। একদিন বাসায় ফোন এলো, 'অমুক ভাই আছেন?'

--- জি, আমি বলছি।

--- আচ্ছা, লাইনে থাকুন, জামায়াত অফিস থেকে বলছি, মকবুল আহমদ স্যার কথা বলবেন।

আমি ঢোক গিললাম। একদিনের ক্ষণিক সময়ের মেহমানদারি মাত্র! আমি মনে রাখার পর্যায়ের দায়িত্বশীল কেউ নই, সাধারণ রুকন মাত্র। কিন্তু আমার যে বিস্ময়ের ওপরে বিস্ময় অপেক্ষা করছে তা কে জানত! টেলিফোনের ওপার থেকে স্নেহমাখা কণ্ঠে আমার নাম শোনা গেল...

--- কেমন আছেন? পরিবার কেমন আছে?

কুশল জানালাম। আমার ফ্রি সময়ে জামায়াত অফিসে গিয়ে তাঁর সাথে একটু সাক্ষাতের অনুরোধ করলেন। আমি তখুনি ছুটলাম! এ কেমন নেতা! নিভৃতচারী স্মিত হাসির যে মানুষটি একটু ক্ষণিক দেখার কর্মীকে কয়েক বছর পরও নামসহ মনে রাখেন আর খোঁজ নেন, সে নেতার ডাক উপেক্ষা করার সাধ্য কী!

আন্তরিক অভিবাদন জানালেন তিনি। আবার খোঁজ নিলেন। দুটো খেজুর দিয়ে হাত চেপে ধরে বললেন, রাতে দুজনে খাবেন, আল্লাহর কাছে দুআ করবেন, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক আপনাদের সন্তান দেবেন।

আমার চোখে পানি এসে গেল। ঘরে ফিরলাম। আল্লাহর কাছে খুব কাঁদলাম দু'জনে। খেজুর দুটো খেলাম। আলহামদুলিল্লাহ। কদিনের মধ্যেই আল্লাহ পাক আমাদের সুসংবাদ দিলেন। আমার ওয়াইফ কনসিভ করল।

আমি আবার ছুটলাম নেতার কাছে। চেপে ধরলাম, আমাকে এর রহস্য জানাতে হবে! স্মিত হেসে তিনি বললেন, আরে নাহ! কোনো রহস্য নেই। ওমরায় গিয়েছিলাম। খেজুর দুটো হাতে নিয়ে খানায়ে কাবায় আপনাদের সন্তান দানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেছি। এটুকুই। এখানেই ব্যবসায়ী ভাইটির গল্প শেষ। তার চোখে অশ্রুর ঝিলিক, টলটল করছে, কিন্তু ঝরে পড়ছে না, মুখে হাসি।

আমি অভিভূত হয়ে সেই নেতার কথা চিন্তা করছি, যিনি কয়েক মুহূর্তের পরিচয়ের কর্মীর কথা মনে রাখেন কয়েক বছর পর খানায়ে কাবায় মুনাজাতের সময়, তার আরজুর ফরিয়াদ করেন রবের কাছে একান্ত মুহূর্তে। এই দরদের চেয়ে বড়ো কারামত আর কী হতে পারে! অলৌকিক কারামতের চেয়ে এই দরদ আর ভালোবাসার কারামত কোনো অংশে কম নয়; বরং অনুসরণীয়।

তারিখঃ ১৮ এপ্রিল, ২০২১, ১২:০৫
(আবু সুফিয়ান সাহেবের ফেইসবুক ওয়াল থেকে)

মরহুম মকবুল আহমদ
দি হোয়াইট ইমেজিং লিডার

জামায়াত নেতা হিসেবে নয়, তার পারসোনালিটি, তার নির্লোভ ইমেজিং আচার-আচরণ তাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। তার দল নিয়ে নানা বিতর্ক ও ধুম্রজাল থাকলেও ব্যক্তি মকবুল আহমাদের ইমেজ এবং পপুলারিটি অসামান্য। জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর মরহুম মকবুল আহমাদকে নিয়ে আওয়ামী লিগ নেতা ও ফেনীর তিনবারের সাবেক এমপি জয়নাল হাজারী একটি সুন্দর ভিডিও বার্তা ফেসবুকে দিয়েছেন। তার সততার ভূয়সী প্রসংশা করেছেন প্রভাবশালী বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল হাজারী।

রেজাউল হক হেলাল

ড. মুহাম্মদ আবদুল হাই তার 'বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন' বইতে লিখেছেন, অনন্তকাল স্রোতের মধ্যে বুদ-বুদের মতো মানুষের জীবন। অবিরত ফুটছে আর ঝরছে। দুনিয়ার খেলা ঘরে কয়েকটি মূহূর্ত কাটিয়ে দেওয়ার জন্য কী তার আয়োজন! আর নিজের শক্তির পরিচয়ে কী তার আনন্দ?

এই বুদ-বুদের মধ্যে কিছু সাকসেস সনদ নিয়ে নিভে যায়, সুন্দর পৃথিবীতে যুগে যুগে এমন অনেক মানুষের আবির্ভাব হয়েছে; যাদের কর্ম কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে বাতিঘর হিসেবে সমাদৃত। এইসব বরণীয় মানুষ অন্য মানুষের জ্ঞান ও চিন্তার জগতকে সমৃদ্ধ করতে গিয়ে কী ত্যাগ ও নিপিড়নের শিকার হয়েছেন সে ইতিহাসের খবর আমরা রাখি? আমরা শুধু তাদের কাজকেই মুখ্য হিসেবে দেখি। ব্যক্তি মানুষের ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবনের দিকে ফিরেও দেখিনা। সদ্য প্রয়াত ফেনীর মকবুল আহমাদ স্যার সেই হতভাগা সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতাদের একজন। যিনি কোন ভালো কাজ করে পুরস্কার বা এওয়ার্ড এর জন্য লবিং করতেন না। তিনি মনে প্রাণে তার মালিকের সাথে মিলিত হওয়ার তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে জীবন তরী পার করেছেন।

জীবনের রহস্যময় পরিনতির নাম মৃত্যু। যা প্রাণীকূলের জন্য অবধারিত। তবে কিছু মানুষের জীবন ইতিহাস মাইলফলক।

ফেনীর মকবুল আহমাদ একটি কালের সাক্ষী। একটি রঙিন প্রজাপতি। যে সুশিক্ষিত সজ্জন সুকুমারবৃত্তির অধিকারী গুনীজন হয়েও মিডিয়ায় ঠিক ভাবে ডানা মেলে উড়তে পারেননি। গত ১৩ এপ্রিল তিনি জান্নাতের আকুলতা নিয়ে তার সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে গেছেন।

সচেতন দেশ প্রেমিক যারা, তারা জানেন, একটু খানি আপোষ করলেই ফেনী সিলোনিয়ার এই পপুলার স্কুল টিচার বিনা ঘুষে বিনা ডোনেশনে দল বদল করে করে বাংলাদেশের বহুবার এমপি, মন্ত্রী হতে পারতেন। ১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ ইলেকশনে ভোট করে দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী এই সিনিয়র লিডার খুব সাদামনের মানুষ ছিলেন। যারা তার সাথে মিশেছিলো আমার চেয়ে তারা ভালো জানেন। বন্ধু বা ব্যাংকের একটা টাকা ঋণ নিয়ে ঢাকা বা কোথাও কিছু করেননি। জীবনের হালাল রুজি ও বন্ধুদের থেকে পাওয়া ডোনেশন এনে এনে মকবুল সাহেব কিছু মসজিদ মাদরাসা করেছেন। ট্রাষ্ট, এতিমখানা ও জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান করেছেন। যেহেতু তিনি দীর্ঘ দিন বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের চীফ ছিলেন। কখনো কোন দল বা সম্প্রদায়কে কটুক্তি বা আক্রমন বা উস্কানিমূলক বক্তব্য করা বা হিংসা জিঘাংসার ঝড় তুলতেন না। এমন রাজনৈতিক ক্যারিয়ার যা ড. ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী বা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে তার কিছুটা তুলনা করা যায়। পৃথিবীর বহু দেশে গিয়ে বহু সেমিনারে বক্তব্য করে যে জামা কাপড় পরে যেতেন, ওইভাবে সাধারণ যাত্রির মতোই দেশে ফিরতেন।

এজন্যই তার মহা প্রয়ানের পর পৃথিবীর বহু স্থানে, বহু নগরে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার নিজ গ্রামে রাত দশটায় শেষ জানাজায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি, সাংসদ, ডাক্তার, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক সংগঠক, কবি, লেখক, বুদ্ধিজীবি, লোকাল নেতা, পেশাজীবি, কৃষক, ছোট্ট বেলার খেলার সাথী, তার ছাত্ররা পঙ্গপালের মতো ছুটে আসেন দাফন অনুষ্ঠানে। গ্রামবাসির ভালোবাসার মানুষটিকে অশ্রুসিক্ত নয়নে শেষ বিদায় জানান। ফেনী জেলার এই কৃতি সন্তানের নাম মকবুল আহমাদ।

জামায়াত নেতা হিসেবে নয়; তার পারসোনালিটি, তার নির্লোভ ইমেজিং আচার-আচরণ তাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। তার দল নিয়ে নানা বিতর্ক ও ধুম্রজাল থাকলেও ব্যক্তি মকবুল আহমাদের ইমেজ এবং পপুলারিটি অসামান্য। জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর মরহুম মকবুল আহমাদকে নিয়ে আওয়ামী লিগ নেতা ও ফেনীর তিনবারের সাবেক এমপি জয়নাল হাজারী সাহেব একটি সুন্দর ভিডিও বার্তা ফেসবুকে দিয়েছেন। তার সততার ভূয়সী প্রসংশা করেছেন প্রভাবশালী বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল হাজারী। সুলেখক ও প্রফেসর মফিজুর রহমানসহ বাংলাদেশের বহু গুণীজন স্কলার হেভি ওয়েট

জনাব মকবুল আহমাদের তিরোধানের পর দোয়া ও আপসোসসহ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালোবাসার বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন। এতে ধারণা করা যায় কোটি কোটি গণমানুষের হৃদয়ে তার জন্য অকৃত্রিম সুপ্ত ভালোবাসা যেনো উপছে পড়েছে। আমরা যারা মকবুল আহমাদ এর দলের রাজনীতি করিনা তারাও তার পারসোনালিটির প্রসংশা করছি। তাই সোশ্যাল রেসপন্স থেকে মানবিক পোস্ট করলাম।

এজন্য কবি বলেছেন-

প্রথম যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে,
কেঁদেছিলে তুমি একা হেঁসে ছিলো সবে।
এমন জীবন তুমি করিবে গঠন,
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।

পরকালে তিনি যেনো জান্নাতবাসী হন। আমীন॥

লেখক : দাগনভূঞার কৃতি সন্তান। একজন কবি, গল্পকার ও মানবাধিকারকর্মী।
(লেখাটি তাঁর ফেইসবুক ওয়াল থেকে নেয়া হয়েছে।)

মরহুম মকবুল আহমাদ ঃ রাসুলের আদর্শের মূর্ত প্রতীক

মাহমুদুল হাসান

সভা-সমাবেশ কিংবা সম্মেলনে উনার হাসিমাখা বক্তব্য সকলকেই আবেগময় করে তুলতো। বিরোধী দলের সমালোচনায় তিনি যুক্তিপুর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। এ জন্য সকল রাজনৈতিক দলের কাছে তিনি আদর্শ নেতার সম্মান পেতেন। যা তাঁর ইন্তেকালের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের উনার ব্যাপারে লাইভ অনুষ্ঠানে আমরা শুনতে পেয়েছি। তাঁর ব্যাক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক ও সাংগঠনিক জীবন এক ও অভিন্ন।

"লাক্বাদ কানা লাকুম ফী রাসুলিল্লাহি ওসওয়াতুন হাসানা" অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসুলের জীবনেই রয়েছে উত্তম আদর্শ। মহান আল্লাহ পাকের এ অমীয় বাণীটিই মনে হচ্ছে যেন সাবেক আমীরে জামায়াত মরহুম মকবুল আহমাদ স্যারের জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে। একজন খাঁটি রসুল প্রেমীক ছিলেন মরহুম মকবুল স্যার। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন দিক আলোকপাত করলে আমরা তাঁকে দেখতে পাবো রাসুল আদর্শের একজন মূর্ত প্রতীক, রসুলের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী ও রাসুল (সা.) জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি হিসেবে।

স্যারের সাথে আমার স্মৃতিতে আসার মতো তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। যা ঘটেছে অন্যদের সাথে হাজারে হাজারে। সাংগঠনিক জীবনে ফেনীতে ফালাহিয়া মাদ্‌রাসা মিলনায়তনে রুকন সম্মেলন কিংবা টিসিতে উনার আলোচনায় একটা পর্ব থাকতো প্রশ্নোত্তর। রুকন কিংবা কর্মীদের লিখিত আকারে প্রশ্ন গুলো কী সুন্দরভাবে হাসিমুখে উত্তর দিতেন তিনি। ফলে উপস্থিত প্রশ্নকর্তাসহ

সকলে সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে খুশী হতেন।

এবার আসতো উনার পক্ষ হতে প্রশ্নের পালা। উনি প্রশ্ন করতেন আর বলতেন, যারা পারেন হাত তুলেন। একটি প্রশ্ন করতেন, একজন রুকন ভাই সারা বছরে কতজন রুকন তৈরী করেছেন? উপস্থিত ৩৫০/ ৪০০ জনের এর মধ্যে হাত উঠতো ৩০/৩৫ জনের। এবার বলতেন, রুকন হওয়ার পর একজনও রুকন তৈরি করেননি কিংবা রুকন মানে আনেননি তারা হাত তুলেন। এ সময় আমাদের মতো আসামীরা কেউ হাত তুলতোনা। কেউ অর্ধেক হাত তুলতেন, কেউ আবার হাত তুলে নামিয়ে ফেলতেন। এ অবস্থা দেখে উনিসহ পুরো সমাবেশের সকলেই এমনভাবে হাসতেন, যে হাসির রেশ চলতো প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পরেও। সর্বশেষে কমন একটি প্রশ্ন করতেন, কারা কারা দৈনিক সংগ্রামের গ্রাহক, কারা নিয়মিত সাপ্তাহিক সোনারবাংলা বাসায় রাখেন এবং পড়েন? সংগ্রাম এবং সোনারবাংলা পড়ার গুরুত্ব সংক্ষিপ্তভাবে এরই ফাঁকে আলোচনায় সেরে নিতেন।

স্যারের সাথে ছোট্ট স্মৃতি ২০০৮ কিংবা ২০০৯ সালের দিকে। আমি তখন দৈনিক সংগ্রামের সোনাগাজী উপজেলা সংবাদদাতা এবং সোনাগাজী প্রেসক্লাবের সভাপতি। দৈনিক সংগ্রামের বিজ্ঞাপনের কমিশন বাবদ আমি প্রায় ১৪/১৫ হাজার টাকা পত্রিকার নিকট পাওনা। মাসিক সম্মানীও ৫০০ টাকা হারে কয়েক বছরের বাকী। উক্ত কমিশনের টাকা এবং সম্মানি ভাতার জন্য একদিন সংগ্রাম অফিসের বিজ্ঞাপন ম্যানেজারের নিকট যাই। বিজ্ঞাপন ম্যানেজার এতদবিষয়ে আমাকে হিসাব শাখায় যেতে বলেন, হিসাব শাখায় গেলে উনারা বলেন বিকালে আসেন, বিকালে গেলে বলেন সন্ধ্যায় আসেন, সন্ধ্যায় গেলে বলেন ক্যাশে টাকা নেই। আগামীকাল সকালে আসেন। পরদিন সকালে গিয়ে আবারও ধর্ণা দিয়ে বসে থাকি। সকাল গড়িয়ে দুপুর। এসময় যোহরের নামাজের আজান দিলে মগবাজার জামায়াত অফিস সংলগ্ন মসজিদে জামায়াতে জোহর নামাজ শেষ করে রাস্তায় মরহুম মকবুল স্যারের সাথে দেখা। আগ বাড়িয়ে সালাম দিয়ে পরিচয় দিলাম আমার বাড়ী সোনাগাজী। মরহুম অধ্যক্ষ মোস্তফা ভাইদের বাড়ীর পাশে। আমি দৈনিক সংগ্রামের সোনাগাজী সংবাদদাতা। পরিচয় দিয়েই গত ২ দিনের আমার সাথে দৈনিক সংগ্রাম অফিসের লোকজন যে আচরণ করেছেন স্যারের কাছে অনুনয়-বিনয় করে কান্নাকান্না ভাব নিয়ে বল্লাম। উনি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কী আর করা। এতক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করেছেন আরো একটু ধৈর্য্য ধারণ করুন। হয়তোবা আল্লাহ একটা কুল-কিনারা করে দেবেন। যাক স্যারের দোয়ায় রাতে এশার নামাজের কিছুক্ষণ আগে আমার বিজ্ঞাপনের কমিশনের প্রায় ১০ হাজার টাকা পেয়ে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলাম।

মহান আল্লাহ আমার জন্য সেই মহান মকবুল বান্দার দোয়া কবুল করেছেন। আজ উনার মৃত্যুর পর শুধু এটাই দোয়া করি, আল্লাহ উনাকে মকবুল বান্দা থেকে মহসিনবান্দা হিসাবে কবুল করুন।

"যেমন নাম তেমন কাম" নামের সাথেই স্যারের সকল কাম জড়িত। ফেনী জেলার ইসলামী আন্দোলনের সকল পর্যায়ের লোকদের কাছে তিনি মকবুল স্যার হিসাবেই পরিচিত। সকল দায়িত্বশীলই তাঁকে দেখেছি স্যার হিসেবে সম্বোধন করতে। সভা-সমাবেশ কিংবা সম্মেলনে উনার হাসিমাখা বক্তব্য সকলকেই আবেগময় করে তুলতো। বিরোধী দলের সমালোচনায় তিনি যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। এ জন্য সকল রাজনৈতিক দলের কাছে তিনি আদর্শ নেতার সম্মান পেতেন। যা তাঁর ইন্তেকালের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের উনার ব্যাপারে লাইভ অনুষ্ঠানে আমরা শুনতে পেয়েছি। তাঁর ব্যাক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক ও সাংগঠনিক জীবন এক ও অভিন্ন। চাল-চলন, কথা-বার্তা, আলাপ-আলোচনায় যেন একজন খাঁটি আউলিয়া ও দরবেশ।

২০০০ সালের ১২ জুলাই চট্টগ্রামে একটি রাজনৈতিক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। যা পত্রিকার মারফতে জানতে পারি। ঘটনার পর দিন তিনি সাংগঠনিক কোন একটা কাজে ফেনীতে আসেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ সারাদেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি থমথমে বিরাজ করছিল। এ সময় তিনি জেলা জামায়াত অফিসে টুকিটাকি সাংগঠনিক কাজ শেষ করে দ্রুত সিলোনিয়ার ওমরাবাদ নিজ গ্রামের বাড়ীতে যাবেন পারিবারিক কাজে। উপস্থিত উনার সাথে আর কোন সফর সঙ্গী নেই। অগত্যা জেলা জামায়াতের কোন একজন দায়িত্বশীল আমাকে বলার সাথে সাথে আমি রাজি হয়ে গেলাম। গাড়ীতে উঠে আমি পেছনের সিটে বসা, উনি সামনে । সারা পথ শুধু উনার মুখে দোয়া-দরুদ পাঠ। আর পরিচিত কাউকে দেখলে ড্রাইভারকে বলতেন, এই একটু থাম। পাশের লোকটিকে নিজেই গাড়ির গ্লাস নামিয়ে সালাম দিয়ে কুশল বিনিময় করতেন হাসিমুখে। এভাবে উনার সাথে সব মিলিয়ে ঘন্টা তিনেক সফর সঙ্গী ছিলাম। কাছে থেকে দেখলাম, অনুভব করলাম, স্মৃতির পাতায় লিখে রাখলাম। তিনি শত্রু মিত্র সকলের নিকট সমান প্রিয়। সত্যিকারের এই মরহুম মকবুল স্যার যেন, রাসুলের আদর্শের অবিকল ছায়াছবি।

লেখক: সোনাগাজী উপজেলা সংবাদদাতা দৈনিক সংগ্রাম।

মরহুম মকবুল আহমাদ (রহ.)
যার মধ্যে ছিলো সাহাবীদের স্বভাব

মুফতী মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

তিনি ছিলেন সাদা মনের মানুষ। রাগ, হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ কিছুই তার মধ্যে ছিলো না। তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ। পার্থিব কোন কিছুর প্রতি তার লোভ ছিলো না। তিনি ছিলেন দুনিয়া ত্যাগী, পরকালমুখী একজন আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ।

মানুষ প্রকৃত মানুষ হয় তার গুনে, অবয়বে নয়। সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন পৃথিবীর সেরা মানুষ। যাদের প্রশংসা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। বলা হয়েছে- আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (সূরা আল মায়েদাঃ ১১৯, আত্-তাওবাঃ ১০০, আল-মুজাদালাঃ ২২, আল-বইয়্যেনাঃ ৮) আরো ইরশাদ করেন- মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি বজ্রকঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন (সূরা আল ফাতহঃ ২৯)। অন্যত্র ইরশাদ করেন- (তারা) এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে (সূরা আন্-নূরঃ ৩৭)। আরো ইরশাদ করেন- তাদের পার্শ্ব শয্যা হতে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে (সূরা আস্ সিজদাঃ ১৬)। আরো ইরশাদ করেন- তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত (সূরা আয্-যারিয়াত : ১৭-১৮)। তাদের আরেকটি গুণ হলো- তারা দিনে সৈনিক, রাতে দরবেশ।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর মরহুম মকবুল আহমাদ সাহেব ছিলেন একজন সাহাবী চরিত্রের মানুষ। সাহাবীদের মধ্যে যেসব গুণাবলী বিদ্যমান ছিল তার মধ্যে সে সব গুণাবলী দেখা গেছে। তিনি ছিলেন একজন সহজ-সরল, মিষ্টিভাষী ও নরম স্বভাবের মানুষ। তিনি জীবনে কারো প্রতি রাগ হয়েছেন বলে কেউ বলতে পারবে না। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলতেন- নেতৃত্ব করতে হলে, দ্বীনের দায়ী হতে হলে গন্ডারের মত চামড়া হতে হবে এবং মাথায় কদুর তেল দিতে হবে। তিনি বক্তব্যে আরো বলতেন- যারাই লংকা যায়, রাবন হয়ে আসে, কিন্তু আমাদের নেতারা লংকা গিয়ে রাবন হয় না। অর্থাৎ তিনি বুঝিয়েছেন যারা জামায়াতের মন্ত্রী, এমপি হয় তারা চুরি করে না, অন্যায়-অবিচার করে না।

তাকে দেখেছি এশার নামাযের পর বিতির নামায পড়তেন না, শেষ রাত্রে পড়তেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি রীতিমত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। রাতের নামাযের ব্যাপারে তিনি অধিক গুরুত্ব দিতেন। যা ছিল আমাদের নবী (সা:) এবং সাহাবীদের আদর্শ। জননেতা মকবুল আহমাদও ছিলেন সাহাবা চরিত্রের মানুষ। তিনি কঠিন পরিস্থিতিতেও সদা আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর রাখতেন। তাঁর এলাকার মরহুম মনসুর সাহেব যিনি আল হেলাল একাডেমীর প্রিন্সিপাল ছিলেন। হঠাৎ করে তিনি স্ট্রোক করে ইন্তেকাল করেন। তার পরিবারের সাথে রীতিমত যোগাযোগ রাখতেন। তিনি ছিলেন সাদা মনের মানুষ। রাগ, হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ কিছুই তার মধ্যে ছিলো না। তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ। পার্থিব কোন কিছুর প্রতি তার লোভ ছিলো না। তিনি ছিলেন দুনিয়া ত্যাগী, পরকালমুখী একজন আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ। তার ছিলোনা কোন বিলাস বহুল বাড়ী এবং ব্যাংক একাউন্ট। ছেলের আয়ের অর্থ এবং বই এর রয়ালেটির অর্থ দিয়েই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ তার এলাকার লোকজন। স্বয়ং জয়নাল হাজারী সাহেবও তাঁর মৃত্যুর পর প্রশংসা করেছেন। কোন অমুসলিমও তাঁর দোষ-ত্রুটির কথা বর্ণনা করেনি। দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করেন, আমীন॥

লেখক : প্রধান ফকীহ, আল জামেয়াতুল ফালাহিয়া কামিল মাদ্রাসা, ফেনী।

স্মৃতির পাতায় হাসিমুখের প্রিয় রাহবার

হাফেজ মাওলানা কামরুল আহছান ভূঁঞা

উনার আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ কথাবার্তা সত্যিকার প্রেরণা সৃষ্টি করে। তিনি অনেক লম্বা সময় প্রশ্নোত্তর পর্বে হাসোজ্জল চেহারায় প্রশান্তমনে প্রশ্নের সমাধান দিতেন। তিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও সুশিল সমাজ গঠনে আইডিয়াল মানুষের প্রামান্য চিত্র।

মুহ্তারাম মকবুল আহমাদ দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে হাসোজ্জ্বল চেহারার সময়োপযোগী প্রিয় রাহবার ছিলেন। ছাত্র জীবন থেকে তাঁকে অনেক শিক্ষা সেমিনারে পেয়েছি। উনার আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ কথাবার্তা সত্যিকার প্রেরণা সৃষ্টি করে। তিনি অনেক লম্বা সময় প্রশ্নোত্তর পর্বে হাসোজ্জ্বল চেহারায় প্রশান্তমনে প্রশ্নের সমাধান দিতেন। তিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও সুশিল সমাজ গঠনে আইডিয়াল মানুষের প্রামাণ্য চিত্র। তিনি যে একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানব দরদী খাদেম ছিলেন, তার অনেক প্রমাণ থেকে একটি মাত্র উল্লেখ করছি।

২০০৮ সালে আমার আম্মার চিকিৎসা সেবায় ঢাকা ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল কাকরাইলে তাঁর বদান্যতায় অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের সহযোগিতায় উন্নত চিকিৎসা পেয়ে আমার মা (৯৩) আজো দোয়া করছেন। স্যার সম্পর্কে বাংলাদেশের অন্যতম শিল্পপতির মন্তব্য উল্লেখ করতে হয়। একদিন সাইথ ইষ্ট ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এম. এ কাসেম সাহেব বলেন, ফেনীর কৃতি সন্তান জামায়াত এর নায়েবে আমীর মকবুল আহমাদ আমাকে পবিত্র কোরআনের তাফসীর উপহার প্রদান করেন, যা অধ্যয়ন করে আমি নিজকে ধন্য মনে করি। এই ম্যাসেজটি আমি স্যারকে এক সুযোগে জানালাম তিনি খুশি হয়ে আমার নিকট আরো কিছু লোকের তালিকা চাইলো। দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে মাঝে মধ্যে মোবাইল যোগাযোগে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের খোঁজ-খবর নিয়ে দোয়া করতেন।

প্রিয় রাহবারের জানাজার দৃশ্য সত্যিকার অবাক লাগার মত দৃশ্য। আমার মনে হচ্ছিলো রমজানের প্রথম রাত্রির এই মহাসমাবেশ কোনো এক ময়দানে জিন্দা মকবুল স্যারের আগমনের ইসলামী মহাসম্মেলনের আয়োজন। আল্লাহপাক প্রিয় রাহবারকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান হিসাবে কবুল করুন। আমীন॥

লেখক : পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক: ফেনী জেলা মাদ্‌রাসা শিক্ষা বৃত্তি ফাউন্ডেশন।

শাহাদাত মাহমুদ সিদ্দিকী

শোকাধিকার

অনেক মানুষের মৃত্যুই আমাকে শোকাকুল করে না।
যেমন আপনার মৃত্যু, হে আমির।
আমি শুধু বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকি।
আমার পুরোনো সেই কৌতূহলী লাজুক দু'চোখ নিয়ে।
এই যে দেখতে পাচ্ছি আপনাকে। এগিয়ে আসছেন।
সতেজ কিন্তু একান্তই সাধারণ।
সাধারণ কিন্তু অবিমিশ্র অসাধারণ।
এগিয়ে আসছেন আমার দিকে।
সদ্য কৈশোর পেরুনো জনৈক তরুণের দিকে।

সালাম দেবো। হ্যাঁ।
আর একটু কাছে এলেই।
কিন্তু তার আগেই কেন কান ভেসে যাচ্ছে!
জান ভেসে যাচ্ছে আমার।
এক অকৃত্রিম মধুর কণ্ঠধ্বনিতে! -'আচ্ছালামু আ'লাইকুম'...

এ কী করলেন আমির!
সামান্য সালামটুকু থেকেও মাহরুম করলেন!
কী করে শোক করি বলুন!
আপনাকে ভাবলেই দেখি আপনি আসছেন।
হাটছেন আমার দিকে।
তারপর সালাম.. এবং প্রতিবারই সেই বাকরুদ্ধ।
একই বঞ্চনার স্বাদ!..

০২.
তারচেয়ে বরং তাদের জন্য দুটো শোক করা যায়।
নির্বিঘ্নে।
আপনার ইন্তেকালে যারা নির্বিকার!
পলায়নপর!
সত্যি বলতে কী, কাপুরুষদের আসলে কোনো শোক থাকে না।
হিংসুক এবং নপুংসকদের কোনো শোক থাকে না।

চলমান ---

পরনিন্দা এবং পরশ্রীকাতরতা অনেক আগেই তাদের শোক ছিনিয়ে নিয়েছে।
স্বার্থান্ধতাই এখন তাদের শোকের সমার্থক।
যদিও আপনি আমাদের ছেড়ে গেছেন।
মাফ করবেন।
তবু আমি তাদের জন্যই একটু শোক করতে চাই।

আপনার অনেক আগেই তাদের মৃত্যু হয়ে গেছে, আমির!
যারা চালাকি করে নিজেদের শোকাধিকার বন্ধক রেখেছে শয়তানের খোঁয়াড়ে।

মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ

শান্তিতে ঘুমাও স্বজন

অফ্লুলেল অগ্নিঝরা রাজপথের - রাজকীয় রাজনীতির রাজপুত্র
সফল সিপাহ্ সালাহার - মকবুল আহমাদ (রহ) কে নিবেদিত

ঘুম কাতুরে সুখ নিদ্রায়
থাকতে পারিনি অলস আমি
আমায় জাগিয়ে দিলে সস্নেহে
কোথায় আজ তুমি।

জাগিয়ে দিলে - হাতে দিলে
কামিয়াবের আল-কোরআন
বিধ্বস্ত বিশ্ব জাগিয়ে দিলে
আলোর পথে আহবান।

জগত জমিনে আলো ঝলমল
আন্দোলনে তুমি বিচক্ষণ
আলোকিত আমরা সবাই
তোমায় পেয়ে সর্বক্ষণ।

দায়ী ইলাল্লাহ'র দায়িত্বে তোমার
আমরা নই নিঃস্ব
মাধুর্যময় স্বভাব তোমার
সুন্দরতায় বিমোহিত বিশ্ব।

হাস্যোজ্জ্বল মুখ তোমার
তুমি সুবিজ্ঞ সংগঠক বেশ
পূত প্রবক্তা তুমি প্রজ্ঞাময়
পথ পেলো দিশে হারা দেশ।

সব কাজে স্বনাম ধন্য সুনিবিড়
বর্ণাঢ্য তোমার হায়াত
ধন্য হোক এ জাতিটা
দেখে তোমায় দিবা-রাত।

তুমি মিষ্টি মেজাজে বুলবুল
শত সুবাসে বকুল ফুল।
মুকুল তুমি মকবুল
আল্লাহ্ তোমায় করুন কবুল।

মনুষ্যত্বের মডেল তুমি
ছিলে তবু আঁধার কারাগারে
শান্তিতে আজ ঘুমাও স্বজন
সুখ জান্নাতের স্বর্ণ দ্বারে।

মুহাম্মদ ফিরোজ কবির
মকবুল ভাইয়ের স্মরণে

সাহসী এক মর্দে মুজাহীদ
বেহেশত কেনার শর্তে,
করবে কায়েম কোরআনের রাজ
আল্লাহর পথে রয় মর্তে।

মিথ্যার রাজ্য ধ্বংস করতে
রেখেছিল জীবন বাজি,
জাতিকে দেখাতে সত্যের পথ
মানুষের রাহবার সাজি।

তটস্থ ছিলো জালিমের দল
ময়দান কাঁপে থরথর,
রয়েছে সদা রাজপথে আসিন
হুংকারে উঠতো ঝড়।

মজলুমের অধিকার আদায় করতে
মরণকে পেতো না ভয়,
কবুল করিও এ বান্দার কর্ম
বুকে নিও দয়াময়।

লইও তারে আপন করে
আখেরাতে সেই দিন,
হইও তাঁর কবরের সাথী
মন্দ শোধরীয়ে নিন।

দয়াল প্রভু ভুলনা কভু
স্মরণ রাখিও তারে,
রয় যেনো সে হাশরের দিন
নেককারদের কাতারে।

রাকিবুল এহছান মিনার
গীতিকাব্য ঃ জান্নাতি ফুল

ঝরে গেছে বাগানের সেরা এক ফুল,
অশ্রুতে ডুবে গেছে হৃদয়ের কূল।
হাসিমাখা চিরচেনা মুখখানি তার,
মোখলেস আউলিয়া পরিচয় যার।

কথা কাজে অমায়িক ছিলেন অতুল-
মকবুল আহমাদ জান্নাতি ফুল।।

সংগঠনের তরে নিবেদিত প্রাণ,
অবদান রবে তার চির অম্লান।
কারাগার জুলুমাতে ভাঙেনি হৃদয়,
স্বপ্ন দেখেছে সদা দ্বীনের বিজয়।
সারাটি জীবন যার সাদামাটা ছিলো-
লালসায় যায়নি তো সরে একচুল।।

উনাকে হারিয়ে আজ শোকে বিহবল,
অশ্রুতে কোটি চোখ হলো টলোমল।
দেখবোনা প্রিয় মুখ আর কভু তার,
দ্বীনি কোন আলোচনা শুনবো না আর।

ভাবতেই এ হৃদয় ভেঙে যায় আজ,
চিন চিন ব্যথা করে কলিজার মাঝ।
তার তরে দোয়া করে তুলি মোনাজাত,
শ্রেষ্ঠই হয় যেন তার জান্নাত।
থাকে যদি মাফ করে দিও আল্লাহ্
জানা অজানায় কোন হয়ে গেলে ভুল।

সাকিনাত বা মুমিনের অন্তরে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ প্রশান্তি

(চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা ডিউটি ডাক্তারের ফেইসবুকে প্রদত্ত বক্তব্য)

আমীরে জামাতকে ১০ তারিখ সকালে প্রথম COVID- ICU তে দেখলাম। সৌম্য, শান্ত, চির প্রশান্ত মুখ। High flow nasal canula তে FiO2: ৯০-৯৫% নিয়েও দিব্বি হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন। কোনো সমস্যা বা অসুবিধা নেই, বললেন আমাকে। আমি তখনও জানি না তিনিই সেই মকবুল আহমাদ। সতীর্থদের কাছে তার পরিচয় নিশ্চিত হলাম। আরও জানলাম, তিনি এখানে জীবন-মৃত্যুর মাঝে বসেও অন্যদের খোঁজ-খবর নিয়েছেন। কিভাবে তার পরিচিত কিছু লোকের আয়ের ব্যবস্থা করে তাদের পরিবারের দূর্দশা দূর করবেন সেই আকাঙ্খা। নিজের বা নিজের পরিবারের জন্য কোন আক্ষেপ নেই।

যাই হোক, এরপর তিন দিনে বেশ কয়েকবার তাকে ডাক্তার হিসেবে খুব কাছে থেকে দেখেছি, প্রতিবারই মাথা নাড়িয়ে বলেছেন, কোনো কষ্ট নাই। যেন প্রিয় রবের সাক্ষাতের ঘ্রান তার সব কষ্ট দূর করে দিয়েছে। এজন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন সেই আজীবনের কাঙ্ক্ষিত মূহূর্তের জন্য। শেষবার গতকাল দুপুর ১২ টায় দেখেছি। তখন তার জাগতিক অবস্থা ভয়াবহ খারাপ। সবাই বুঝতে পারছিলাম, আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি, বাকিটা মহান আল্লাহর বিশেষ রহমতের অপেক্ষা। তখনও যেন তিনি মাথা নাড়িয়ে বলছিলেন, আর কোনো কষ্ট নাই। এর কিছুক্ষণ পরেই আল্লাহ তাকে কবুল করলেন। আলহামদুলিল্লাহ।

সারাজীবন ইসলামী আন্দোলনের জন্য যে জীবন আপনি বার বার উৎসর্গ করার শপথ করেছেন, সবসময় শহীদী মৃত্যু কামনা করেছেন, সেই মৃত্যু আল্লাহ কবুল করেছেন হাসপাতালের বিছানায়, মহামারী আক্রান্ত হয়ে- রোগে ভুগে।

মহান আল্লাহর দরবারে এই ১ম রোজার ইফতারে আগে দোয়া করি, আল্লাহ আপনাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের ওয়ারিশ হিসেবে কবুল করুন।

আমীরে জামায়াত (সাবেক) কে সামান্য সেবা করার সুযোগ আমাদের জীবনের বিশেষ পাওয়া। দোয়া চাই আমাদের জন্য।

মকবুল আহমাদ :
গণমাধ্যম কর্মী থেকে গণমানুষের নেতা

আব্দুল্লাহ আল মারুফ

কর্মজীবনের এক সময় ছিলেন সাংবাদিক। দেশের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন সংবাদপত্র দৈনিক সগ্রামের ফেনী মহকুমার প্রথম নিজস্ব সংবাদদাতা হিসেবে সাংবাদিকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। এর আগে ছিলেন মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক! আদর্শ মানুষ তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষকতা নামক মহান পেশার সাথে নিজের যোগসূত্র স্থাপন করেন।

বলছিলাম বাংলাদেশের ইসলামি রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রবাদ পুরুষ মকবুল আহমাদের কথা। মকবুল আহমাদ! একটি নাম, একটি ইতিহাস।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কারসাজিতে ডিজিটাল কারচুপির মাধ্যমে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে যখন ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসে তখন দেশ থেকে ইসলামী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। এই পর্বে প্রথম কালো থাবার শিকার হয় গণমানুষের সংগঠন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। যার ধারাবাহিকতায় জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দদেরকে ঠুনকো অজুহাতে গ্রেফতার করা হয়। ধীরে ধীরে স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক মীমাংসিত ইস্যুকে তারা জিন্দা করে। প্রায় সব কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কথিত ট্রাইবুনালের মাধ্যমে যুদ্ধপরাধী মামলা দায়ের করে। ২০১০ সালের জুনে তৎকালীন আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে গ্রেফতার করা হলে মকবুল আহমাদ ভারপ্রাপ্ত আমির মনোনীত হন। দলের সর্বোচ্চ কঠিন সময়ে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। একদিকে দমন নিপীড়ন, আরেক দিকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বশূণ্য দলের দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া! মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে তিনি অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দর ভাবে আঞ্জাম দেন।

মহান আল্লাহর দরবারে মরহুম মকবুল আহমদ স্যারের জন্য দোয়া করা ছাড়া ফেনীবাসীর এখন কোন কিছু করার নেই। তার মৃত্যুর পরে ফেনী- ২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল হাজারী তার সম্পাদিত "হাজারীকা প্রতিদিন" এর অফিসিয়াল পেজে লাইভে এসে মকবুল আহমদ স্যারের চরিত্র ও কর্মের গুণগান গেয়েছেন। যা একেবারে অকল্পনীয় ও অবিশ্বাস্য ছিল। মতাদর্শিক ভাবে শত্রুর মুখের স্বীকৃতি বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই বিরল।

আসলে মানুষ তার চেয়ারের যোগ্যতার কারণে অন্য মানুষদের ভালোবাসা পায় না। বরং ভালোবাসা সৃষ্টি হয় নিজের কর্মকান্ডে।

মহান আল্লাহর দরবারে উনার মাগফিরাত কামনা করে উনার রেখে যাওয়া স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার পাশাপাশি দেশ এবং মুসলিম উম্মাহ যেন তার দল ও মতকে আপন করে নিতে পারে সেই দোয়াই করছি। আল্লাহুম্মা আমিন।

লেখক, শিক্ষার্থী; তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, টঙ্গী শাখা, গাজীপুর

মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়েও মানব কল্যাণে মকবুল আহমাদ (রহ.) এর নমুনা

আইসিইউতে থাকাকালীন মৃত্যুর ১১দিন আগে ২ এপ্রিল ২০২১ইং তিনি নিজ এলাকা গজারিয়ার জাকির সাহেবের মাধ্যমে স্থানীয় রুকন ও ওয়ার্ড দায়িত্বশীল জনাব ফজলুর রহমানের নিকট সাদাকার টাকা পাঠান গরিবদের জন্য।

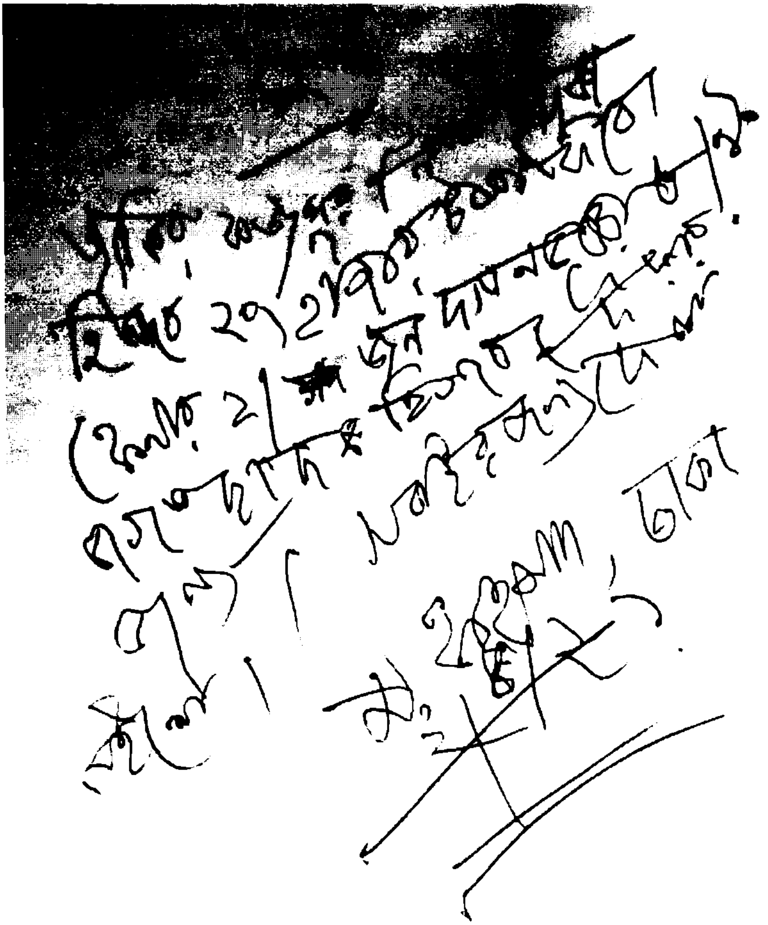

কুরআনের রাজ কায়েমে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন নিরলসভাবে। কুরআনের আলোকে নিজের জীবনকে রাঙ্গিয়েছিলেন পরম মমতায়। তাই ছোট মেয়ে ফারাহ তামান্নাকে অটোগ্রাফ দেয়ার সময় কুরআনের আয়াতই লিখলেন।

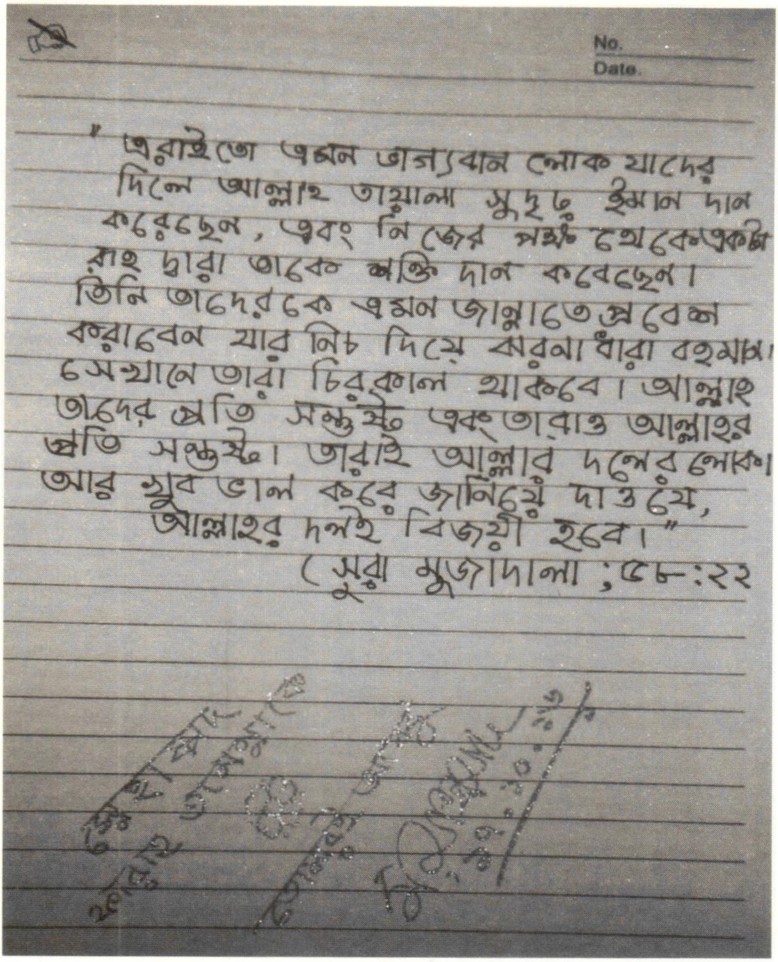
No.
Date.

"এরাইতো এমন ভাগ্যবান লোক যাদের দিলে আল্লাহ তায়ালা সুদৃঢ় ইমান দান করেছেন, এবং নিজের পক্ষ থেকে একটা রূহ দ্বারা তাকে শক্তি দান করেছেন। তিনি তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে ঝরনা ধারা বহমান। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লার দলের লোক। আর খুব ভাল করে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।"
(সূরা মুজাদালা ; ৫৮:২২

মরহুম রাহবারের কুরআন অধ্যয়নকালে সংক্ষিপ্ত নোট

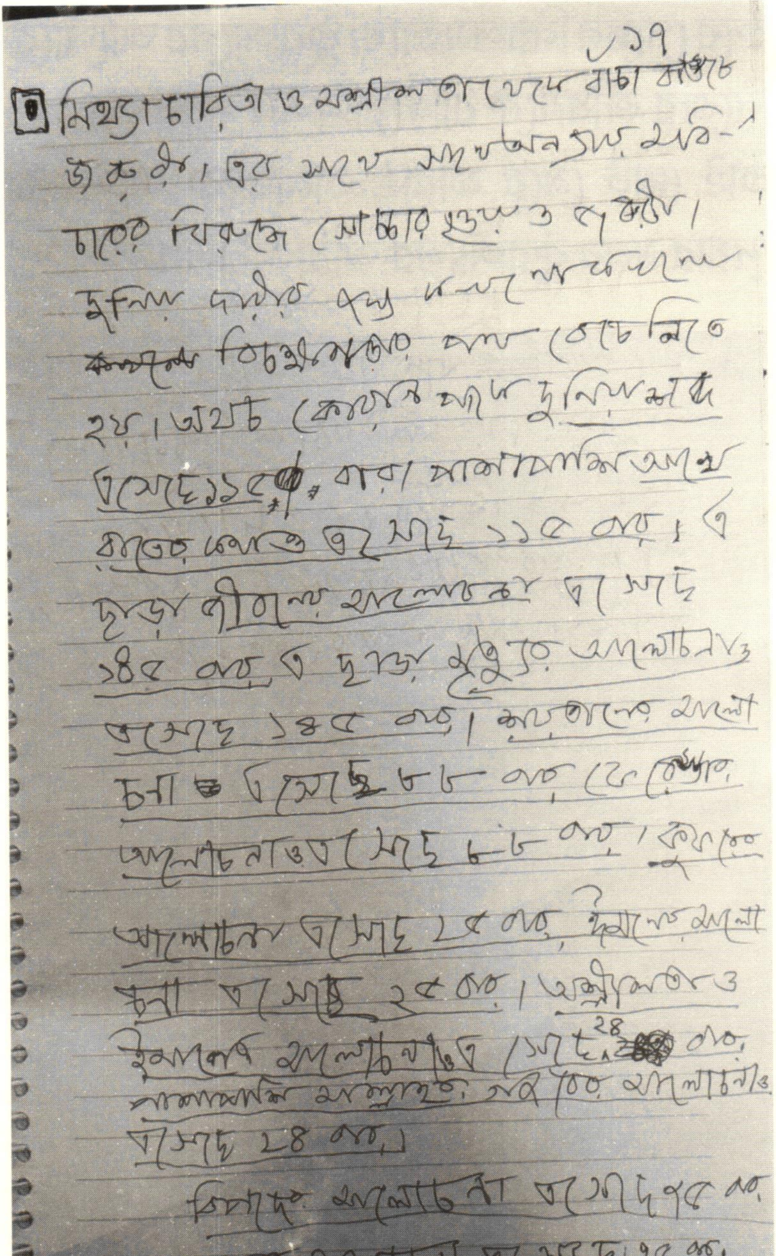

মরহুম রাহবার মকবুল আহমাদ (রহ.) সংক্ষিপ্ত কথায় কার্যকর দাওয়াতি কাজে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি ছোট টুকরো কাগজে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় হেদায়াত দিতেন সাথে কিছু বই। ২০২০ সালের রমজানে একজনকে লেখা মরহুমের নসিহত–

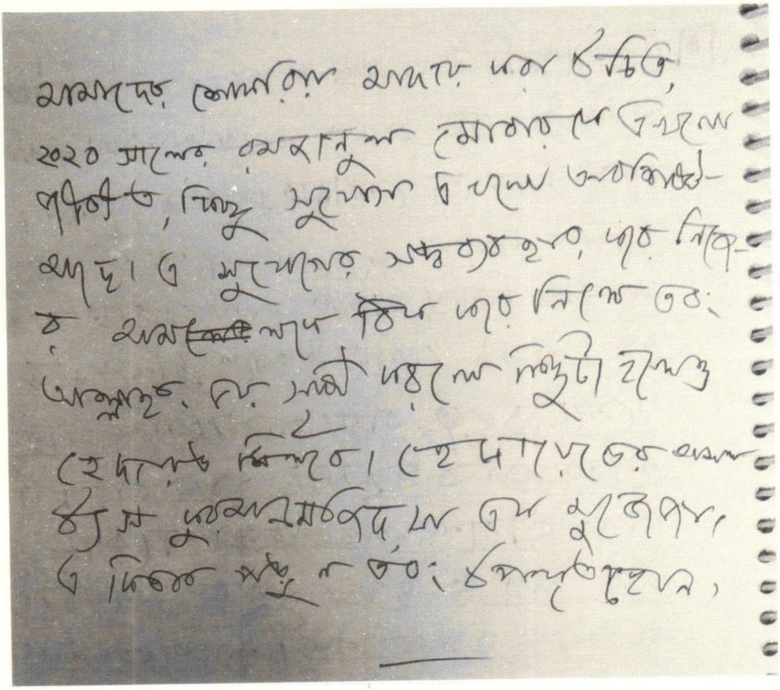

মৃত্যু তাঁর দুয়ারে দিয়েছে হানা। তাই শেষ চিঠি লিখলেন বড় ছেলে মাসুদকে–

মাসুদ

সবাইর প্রতি সালাম। আমি আল্লাহর মেহেরকাণীতে শেষের দিকে।

১। ছোট নোট বুক।

২। --- কলম।

৩। ছোট বাবুদের জন্য -----

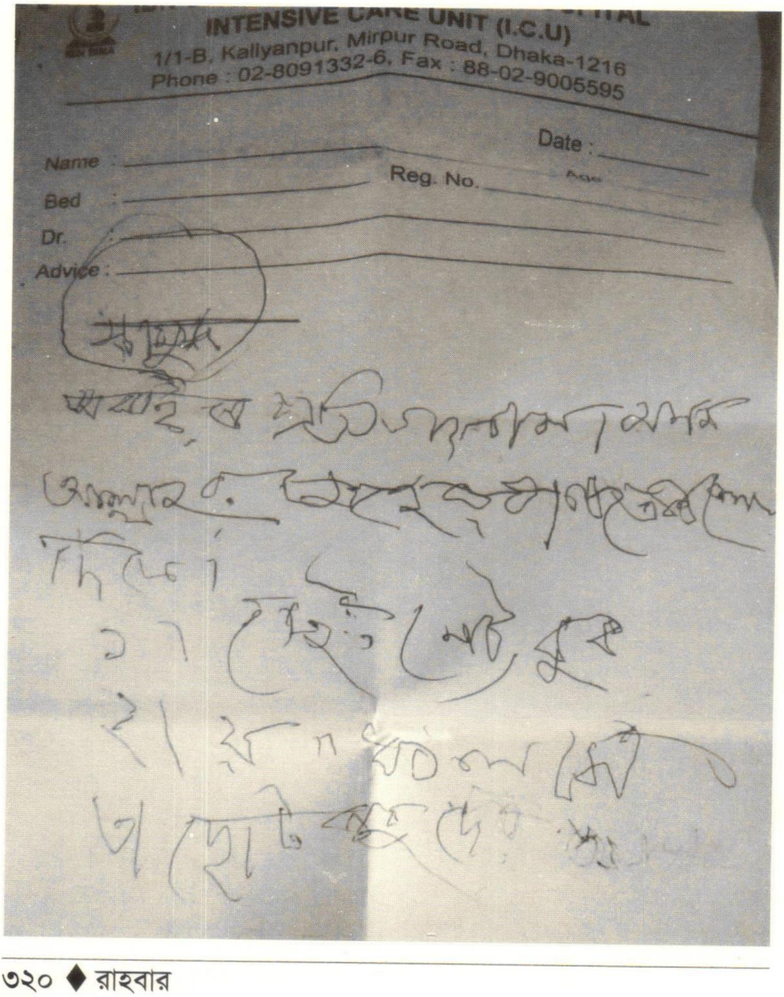

INTENSIVE CARE UNIT (I.C.U)

1/1-B, Kallyanpur, Mirpur Road, Dhaka-1216

Phone : 02-8091332-6, Fax : 88-02-9005595

Date :

Name :

Reg. No.

Bed :

Dr. :

Advice :

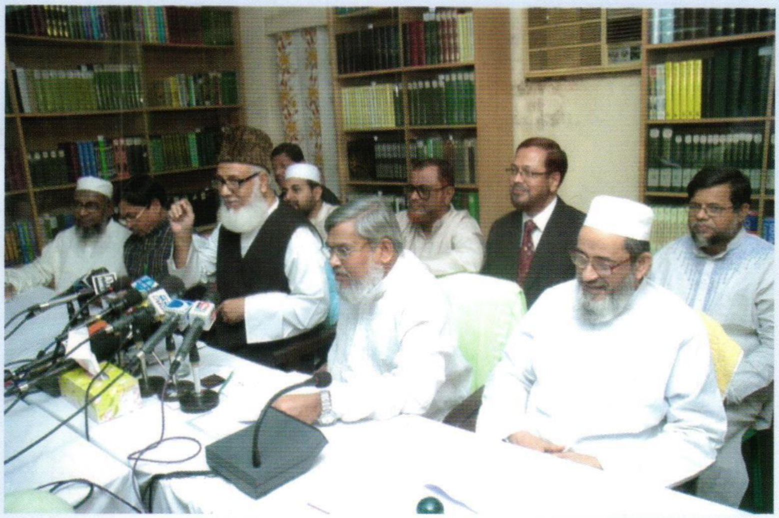

সাবেক আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাথে সাংবাদিক সম্মেলনে মুহতারাম মকবুল আহমাদ

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাব উদ্দিনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাথে মুহতারাম মকবুল আহমাদ

ব্যর্থ সরকারের পদত্যাগ ও কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে ৪ দলীয় জোটের জনসভায় বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

জনশক্তির সন্তানদের নিয়ে প্রীতি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবীতে ২০ দলীয় জোটের জনসভায় বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে এতিমদের সাথে ইফতারে মুহতারাম মকবুল আহমাদ

সাংবাদিকদের সম্মানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

২০ দলীয় জোটের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

ঢাকা মহানগরী জামায়াতের উদ্যোগে আয়োজিত যাকাতের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

২০১১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ।

২০১১ সালে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির আয়োজিত ঈদ প্রীতি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কর্তৃক সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ।

২০১০ সালে শীতার্থ অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

২৮ অক্টোবরের শহীদদের স্মরণে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

পল্টন হত্যা দিবস উপলক্ষে শহীদ পরিবারের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

পল্টন হত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর থানা আমীর সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

২০১০ সালে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কর্তৃক বাছাইকৃত সদস্যদের শিক্ষাশিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সীরাত পাঠ প্রতিযোগিতা- ২০১০ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ সকল নেতা কর্মীর মুক্তির দাবীতে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

বিদেশী কুটনৈতিকগণ মুহতারাম মকবুল আহমাদ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী কর্তৃক আয়োজিত অঞ্চলভিত্তিক রুকন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

মাওলানা মহি উদ্দিন খাঁন সাহেবের সাথে অন্তরঙ্গ আলোচনায় মুহতারাম মকবুল আহমাদ

বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

বিশ দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দ মুহতারাম মকবুল আহমাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ সৌজন্য সাক্ষাতে এলে স্বাগত জানাচ্ছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ সৌজন্য সাক্ষাতে এলে তাদেরকে আতিথেয়তা করছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরাম ঢাকা মহানগর কর্তৃক আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

দরিদ্রদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

ফ্যাসিস্ট ও ব্যর্থ সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য শিক্ষাশিবিরে বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

নিমতলীতে অঙ্গিকান্ডে নিহতদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া মাহফিলে নেতৃবৃন্দের সাথে মুহতারাম মকবুল আহমাদ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আয়োজিত জেলা মজলিশে শূরা সদস্য সম্মেলনে নেতৃবৃন্দের সাথে মুহতারাম মকবুল আহমাদ

২০১৬ সালে গ্রেফতারের পর মুহতারাম মকবুল আহমাদ

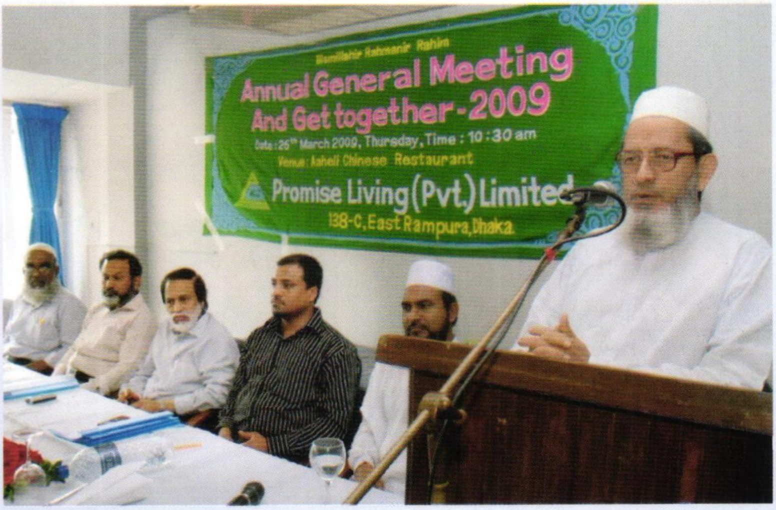

একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের এজিএম এ মেহমান হিসেবে মুহতারাম মকবুল আহমাদ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সৌজন্যে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে দোয়া করছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

মহান মুক্তিযুদ্ধের ৯ম সেক্টর কমান্ডার মরহুম এম এ জলিলের বাসায় স্ত্রী পরিজনকে সান্তনা দিতে নেতৃবৃন্দসহ মুহতারাম মকবুল আহমাদ

ঢাকার রাজপথে মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে আয়োজিত বিশাল জনসভায় নেতৃবৃন্দসহ মুহতারাম মকবুল আহমাদ

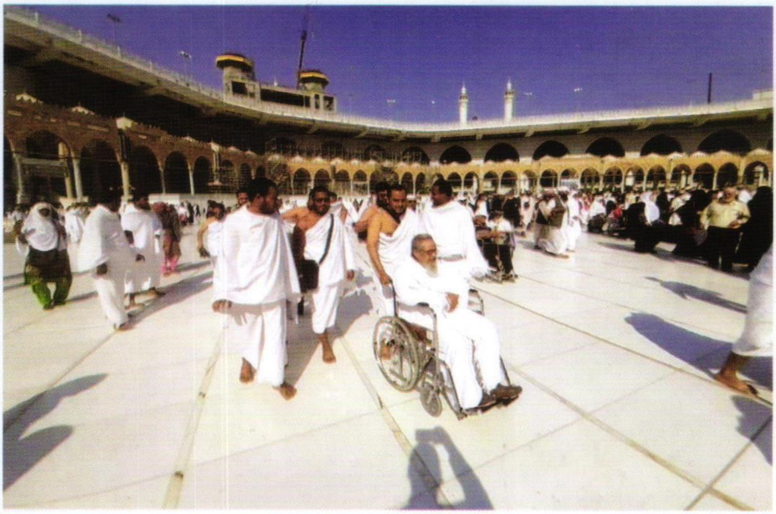

হুইলিং চেয়ারে বসে ছোট ছেলে নোমানের সাথে জীবনের শেষ ওমরা পালন করছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

ওমরা পালন করতে গেলে মসজিদে ইবনে আব্বাসে প্রবাসীদের সাথে মুহতারাম মকবুল আহমাদ

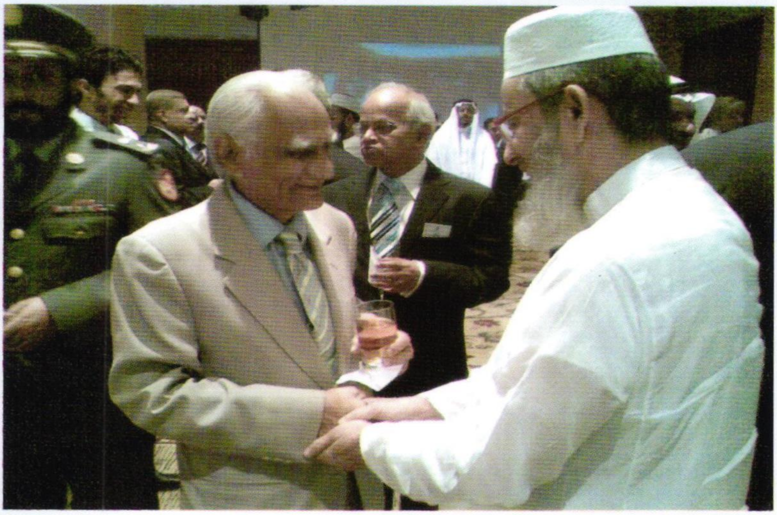

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি মনিরুজ্জমান মিয়া সাহেবের সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে মুহতারাম মকবুল আহমাদ

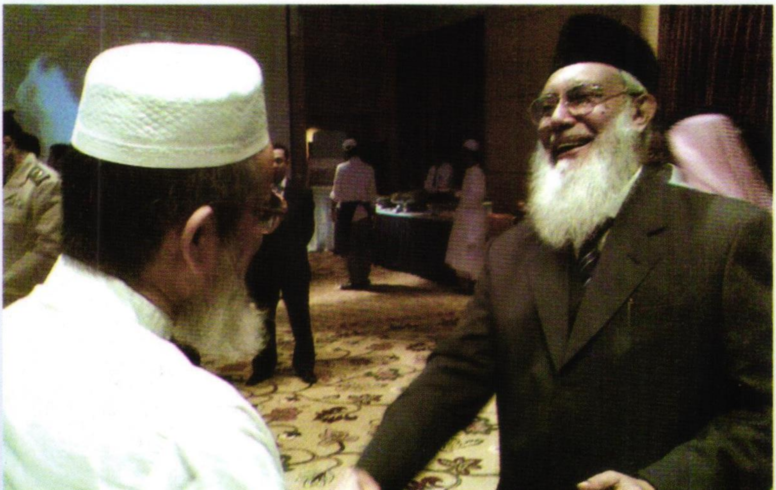

সাবেক বিচারপতি ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব আবদুর রউফ এর সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে মুহতারাম মকবুল আহমাদ

কুটনৈতিকদের সৌজন্যে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে মেহমানদের স্বাগত জানাচ্ছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

কুটনৈতিকদের সৌজন্যে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে মেহমানদের স্বাগত জানাচ্ছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

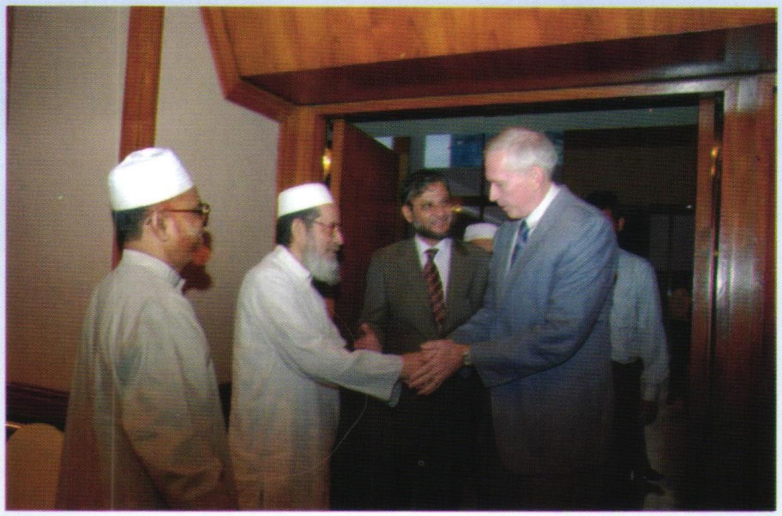

কূটনৈতিকদের সৌজন্যে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে মেহমানদের স্বাগত জানাচ্ছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

কূটনৈতিকদের সৌজন্যে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে মেহমানদের স্বাগত জানাচ্ছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

সাংবাদিকদের সম্মানে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

২৮ অক্টোবর লগি বৈঠার তান্ডবে শহীদদের স্মরণে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

সরকারের জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদ ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবীতে রমনা থানা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত সমাবেশে মুহতারাম মকবুল আহমাদ

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে মুহতারাম মকবুল আহমাদ

নিজ অফিসে বিদেশী অতিথিকে স্বাগত জানাচ্ছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

বিদেশী মেহমানের সাথে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে মুহতারাম মকবুল আহমাদ

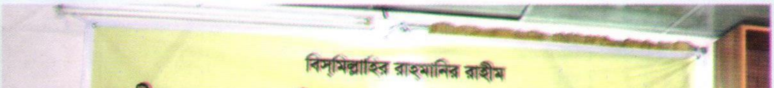

সাবেক আমীরে জামায়াত শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর জন্য ঢাকা মহানগরী জামায়াত আয়োজিত দোয়া অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করছেন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

আইসিইউতে চিকিৎসাধিন মুহতারাম মকবুল আহমাদ

আইসিউতে মুহতারাম মকবুল আহমাদকে দেখতে গেলে ফেনী জেলা আমীর জনাব এ.কে.এম. শামছুদ্দিন, সেক্রেটারীসহ নেতৃবৃন্দ দোয়া করেন

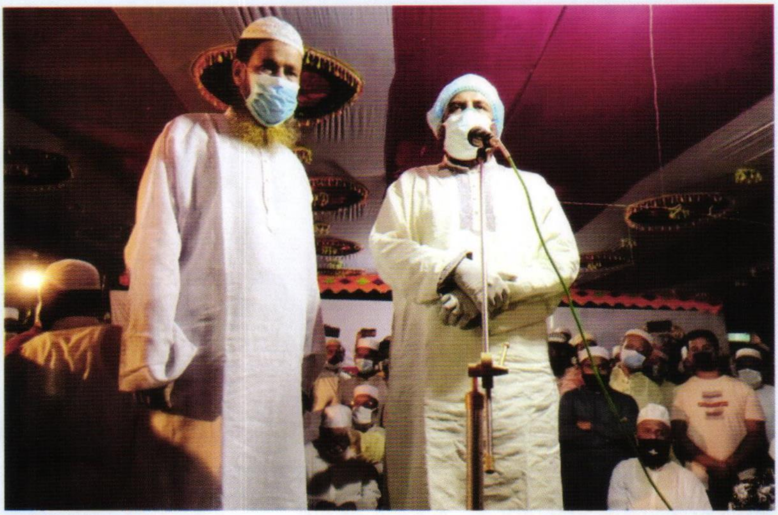

মরহুমের জানাযা পূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সেক্রেটারী জেনারেল মুহতারাম অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরোয়ার

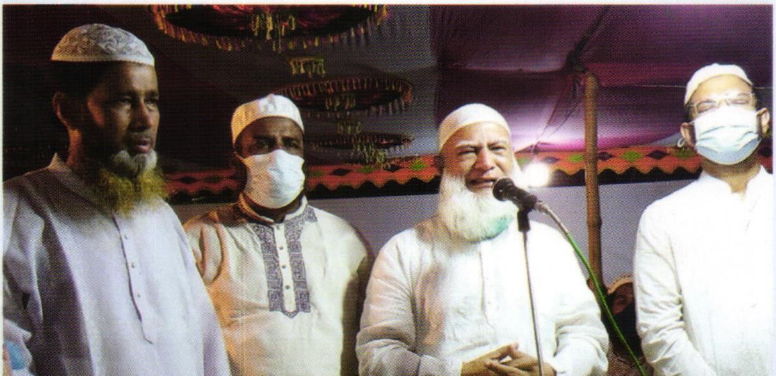

জানাযা পূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মুহতারাম আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান

মুহতারাম মকবুল আহমাদ এর নামাযে জানাযায় ইমামতি করছেন বর্তমান আমীরে জামায়াত মুহতারাম ডা. শফিকুর রহমান

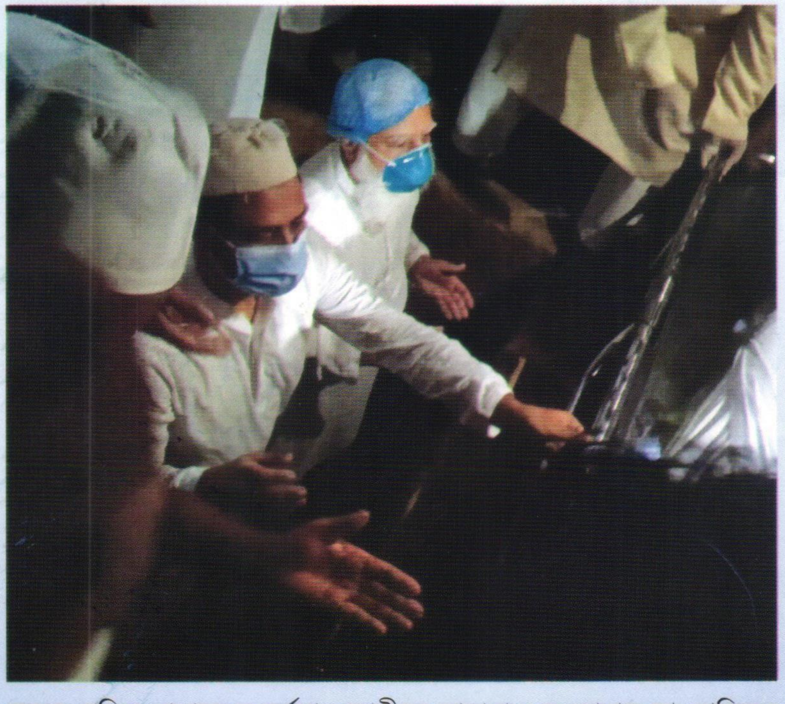

কবরে কফিন নামাচ্ছেন বর্তমান আমীরে জামায়াত মুহতারাম ডা. শফিকুর রহমান